সাহিত্যিকা

সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা

বিই কলেজ বেসু আইআইইএসটির একমাত্র মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

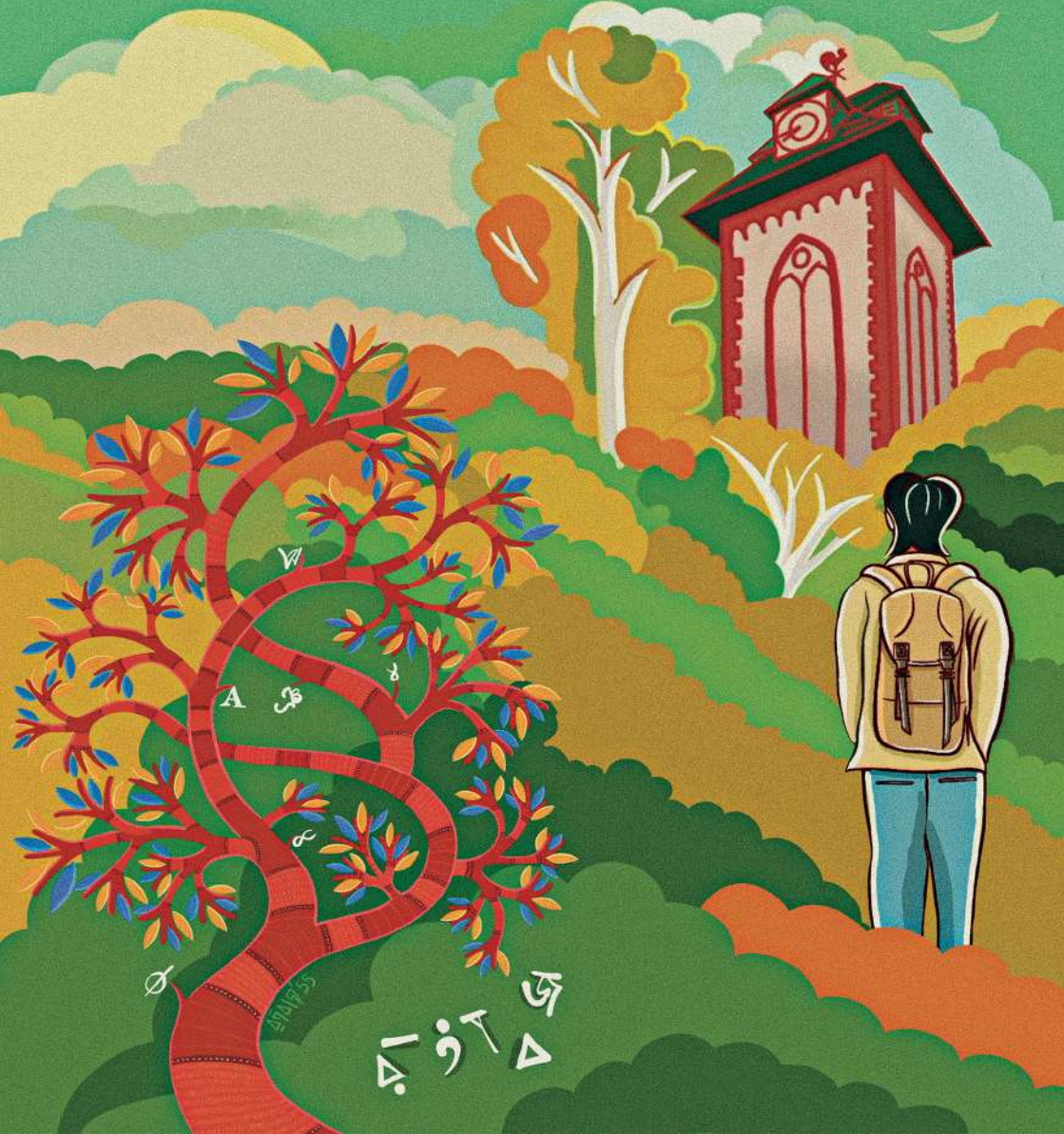

ভূমিকা

‘সাহিত্যিকা’ পত্রিকার জন্ম ষাটের দশকে কোনো একসময়। সেটি ছিল অনিয়মিত, এবং প্রধানত ওয়াল ম্যাগাজিন। তারপর রাজনৈতিক অস্থিরতায় আর উদ্যোগের অভাবে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

২০২১ সালে মে মাসে ‘সাহিত্যিকা’ নাম দিয়েই আমাদের ৭২-৭৭ ব্যাচের পত্রিকা শুরু করি। প্রকাশের ধারাবাহিকতা ধরলে সেটিই প্রথম সংখ্যা। অন্য কিছু ব্যাচের প্রশ্ন শুধু ৭২-৭৭ ব্যাচ কেন? অন্য ব্যাচের লেখা কেন নেওয়া হবে না? অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ দাবী। চারজন উৎসাহী মিলে ২০২১ সালের জুলাই আগস্ট নাগাদ সাহিত্যিকার যাত্রা শুরু হল। বিই কলেজ বলি, বা বেসু আইআইইএসটি বলি, অনেক ব্যাচের চেনা-অচেনারা এগিয়ে এলেন, কেউ লেখক, অন্যেরা উৎসাহী পাঠক, সকলেই ‘পৃষ্ঠপোষক’। আমরা নিজেরাই শঙ্কায় ছিলাম কতদিন সাহিত্যিকা চালাতে পারব। কিন্তু লেখক ও পাঠকেরা শুরু থেকেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনাদেরই সহযোগিতায় আজ আমরা সাহিত্যিকার ৫০তম সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছি। যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না, কিন্তু আপনারাই সাহিত্যিকার রথ টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। আজ যেমন পঞ্চাশ দশকের প্রাক্তনীরা নিজেদের লেখা দিচ্ছেন, তেমনি এখনের ছাত্রছাত্রীরাও আমাদের সাথে আছেন। এই সাহিত্যিকার মাধ্যমে আপনারাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাত সাতটি দশকের লেখক ও পাঠকদের সকলকে একটি মঞ্চে নিয়ে এসেছেন।

‘সাহিত্যিকা’ বর্তমানে ওয়েব ম্যাগাজিন। ইচ্ছে ছিল সুবর্ণজয়ন্তীর ৫০তম সংখ্যাটি যদি বই আকারে প্রকাশ করা যায়। ইঙ্গিত পেয়েছিলাম যে প্রাক্তনীদের একটি বিশেষ সংগঠন আর্থিক সহযোগিতা করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সুতরাং আমরা কয়েকজন উৎসাহী নিজেদের আর্থিক উদ্যোগেই সাহিত্যিকার ৫০তম সংখ্যা বই আকারে প্রকাশিত করলাম। ‘সাহিত্যিকা’ আছে, এবং থাকবে আপনাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

ধন্যবাদান্তে, ‘সাহিত্যিকা’ সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে

সরসিজ মজুমদার, ১৯৭১ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
অসীম দেব, ১৯৭৭ ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
সোহম দাসগুপ্ত, ১৯৭৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
শ্রুতি গোস্বামী, ২০০৪ আর্কিটেকচার

সূচিপত্র

ফিশ ওর্লী ও নারায়ণ সান্যালের মেয়ের বিয়ে ৫
সূত্র : পঞ্চাশোর্ধে - নারায়ণ সান্যাল, ১৯৪৮ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
শিং ভেঙে বাছুরের দলে ৭
©বাদল সরকার, ১৯৪৭ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
একটি কবিতা ১৬
©বিনয় মজুমদার
Prof. A. Macdonald, and Our Days of 1928-1932 18
©Amulyadhan Deb, 1932 Mechanical Engineering
Remembering Our Shihsa Gurus – the Glowing ’50s 27
©Amitabha Ghoshal, 1957 Civil Engineering
কষ্টকল্পিত ৩৪
©শ্রীমতী দুর্গারাণী বড়াল, (ডক্টর শঙ্কর সেবক বড়ালের স্ত্রী)
রবীন্দ্রনাথের ‘শারদোৎসব’ নাটক ৪০
©সংকলনে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
‘লাল পাহাড়ির দেশে যা’ – একটি কবিতার পঞ্চাশ বছর ৪৪
©অরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৭০ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
Durgotsav and Navaratri (Autumnal) 51
©Sarasij Majumder, 1971 Civil Engineering
Our BE College Sports Days, 1959-63 60
©Contributors: (All from the 1963 batch)
বিই কলেজের প্রেম এডভেঞ্চার, ’৬০ এর দশকে ৬৬
©জয়ন্ত মজুমদার, ১৯৬৩ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
আম্ফান জয়ী গ্রামীণ স্থাপত্য : বারুইপুরের বাঁশের বাড়ি ৭২
©অরুনাভ সান্যাল, ২০১৮ স্থাপত্য বিভাগ
এক সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব গুহ ৭৬
©দেবাশীষ তেওয়ারি, ১৯৬৯ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
গ্রহণ ৮২
©বিমলেন্দু সোম, ১৯৬৭ স্থাপত্য
কঙ্কাবতী ৮৯
©বন্দনা মিত্র, ১৯৮৬ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

ফালক্রাম (fulcrum) ৯৩
©দীপঙ্কর রায়, ১৯৮০ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
নেশা ৯৬
©রঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, ১৯৭২ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
Sketches 100-102
©Dipayan Lodh, 2009 Civil Engineering
©Ajay Kumar Basak, 1972 Civil Engineering
©Ajay Debnath, 1970 Electrcal Engineering
অনুপ্রেরণা ১০৩
©অনিরুদ্ধ রায়, ১৯৮৩ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
শান্তনু'র কড়চা ১০৬
©শান্তনু দে, ১৯৮৬ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
ফুটকি রাণী ও মুনু'বাবু ১১৩
©অসীম দেব, ১৯৭৭ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
সুধীন বাঁড়ুজ্যের কৌতূহল ১১৯
©নীলাদ্রি রায়, ১৯৮৩ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
কলেজ কেটে বাবাজীর কাছে আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য ১২৩
©বিপুল চক্রবর্তী ১৯৮৬ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
People 129
©Shruti Goswami, 2004 Architecture and Planning
A Soldier's Kiss – (যুদ্ধ নয় শান্তি চাই) 130
©অনুবাদ- সোহম দাশগুপ্ত, ১৯৭৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
Fear By Khalil Gibran 131
ভয় ১৩২
©অনুবাদ- সোহম দাশগুপ্ত
Charlotte Dod – The Superstar of Women's Sports 133
©Kuntala Bhattacharya, 1999 Electronics & Tele Communication Engineering
ওরা থাকে ওধারে ১৩৬
©মনোজ কর, ১৯৮০ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
Helen, the Queen of Nautch Girls 144
©Pradip Bhaumik, 1974 Mechanical Engineering
গঙ্গাধর মণ্ডল ও আমার জীবনের এক বিরাট পরীক্ষা ১৪৯
©অমিতাভ দত্ত, ১৯৭৪ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
জিম করবেট সফর ১৫৫
©সুকান্ত রায়, ১৯৭৭ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
সংযোজন – হিমাংশু নাথ, ১৯৭৭ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

ঝাঁটা ১৬০
©সুদীপ রায়, ১৯৭০ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং
ভ্যালেনটাইন দিবস : প্রেমের ত্রিধারা ১৬২
©ময়ূখ দত্ত, ১৯৯০: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
বোকারো ট্যুর ১৭০
©দীপক চক্রবর্তী, ১৯৭৬ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
কিছুই তো বুঝি না ১৭৪
©অর্ণব চ্যাটার্জী, ১৯৮৩ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
যাত্রা ও অযাত্রা, শুভ ও অশুভ – মানি বা না মানি! ১৭৯
©স্নেহাশীষ ঘোষ, ১৯৭৪ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
রাজস্থানের জাওয়াই বেরা ১৮৬
©তাপস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
বর্ষাস্মৃতি ১৯০
©তাপস সামন্ত ১৯৯১ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
টেলিস্কোপ ১৯৭
©নবেন্দু সিনহা, ১৯৯৮ কম্পিউটার সায়েন্স
এপিফ্যানি (ইন্টারভিউ) ২০২
©গণেশ ঢোল, ১৯৮৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

ফিশ ওর্লী ও নারায়ণ সান্যালের মেয়ের বিয়ে

সূত্র : পঞ্চাশোর্ধে - নারায়ণ সান্যাল, ১৯৪৮ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

পঁচাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। নারায়ণ সান্যালের বড় মেয়ের বিয়ে। অতিথি ভোজনের দায়িত্বে বিজলি ক্যাটারার। নিমন্ত্রিতদের তালিকায় বিভিন্ন গণ্যমান্যদের মধ্যে আছেন ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎ খবর এল ভাষাচার্য একটু আগেই এসে পড়েছেন, তাঁকে এখনি একটা সেমিনারে যেতে হবে। তাঁকে ঘরে বসিয়ে নারায়ণ সান্যাল ছুটলেন ছাদে বিজলী গ্রিলের ম্যানেজারের কাছে।

"আমার একজন অতি বিশিষ্ট অতিথি এসে পড়েছেন। আপনার মেন আইটেম কয়েকটি একটা প্লেটে সাজিয়ে দিন।"

একটু পরেই ম্যানেজার ভদ্রলোক একটি থালায় আহার্য সাজিয়ে নিয়ে এলেন। খেতে খেতে হঠাৎ সুনীতিবাবু একটি ভোজ্যদ্রব্যের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন "ওটা কী?"

বিজলী গ্রিলের ম্যানেজার হেসে বললেন "ওটা ফিশ ওর্লী, খেয়ে দেখুন, ভেটকি মাছের স্পেশ্যাল আইটেম।"

"ফিশের কী?"

"আজ্ঞে ওর্লী।"

সুনীতিবাবুর চর্বণকার্য বন্ধ হল। সোজা হয়ে বসলেন তিনি।

"ফিশের ওর্লী মানে কী? কোন দেশের খাবার?"

"ভেটকি মাছের ফিশ ওর্লী স্যার! ইয়ে মানে ওর্লী।"

"বানান কী?"

স্যুট পরিহিত ম্যানেজার গলার টাইটা আলগা করে দিয়ে আমতা আমতা করে বললেন "ও আর লয়ে রেফ দীর্ঘ ঈ।"

সুনীতিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন "আমি রোমান বানানটা জানতে চাইছি।"

ম্যানেজার এবার আত্মসমর্পণ করে বললেন "ঠিক জানি না। শুনেছি জার্মান, না জার্মান নয়; ফ্রেঞ্চ বোধহয়।"

সুনীতিবাবু হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন "উঁহু, জার্মান ভাষায় ভাজাকে বলে Gebacken, অথবা Gebraten। ফরাসি ভাষায় ভাজা মাছ হচ্ছে Frit Poissons। ওর্লী তো জার্মান বা ফরাসি খাদ্য তালিকায় নেই। স্প্যানিশ ভাষায় ভাজা মাছ হচ্ছে

Frito Pescado, ইতালিয়নে বলে Fritte Pesce। ওর্লী এল কোথা থেকে?"

মাথায় উঠল খাওয়া। বোঝা গেল ওর্লীর ব্যুৎপত্তি জানা না গেলে অচলাবস্থা কাটবে না। নারায়ণবাবু অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে। হঠাৎই তাঁর মেজদা বললেন "আজ্ঞে, আপাতত এল রান্নাঘর থেকে। স্রেফ মাছ ভাজা বলেই ধরে নিন না। ব্যুৎপত্তিগত না হোক উৎপত্তিগত হদিসটা তো পেলেন।"

হেসে উঠলেন সুনীতি বাবু। "তাই বলুন মাছ ভাজা, ওর্লী নয়। তাহলে উল্টে খাওয়া যেতে পারে। ওর্লীর এপিঠ ওপিঠ কিছুই জানি না কিন্তু ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি।"

পরে বিজলী গ্রিলের ম্যানেজার নারায়ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "উনি কে স্যার?"

"আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি বাবু, ভাষাবিদ।"

ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন "আর কজন ভাষাবিদ আপনার অতিথি তালিকায় আছেন?"

নারায়ণবাবু বললেন "আর কেউ নেই। আপনি নির্ভয়ে ফিশ ওর্লী চালাতে পারেন।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন "নাঃ, আর ভয়ের কী আছে? ব্যুৎপত্তিগত না হোক উৎপত্তি তো জানা গেছে – রান্নাঘর।"

শিং ভেঙে বাছুরের দলে

©বাদল সরকার, ১৯৪৭ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

পিতামাতার ইচ্ছায় এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, পরে নিজের ইচ্ছায় এবং উপার্জনের টাকায় টাউন প্ল্যানিং, কিন্তু একটা সুপ্ত ইচ্ছা অনেকদিন ধরে ছিল মনে।

হয়েছে কী, বই পড়ার নেশা ছোটবেলা থেকেই, তারপর সুকুমারীদির ঠেলা ছিল, কিন্তু বিশাল বিশাল বই পড়ে ওঠা হত না বড় একটা। জানতাম, ঘাড়ে একটা জোয়াল না পড়লে সেসব বই পড়া হবে না।

আমি বিজ্ঞানের দিকের ছাত্র। ইংরিজি নিয়ে পড়তে গেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ঠেকে যায় – একবার চেষ্টা করে দেখেছি।

তখন আমার বয়স চৌষট্টি, যাদবপুর স্টেশনে রেললাইন পার হলে পূর্বদিকে সন্তোষপুর, সেইখানে বাসা। অর্থাৎ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হাঁটাপথ। ওখানকার তুলনামূলক সাহিত্যের এক ছাত্রীর মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানলাম, বিজ্ঞানের দিক থেকে গেলেও ওই বিষয়ে এম.এ. পড়া যাবে, যদি ওদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উতরাতে পারি। সে অবশ্য এক ভীষণ পরীক্ষা চারদিনের, দুদিন চার ঘণ্টা করে, দুদিন তিন ঘণ্টা।

আমি ভর্তি হবো শুনেই প্রবল আপত্তি ওখানকার অধ্যাপকদের। যার মাধ্যমে খোঁজ নিয়েছিলাম, তারই কাছে শুনলাম এ-কথা। আপত্তির কারণ জানতে দেখা করলাম গিয়ে তাঁদের সঙ্গে। একজন বললেন, "আপনি ক্লাস করতে পারবেন?" আমার হালচাল জানা ছিল; বললাম, "আপনাদের সব ছাত্রছাত্রী কি নিয়মিত ক্লাস করে? তাদের অনেকের থেকে আমি বেশি ক্লাস করব।" ওঁদের বোধহয় মনে হয়েছে – আমি ডাকসাইটে পণ্ডিত, স্রেফ ওঁদের জব্দ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভর্তি হতে চাইছি। শেষ অবধি বললাম, "অ্যাডমিশন টেস্টে পাস করতে না পারলে নেবেন না; কিন্তু পারলে নেবেন না কেন?" অবশেষে বোধহয় বিশ্বাস হল – আমার কোনো বদ মতলব নেই।

সেই দুরূহ পরীক্ষায় উতরে ছিলাম শুধু আমি আর প্রাণিবিজ্ঞানের স্নাতক একটি ছেলে। বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের ওপর আর ইংরিজি-বাংলা ভাষার দখলের ওপর প্রশ্নপত্র, বই পড়ার নেশা থাকলে ওটুকু জ্ঞান আয়ত্ত হয়ে যায়। সেটুকু জ্ঞানও ছিল না বাকি ডজনখানেক পরীক্ষার্থীর।

তা-ও শেষ মুহূর্তে কেঁচে যাচ্ছিল। কলেজ ইউনিভার্সিটির কেরানিরা মনে করে – তারাই সবকিছু চালাচ্ছে, অধ্যাপকরা ফালতু মাইনে খায়। সেই দর্পে এক কেরানি তার সামনে চেয়ার থাকলেও আমাকে বসতে বলেনি, যদিও আমি তার বাপের বয়সী। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট না কী একটা যেন লাগে, আগে যেখান থেকে পাশ করেছি সেই প্রতিষ্ঠানের, সেটা নেই বলে ভর্তি হতে পারব না আমি – বেশ কড়া করে বলে দিল সে। ততক্ষণে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে; বললাম, "ওসব কিছু নেই আমার, দিতে পারব না। ভর্তি হওয়ার দরকার নেই আমার, চললাম।" ঘরের অন্য কেরানিরা বোধহয় কানাঘুষোয় আমার কথা শুনেছিল, আটকে দিয়ে খাতির করে বসাল; বলল, "রেজিস্ট্রারকে ফোন করছি, একটু বসে যান।" খানিক পরে ডাক পড়ল, রেজিস্ট্রারের ঘরে নয়, খোদ ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরে। সেখানে বড়ো এক মিটিং চলছে। টেবিলের কাছে পৌঁছোবার আগেই তিনি বললেন, "বিখ্যাত হলে কি ক্লাসমেটকে ভুলে যেতে হয়?"

তিনি শঙ্কর সেন, পরে বামফ্রন্টে বিদ্যুৎমন্ত্রী হয়েছিলেন। আমার ক্লাসে অবশ্যই ছিলেন না – হয় আগের, না হয় পরের। যা-ই হোক, বললেন, "ওই সার্টিফিকেটটা লাগবেই, দুই বছরের মধ্যে কোনো একদিন এনে দিও।"

বেঙ্গল ল্যাম্পের বাসস্টপে নেমে ফটক দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকে প্রথম যে তিনতলা বাড়িটা, তার দোতলায় আমাদের বিভাগ। তিনতলায় ইংরিজি আর বাংলা। প্রথম দিন গিয়ে দেখি, গিজগিজ করছে ছাত্রী; ছাত্র চোখেই পড়লো না। যে-ভদ্রলোক আমার কাগজপত্র দেখে লিখে-টিখে নিলেন, পরে জেনেছি তিনি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মতো তিনিও বিজ্ঞান শাখা থেকে এসে এখানে পড়ে ডক্টরেট করে অধ্যাপক হয়েছেন।

ছোট ছোট ক্লাসরুম। চারটে কি পাঁচটা বেঞ্চির সারি। ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী যদি একদিনে আসত, তবে বোধহয় স্থান সংকুলান হত না। তা কখনো আসে না। কারণ, উপস্থিতির হিসাব, যাকে পার্সেন্টেজ বলে, তা রাখা হয় না, রোলকল বলে কিছু নেই। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে সুমনকে ক্লাসে কোনোদিন দেখিনি। সে অবশ্য আমেরিকা চলে গেছিল বলে পরীক্ষা দিয়েছিল পরের বছর। মাস কয়েক পরে একটি ছেলের সঙ্গে বারান্দায় আলাপ হয়েছিল। সে আসানসোলে চাকরি করে, এখানে নাম-লেখানো ছাত্র।

প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসে কিন্তু নাম ডাকলেন অধ্যাপিকা। যারা এখানেই বি.এ. পাশ করেছে, তারা সবাই তো তাঁর চেনা, নতুনদের চেনবার জন্যে নাম ডাকা। সুধীন্দ্র সরকার নামে ইয়েস প্লিজ বলায় তিনি চমকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর জানা ছিল, বাদল সরকার ভর্তি হয়েছে, ইনি আবার কিনি?

তুলিকা নামে একটি মেয়ে আমার প্রথম দিনের বিভ্রান্তি অনুভব করে নিজে থেকে আমার সঙ্গে ভাব করে নানাবিধ সাহায্য করল। "ক্লাসমেট যখন, তখন তুমিই

বলব?" পরে সকলেই তুমি বলত। আজকাল অবশ্য এইটাই রেওয়াজ। আমাদের 'শতাব্দী'র প্রবীণরা এখনো আমায় 'আপনি' বলে, ছোটরা বলে 'তুমি'।

তুলিকা আমায় লাইব্রেরি, রেফারেন্স লাইব্রেরি, ক্যান্টিন – সব চিনিয়ে দিল। মেয়েটির দুটি গুণ – খুব ভালো গান করে আর আশ্চর্য রকম মানুষের নকল করতে পারে। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি এমন সুন্দর নকল করেছে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

নবনীতা দেবসেন প্রথম ক্লাস নিতে এসেই বললেন, "আপনি ক্লাসে থাকলে ভয় করে মশাই।" আমি বললাম, "ভয়ের কোনো লক্ষণ তো দেখছি না আমি?"

প্রফেসর অমিয় দেব অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ পড়াবেন। প্রথম দিনে জানতে চাইলেন – নাটকটা অনুবাদে কে কে পড়েছে। সুনীল চট্টোপাধ্যায়, অর্থাৎ পল্টুদার কাছ থেকে ধার করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পড়েছিলাম, একমাত্র আমিই হাত তুলেছি। উনি বললেন, "ইউ আর এক্সেম্পটেড স্যার।" যাববাবা, কী ধারণা করে রেখেছেন আমার সম্বন্ধে এঁরা? এদিকে পড়ায় অনেক খামতি আছে বলেই তো ভর্তি হয়েছি এখানে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মাত্র দুজনের পড়ানো ভালো লেগেছে আমার। একজন নবনীতা দেবসেন, কিন্তু তিনি ক্লাস নিতে খুব কমই আসতেন। অথচ তাঁর নামেই বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠিত এই বিভাগের যেটুকু আন্তর্জাতিক খ্যাতি। অন্যজন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বয়স অল্প। তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, তবু পঞ্চাশ-ষাটটা সিগারেট খান দিনে, নিয়মকানুনের পরোয়া না করে এক ঘণ্টার ক্লাসেই গোটা তিনেক খেতেন। তিনি বাংলা কাব্য পড়িয়েছেন – রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ইত্যাদি, আবার ইংরিজি শেক্সপিয়র, ড্রাইডেন, মলিয়ের, রাসিন, কর্নেই – ওঁদের নাটকও পড়িয়েছেন। বাংলা পড়াবার সময় একটাও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করতেন না, শিক্ষিত বাঙালির পক্ষে এটা দুঃসাধ্য কাজ। হয়তো কোনো ছাত্রীকে একটা প্রশ্ন করেছেন, সে তো ইংরিজি মাধ্যমে পড়েছে, একটা বাক্যের মধ্যে তিনটে ইংরিজি শব্দ। "ওটার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই?" মেয়েটি দিশেহারা। তারপর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে জানলার বাইরে চোখ রেখে বলতেন, "একটা ভাষাহীন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে - না বাংলা, না ইংরিজি। পরের প্রজন্মেও কিছু হবে না, তার পরের প্রজন্মে যদি কোনো বদল হয়।"

শিবাজীর পড়াবার গুণে পড়বার ইচ্ছে তৈরি হত, না পড়ার জন্যে লজ্জাবোধ আসত। এইটাই তো অধ্যাপনার প্রধান গুণ। কবিতা পড়ায় আমার বেশ অনীহা আছে, বিশেষ করে ইংরিজি কবিতা। সঞ্চয়িতারও অর্ধেক কবিতা পড়া ছিল না। শিবাজীর পড়ানোর খোঁচায় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে বইটার সব কটা কবিতা টেনে পড়েছি।

লাইব্রেরি থেকে বই নেওয়ার চেষ্টা করা দেখলাম বৃথা। সকালে খেটেখুটে

ক্যাটালগের কার্ড ঘেঁটে খান চার-পাঁচ বই স্লিপে লিখে জমা দিলাম, বিকেলে গিয়ে তার একটাও পেলাম না। অগত্যা লাইব্রেরির একতলার আর দোতলার তিনটে রেফারেন্স লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে পড়তাম। আমাদের একতলার বিভাগীয় লাইব্রেরি থেকে অবশ্য বই নেওয়া যেত, এখানে বসে পড়াও চলত। ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাড়ির ভিতর আজ অবধি ঢুকিনি, একবার একজন নিয়ে ওখানকার ক্যান্টিনে চা খাইয়েছিল। তেমনি রামকৃষ্ণ মিশন, ম্যাক্সমুলার ভবন – ওসব লাইব্রেরিতেও পদার্পণ করিনি। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা রেফারেন্স বই বলে লম্বা লিস্টি দিতেন প্রতি বিষয়ে, দুদিন পরে আমি সেসব নাম টুকতামও না, আর জানি তো যাবো না কোনোদিন ওসব লাইব্রেরিতে। আমার তো শুধু বই পড়তে ভর্তি হওয়া। ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার কথাও ভাবিনি তখন। বেশির ভাগ সাধারণ ছাত্রী বাছাই করতো – এই এই বড়ো উপন্যাস বাদ দেওয়া যায় বিকল্প প্রশ্নের ভরসায়, আর আমি কোনো লেখকের একটা বই পাঠক্রমে থাকলে তাঁর অন্য বইও যতটা পারি জোগাড় করে পড়ে যেতাম। এমনি করে জেন অস্টেন, ডস্টয়েভস্কি, কাফকা প্রমুখ লেখকের বেশ কটা বই পড়া হয়ে গেল। আবার রেফারেন্স লাইব্রেরিতে বসে বাংলা গল্প-উপন্যাসও পড়েছি, যা আগে পড়া ছিল না।

গ্রিক নাটক – একটা নতুন জগৎ। খুঁজে পেতে, ধার করে, উপায়ান্তর না থাকলে কিনে পুরো বত্রিশটা গ্রিক ট্র্যাজেডি পড়ে ফেলেছি। অ্যারিস্টোফেনিসের নাটক আমাদের কোর্সে ছিল না, তাঁরও সব কটা কমেডি পড়েছি। শেক্সপিয়রের তিনটে নাটক ছিল সিলেবাসে, উঠেপড়ে আরো পড়েছি, কিন্তু সব কটা পড়ে ওঠা হয়নি। পরীক্ষার পাট চুকে গেলে বাকিগুলো বাকিই রয়ে গেল।

মহাকাব্য – আর এক দুনিয়া। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়া ছিল আগে। রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত দুটোও। সেগুলোর আয়তন দেখে ধারণা হয়েছিল, মহাকাব্য মানেই এ রকম ওজনের বই। আবিষ্কার করলাম – ইলিয়াড আর ওডিসি মাত্র তিন-চারশো পাতার বই। জার্মান এপিক নেবুলুঙ্গেনলিয়েড, আগে নামই শুনিনি। নামটা আয়ত্ত হওয়ার আগে ওটাকে নিজের মনে 'নেবুলঙ্কা' করে নিয়েছিলাম। সেও বেশি বড়ো নয়। ডন কুইক্সোটে, যেটার নাকি প্রকৃত উচ্চারণ ডন কিহোটে, তার অতি সংক্ষিপ্ত রূপ বাংলা অনুবাদে পড়েছিলাম। এখন দুটো খণ্ডই পড়ে ফেললাম, হাজার দুই পাতা। পড়ে দেখলাম, দ্বিতীয়টা অনেক বেশি ভালো প্রথমটার চেয়ে। ভিক্তোর হুগো যে কবিও বটে – সে-কথা এখানেই প্রথম জানলাম। তাঁর কবিতাই শুধু ছিল কোর্সে। কিন্তু আমি 'হাঞ্চ ব্যাক অব নোতরদাম' উপন্যাসটা পড়ে ফেললাম। গ্যেটে, শিলার – এসব কি পড়তাম কোনোদিন? হেনরি ফিল্ডিংয়ের নামই শুনিনি, টম জোন্সকে লন্ডনে অনেকদিন আগে সিনেমায় দেখেছিলাম। সিলেবাসে ছিল না, তবু পড়ে ফেললাম, আটশো পাতার উপন্যাসটা।

গ্রিন পার্কের বাসায় থাকার সময়ে কালিন্দী হাঁটা পথ, সেখানে অধ্যাপক বিষ্ণু বসুর বাড়ি। উভয়ত যাতায়াত ছিল। তাঁর বইয়ের সংগ্রহ বিপুল, সেখান থেকে অনেক বই ধার করেছি। পল্টুদার কাছ থেকেও।

মাঝখানে ঘা পড়ল। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে পটল তোলার অবস্থা হল। আটদিন জ্ঞান নেই, 'কোমা' যাকে বলে। তবু যে মরিনি, তার একটা কারণ – বাইরে যতই দুবলা চেহারা হোক, শরীরের ভিতরে কলকব্জা মজবুত। হৃৎপিণ্ড সতেজ, রক্তচাপ স্বাভাবিক, রক্তে মিষ্টতার আধিক্য নেই। অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সের যাবতীয় রোগ আমাকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে ত্যাগ করেছিলো। দ্বিতীয় কারণ বোধহয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি।

বেঁচে ফিরলেও অনেক কিছু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতো পারত, এমনকি মস্তিষ্ক জখম হয়ে জড়বুদ্ধি হয়ে যাওয়াও। সে-কথা শুনে মনু ভেবেছিল, তার থেকে বাদলদার মরে যাওয়াই ভালো। ঠিকই ভেবেছিল। এসব কিছু হয়নি, জরিমানা গেছে ফুসফুস।

নতুন করে হাঁটতে, সিঁড়ি ওঠানামা করতে শিখছি, যাদবপুরে ক্লাস করতে যাওয়ার প্রশ্ন নেই, পড়াশুনোরও না। দুমাস তুবুলের আতিথ্যে কাটিয়ে আবার প্যারী রো। প্রথম বছরের বার্ষিক পরীক্ষাটাও দিতে পারিনি, নাইন্থ পেপারে চল্লিশ নম্বর ওটার জন্যে থাকে।

সুস্থ হলে গেলাম একবার। প্রফেসর অমিয় দেব তখন বাংলা-ইংরিজি তুলনামূলক সাহিত্যের ডিন। জিজ্ঞেস করলাম, আগামী বছরের ক্লাসে ভর্তি হওয়া সম্ভব কি না। শুনলাম – সিলেবাস বদলে যাবে, এবারই বসা ভালো, ও চল্লিশ নম্বরের মায়া ছেড়ে। তাতে অসুবিধে নেই, আমি তো তখনো পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিইনি।

মানিকতলা থেকে যাদবপুর, শরীরটাও মজবুত নেই, প্রচুর কামাই। শুধু শিবাজী ব্যানার্জির ক্লাস থাকলে যেতাম। আর নবনীতা দেবসেনের। একদিন দুটো নাগাদ তাঁর ক্লাস ছিল। বার্ষিক 'ফেস্ট' চলছিল, মিনিট কুড়ি বসে থেকে মেয়েরা সব চলে গেল, সেখানে রইলাম শুধু প্রাণিবিজ্ঞানের ছেলেটি আর আমি। খানিক পরে সেও বেরিয়ে গেল, আমি লাস্ট বেঞ্চে জানালার কাছে বসে নভেল পড়ছি, এমন সময় নবনীতার আবির্ভাব। অন্য ছাত্রটিকেও পথে পেয়ে ধরে এনেছেন। "এর মধ্যে সবাই চলে গেল কেন?" এক ঘণ্টার ক্লাসের আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর এই প্রশ্ন। ভাবলাম, এবার উনিও যাবেন। তা না, আমাদের প্রথম সারিতে বসিয়ে গল্প করতে শুরু করলেন। এমনি করে ঘণ্টা কাবার হল, আমি স্টেশনের রাস্তা ধরলাম।

ওখানে ছাত্রী যারা ছিল, এমনকি খুব ভালো ছাত্রী, যারা ফার্স্ট ক্লাস পাবেই, তাদেরও আসল লক্ষ্য পরীক্ষার নম্বর। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বিশেষ দেখিনি। এবং ইন্দ্রজিৎ এককালে ঐচ্ছিক বিষয় 'মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটারেচারে' ছিল, পরে

সেটা ফেলে দিয়ে উৎপল দত্তর নাটক নেওয়া হয়, তাও মৌলিক রচনা নয়। ইংরিজি নাটকের ভাবানুবাদ। তিনতলার বাংলা বিভাগে অবশ্য ছিল তখনো।

ভর্তি হওয়ার পরে ছাত্রীদের প্রশ্ন ছিল – আমি এম. ফিল. করব কিনা, পিএইচডি করব কিনা ইত্যাদি। একবার গিরিশ কারনাড এসেছে কলকাতায়, সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিভা অগ্রবালের বাড়িতে নাট্যকর্মীদের জমায়েত। বিভাগীয় লাইব্রেরিতে কিছু ছাত্রীর সঙ্গে দেখা, তার মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস পানেওয়ালি দেবালীও আছে। সে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য নিয়েছিল, যেটায় গিরিশের তুঘলক নাটকটা আছে। দুষ্টবুদ্ধি চাপল, বললাম, "তোমাদের তুঘলক নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? গিরিশের সঙ্গে সন্ধেতে আমার দেখা হবে, জেনে নিতে পারি।" শুনে কী উৎসাহ! দেবালী বলল, "তুমি গিরিশ কারনাডকে চেনো? আমাদের সঙ্গে আলাপ হয় না?"

আসরে গিয়ে গিরিশকে বললাম, "তোমার সৌজন্যে আমি 'রিফ্লেক্টেড গ্লোরি'তে উজ্জ্বল হতে পেরেছি আজ।" গল্পটা শুনে গিরিশ বলল, "ও তো আমার লেখার জন্যে নয়, ও হলো আমার ছায়াছবির 'ইমেজ'।" দেবালী শতকরা চৌষট্টি নম্বর পেয়ে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় চলে গেছিল। এখন কোথায় আছে, কী করছে জানি না। তবে হ্যাঁ, একদিন আমার অনুরোধে পড়ে দেবালী সমেত ওদের কয়েকজন লিন্ডসে স্ট্রিটে সিন্ধুভবনে আন্দ্রোক্লিস ও সিংহ দেখতে এসেছিল। পরদিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলাম। 'সিংগু পিংগু আমার সোনা সিংগু' গানটা ওদের কাছে 'হিট সং' হয়ে গেছে।

দিন পিছিয়ে আমাদের পরীক্ষাটা ১৯৯১ সালে না হয়ে বিরানব্বইয়ের জানুয়ারিতে হলো। '৯১ এর পুজোর পর আমি পরীক্ষায় বসা ঠিক করেছি। তখন মাথায় হাত – সেই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট! সেটার কথা তো ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। একবার ভাবলাম, চুলোয় যাক পরীক্ষা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটা ঝোঁক চেপে যায়। গেলাম এক সকালে বি.ই. কলেজে।

অদলবদল এতো হয়েছে যে আমাদের আমলের পরে রেজিস্ট্রারের অফিস খুঁজে বের করতেই অনেক সময় লেগে গেল। তারপর পাকা চুল, পাকা দাড়ি টাক মাথা এক বৃদ্ধ এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা দেবে, এ-কথা বুঝতে তাঁদের আরো সময় লাগল। এবার ডাকলেন তাঁর অফিসের এক নাট্যোৎসাহী কর্মীকে, থিয়েটারের ধানাই-পানাই। ওদিকে আমার দুপুরের খাওয়ার সময় পার হয়ে যায়। শেষে সেই কর্মীটিই আমাকে দোতলা না তেতলায় একটা ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে সব রেকর্ড থাকে।

আমি ১৯৪৭ এ এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি, শুনলাম স্বাধীনতার আগের সব নথিপত্র ভস্ম করে ফেলা হয়েছে। ভরসা এখন ১৯৫২-তে পাস করা টাউন প্ল্যানিং। তার সূত্র ধরে খোঁজ করা যেতে পারে যদি আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন

নম্বরটা দিতে পারি। সে কি মনে থাকা সম্ভব? হাল ছেড়ে ফিরে এলাম, পরীক্ষা না দেওয়ার সঙ্গে মানসিক মোকাবিলা করতে করতে।

কলেজ স্ট্রিটে সিনেট হলের পেছনে একটা ছোট্ট অফিস ছিল তখন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের। এখন তো সিনেট হলটাই নেই। তার কিছু কর্মী আমার হট্টমালার ওপারে নাটকটা অভিনয় করে প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছে। আমাদের থিয়েটার দেখতো খুব, যোগাযোগ রাখতো। কোনো আশা না রেখেই সেই অফিসে গিয়ে সমস্যাটা নিবেদন করলাম। আশ্চর্য, আমাকে বসিয়ে রেখে ওদের একজন দপ্তরের থলি খুঁড়ে আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বের করে আনলো! আমার পরীক্ষায় বসার পথ পরিষ্কার হল।

একদিন আমাদের বিভাগীয় পাঠাগারে এক সুন্দরীকে দেখলাম, একজন পরিচয় করিয়ে দিল। সে বছর তিন-চার আগে এখানে ছাত্রী ছিল, পরীক্ষার আগেই বিয়ে করে কানপুরে চলে গেছে পতিগৃহে। এখন তার পরীক্ষাটা দেওয়ার বাসনা হয়েছে, কিন্তু পাহাড়প্রমাণ সিলেবাস দেখে ঘাবড়ে গেছে। দুহাজার পাতার ডন কিহোটে কী করে সে পড়ে এখন? একটা পাজি মেয়ে 'বাদলদা সংক্ষেপে বলে দেবে' বলে কেটে পড়ল, সেও কুটো আঁকড়ে ধরছে। সেইখানে বসে মিনিট কুড়িতে তাকে উপন্যাসটার সংক্ষিপ্তসার বোঝালাম। সে যে কী বোঝানো, তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। সে কিন্তু তৃপ্ত এবং বাকি দিন কটা কুটোটা ধরেই রইল।

পরীক্ষার দিনগুলোয় দূর পথ পার হওয়ার ঝামেলা এড়াতে আগের রাতে যোধপুর পার্কে কানু-মনুর বাড়িতে থাকতাম, যতটা পারি নোট পড়তাম। সকালে ওখানে খেয়ে হেঁটে কলেজে যেতাম পরীক্ষা দিতে। চার ঘণ্টার পরীক্ষা এক এক দিনে বেলা বারোটা থেকে।

'ভাইভা'র দিনে এক মজা। আমাকে অধ্যাপকরা কী প্রশ্ন করেন, তা নিয়ে আমার কৌতূহল, অন্যদেরও। আমার পদবির আদ্যাক্ষরের কৃপায় সকালে গেলেও আমার পালা আসবে বিকেলে। কানপুরবাসিনীর পালা তারও পরে, যদিও তার নাম-পদবি ভুলে গেছি। সে তো বেরিয়ে আসা অন্যদের কাছে প্রশ্নাদি শুনে আমাকে পাকড়াও করে উত্তর জানার চেষ্টা করে চলছে ক্রমাগত।

বিকেলের দিকে আসর প্রায় ফাঁকা, তখন ডাক পড়লো আমার। ওনারা মাথা খাটিয়ে প্রথমদিকে প্রশ্ন করার ভার দিয়েছেন এক্সটার্নাল একজামিনারকে। যেহেতু আমাদের পরিচয় ছিল না, তিনি সাহস করে আমায় প্রশ্ন করতে পারবেন, তাই। সেসব চুকে গেলে বিভাগের অধ্যাপকদের প্রশ্ন শুধু একটাই – 'আপনি তো এখানে পড়লেন, পাঠক্রমে কী কী বদলানো যায় আগামী দিনে, একটু বলুন।' তার আমি কী জানি? কিন্তু ওটাই ওঁদের চাল।

বেরিয়ে দেখি - দু-তিনজন মাত্র বাকি, তার মধ্যে কাঁদো কাঁদো মুখে সেই মেয়ে।

আমাকে রিহার্সালে যেতে হবে, বাধ্য হয়ে ওকে একা ফেলে চলে যেতে হল। তখন কাঁদেনি, কিন্তু পরে শিবাজীর মুখে শুনেছি, সে ঘরে ঢুকে কোনো প্রশ্ন শোনার আগেই ভ্যাঁ করে কেঁদে দিয়েছে। শিবাজী বললেন, এ ঘটনা নাকি নতুন কিছু নয়। যা-ই হোক, সে মেয়ে কিন্তু পাস করে গেছিল। পরে কানপুর থেকে চিঠিও লিখেছিলো। তার পতিদেবতা কানপুর আইআইটিতে পড়ায়, দুজনের হয়ে তার নিমন্ত্রণ - একবার যদি যাই ওদের আতিথ্যে দু-চার দিন কাটাতে। যাওয়া অবশ্য হয়নি।

এলোমেলো ঘাঁটছি কাসুন্দি, তাই পরীক্ষার আগের কিছু চুটকি গপ্পো এখানেই করা যেতে পারে। আমি দুপুরে গেটের বাইরে এক ঝুপড়ির দোকানে টোস্ট ডিম ভাজা খেতাম, মাঝেমধ্যে ক্যান্টিনেও যেতাম খেতে। সেখানে আলাপ হয়েছিল আমার আগের বছরের এক ছাত্রের সঙ্গে। সে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। যথারীতি নাম ভুলে গেছি, মনে হয় তালব্য শ দিয়ে আরম্ভ তার নাম, 'শ' বলেই চালাই। সে তার বাবার গল্প বলেছে কিছু মজার মজার। ভদ্রলোকের ব্লাড সুগার ছিল। বাজার করে ফেরার সময় থলিতে একটা ক্যাডবেরি চকোলেটের ছেঁড়া মোড়ক পাওয়া গেল একদিন। বাড়ির লোক চেপে ধরেছে, তিনি বললেন, "ফ্যালাইয়া দিছিলাম তো, আবার থলির মধ্যে ক্যামনে আইলো?" অর্থাৎ দুষ্কর্মটা তিনি বাজারে গেলেই করে থাকেন, আজ কপালদোষে খোসাটা উড়ে থলিতে আটকেছে।

তিনি আর তাঁর এক সহকর্মী নিমন্ত্রিত হয়ে নরওয়েতে গেছেন এক সেমিনারে। মিডনাইট সান দেখার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে মধ্যরাতের সূর্য দেখতে দেখতে ফেরার বাস ছেড়ে গেছে। নির্জন জায়গা, একটা বাড়ির দরজায় টোকা দিতে এক বৃদ্ধা বেরোলেন। তিনি দয়াবতী, আশ্রয় দিলেন, কিন্তু বললেন – আর কিছু নেই, ডিম ভেজে দিতে পারেন। এটা পরম ভাগ্য তাঁদের, কিন্তু 'শ'-এর পিতা সেই অমলেট খেয়ে বললেন, "এইডা কী খাইলাম? এতো আমাগো পাইকপাড়াতেই পাওন যায়, এর লেগ্যা নরওয়েতে আইলাম?"

বাকি সব ভুলে গেছি, তবে জানি সেই ছেলে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি নিয়ে সাংবাদিকতার পেশা নিয়েছিল। ঢোকবার কিছুদিন পরে উপরের রেফারেন্স লাইব্রেরিতে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল এক সুন্দরী, খানিকটা হিন্দি ছবির রাভিনা ট্যান্ডনের মতো চেহারা। সে নাকি আমার সহপাঠিনী। অ্যাদ্দিন এলাহাবাদ না কোথায় ছিল বলে ক্লাস করতে আসেনি। আজ এসে আমার কথা শুনে খুঁজে পেতে আলাপ করতে এসেছে। ব্যস, তারপর আর পাত্তা নেই তার। শুনলাম, কমপ্লিট পাস করে চাকরির কোনো আশা নেই বলে সে একটা কম্পিউটার কোর্স নিতে গেছে। সুতরাং, আমার থেকে এক বছর জুনিয়র হয়ে গেলো সে। এই মেয়ের নাম শর্মিষ্ঠা। এর আর মৌসুমীর নাম আগে করেছি আমার ছাত্রী বলে, সেই সুবাদে এরা আমার ছাত্রী। কারণ, এরা আর অন্য দুজন মেয়ে আমার কাছে পড়তে আসত, আমি

যথাসম্ভব জ্ঞান বিতরণ করতাম নোট ঘেঁটে, ওদের তাতে কতটা কাজ হচ্ছে তার পরোয়া না রেখে।

তিনতলায় বাংলা বিভাগে শঙ্খ ঘোষ পড়ান, দারুণ ভালো নাকি তাঁর পড়ানো। শুনেছি, তাঁর গলা খারাপ বলে ছাত্রছাত্রীরা চাঁদা তুলে একটা মাইক কিনে দিয়েছিল তাঁকে। খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর ক্লাস করি একদিন, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। একদিন যাদবপুর স্টেশনে পৌঁছেছি, বাংলা বিভাগের একটি মেয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। সে আমায় চেনে। বললো, সে শঙ্খবাবুর ক্লাস করতে যাচ্ছে। এই সুযোগ, সময়টা জেনে নিলাম। সময়মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, দেখি শঙ্খবাবুও উঠছেন। প্রশ্ন করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন?" মহোৎসাহে বললাম, "আপনার ক্লাস করতে।" দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, বললেন, "তবে আমি ক্লাস নিতেই যাবো না।" ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লেগেছে। বললাম, "কিন্তু আমাকে তো আমাদের বিভাগের সবাই পড়ান?" জবাব এল, "ওদের সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।" যখন বুঝলাম তিনি দৃঢ়সংকল্প, তখন বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হল।

নিয়ম অনুসারে দুবছর অন্তর বিভাগীয় প্রধানের বদল হয়। বাংলার সুবীরবাবু তখন প্রধান, তাঁর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে গরম হয়ে তাঁর কাছে নালিশ জানালাম, "শঙ্খবাবু আমাকে তাঁর ক্লাসে ঢুকতে দেননি। আর বলেছেন, আপনাদের সাহস দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।" সুবীরবাবু খুব মজা পেলেন, বললেন, "তবে তো তাঁকে কাপুরুষ বলতে হয়?" বললাম, "বলবেন তো ওঁকে!" শিবাজীর মুখে শোনা গল্প। নবনীতা দেবসেন, অমিয় দেব আর মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনামূলক সাহিত্যে সহপাঠী ছিলেন গোড়ার দিকে। নবনীতার স্বভাব, তাঁর গল্পে চেনা লোকের কথা ঢোকানো। কোনো এক গল্পে লিখেছেন – তাঁর অমুক বইটা পাচ্ছেন না, বোধহয় মানবের কাছে আছে। তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। মানববাবু চ্যাঁচাচ্ছেন, তাঁর কাছে মোটেই নেই। নবনীতা বলছেন – আহা, ওটা তো উনি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে লিখেছেন, ও ধরনের বই মানব ছাড়া কে পড়তে চাইবে? মানববাবুর উষ্মা কমে না। শেষে নবনীতা বললেন, "বেশ করেছি লিখেছি, শালা কী করবি?"

কিছু ক্লাস নবনীতার ছোট্ট ঘরটায় হত, আমরা চেয়ার ভাগাভাগি করে বসতাম। পোপের কাব্য পড়াচ্ছেন। 'পোপ বলছেন - দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র আছে, তার বাইরে যেন কেউ না যায়। যেমন: তুমি নবনীতা দেবসেন, নাটক লিখতে যেও না, ওটা বাদল সরকারের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি গল্প লিখছো, তাই লেখো।' পাশেই বসা আমার দিকে না তাকিয়ে খুব অনায়াসে বলে গেলেন এসব।

পরীক্ষার ফল বের হল। দেবালী আর রিনা ফার্স্ট ক্লাস। সেকেন্ড ক্লাসে দুটি মেয়ের পর আমি। ৫৪.৩%, পাঁচ নম্বরি।

একটি কবিতা

©বিনয় মজুমদার

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো – এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে অপক্ক রক্তিম হ'লো ফল

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার শাদা পালকের নিচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;
স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে-পাহাড়ে;
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু
এমন সময়ে তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি... তুমি...
কিংবা, দ্যাখো, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা

পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;
তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

"আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো,
অবয়বহীন সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথীবীর সব আকাশে।"

সময়ের সাথে এক বাজি ধরে পরাস্ত হয়েছি।
ব্যর্থ আকাঙ্খায়, স্বপ্নে বৃষ্টি হয়ে মাটিতে যেখানে
একদিন জল জমে, আকাশ বিস্বিত হয়ে আসে
সেখানে সত্বর দেখি মশা জন্মে; অমল প্রতূষে
ঘুম ভেঙ্গে দেখা যায়; আমাদের মুখের ভিতর
স্বাদ ছিল, তৃপ্তি ছিল যে সব আহার্য প'চে
ইতিহাস সৃষ্টি করে; সুখ ক্রমে ব্যথা হয়ে উঠে।
অঙ্গুরীয় নীল পাথরের বিচ্ছুরিত আলো
অনুষ্ণো অনির্বাণ, জ্বলে যায় পিপাসার বেগে
ভয় হয় একদিন পালকের মত ঝরে যাব।

(২১ জুন ১৯৬১ – ফিরে এসো চাকা – বিনয় মজুমদার)
(এটি 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা)

Prof. A. Macdonald, and Our Days of 1928-1932

©Amulyadhan Deb, 1932 Mechanical Engineering

> *"If you travel by rail for 100/200 miles and whatever rail tracks, bridges, roads and engineering constructions you see, you should know that most of those were built with the supervisions of engineers of Shibpur and Roorkee."*

This is what Prof. Macdonald told me when I was selected for my apprenticeship with the Indian Railway.

****

Prof. A. Macdonald was the first non-engineer Principal of our college in our early thirties. He taught us mathematics, with Prof. J.M. Bose (Bar-at-Law), who used to give us home task at the flat rate of 50 correct repetitions for each incorrect solution or answer. Prof. Macdonald's predecessors in office were all Civil Engineers, and their sectarian outlook was not imperceptible. I recollect our Prof. Macdonald's effort for the recognition of BE College by the Chartered Institution of UK. He carried the design plates of fourth year student Phani Chakrabarty, while he went on furlough.

It was Prof. Macdonald who introduced B.E. degree in Mechanical engineering for the students of 1932, and then for Electrical stream in the year 1934. Before that, the syllabi of Civil and Mechanical engineering diploma were the same for the first two years, that was known as Intermediate Engineering (I.E.) examination. 3 students from our batch passed I.E. in 1930, along with Civil engineering students. Immediately after, he announced the introduction of Mechanical engineering and offered us the option of joining the degree course. Many of us agreed, and he then taught us Rigid Dynamics, accommodating

students of Civil stream also. Instead of physics, we had metrology. Chemistry remained same as for Associateship examination. So, the introduction of a new Degree was smooth, and without any extra cost burden. At the end of third year, we had University examination for non-professional subjects (B.E. – non-prof). In our fourth year, our degree classes were same as Associateship classes. So, no major hurdle to cross.

Sir Ashutosh Mukherjee Memorial Medal and Prize was introduced for the students who stands first in order of merit. I received it in 1931 for Mechanical and Electrical engineering stream, and Jamini Kumar Banerjee received for Civil engineering stream. There were many other medals and prizes.

It was my proud moment when I received a post card at home written by none other than my Principal Prof. Macdonald that I ranked

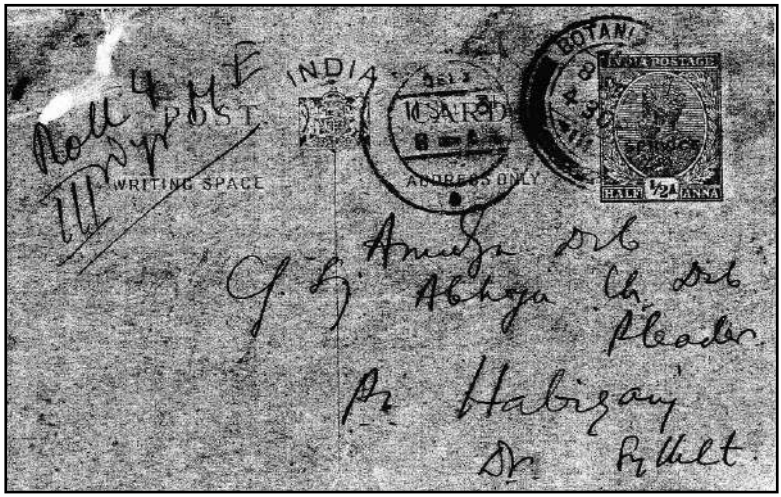

first in order of merit in my third year final examination. Amonst many other medals and certificates, this one is a prized archive for me.

Tate Memorial Medal was introduced in memory Mr. W. Tate, our Professor of Chemistry, for the student who secures the highest marks in science subject in the 3rd year annual examination, and I received the medal in my third year, i.e. in 1931 for Mechanical and Electrical

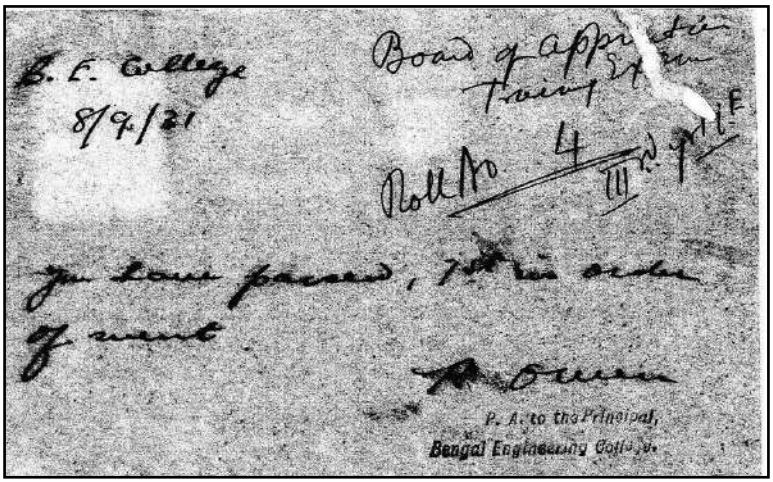

engineering stream, and Ranajit Chanda received for Civil engineering stream. Ranajit received University Gold Medal also for securing top position in B.E. examination, 1932.

Days passed off smoothly, except for me, because my permission to take up degree course was not coming from DPI (Assam) before our non-prof examination. However, Prof. Macdonald allowed me to continue with my final year degree classes. As a result, I had to appear both in non-prof, as well as Associateship examinations, for a duration of 26 days. I recollect Prof. Macdonald's anxiety about my health and strain, and took personal care for me for those 26 days. Finally, I could receive the permission, passed out in the first batch of Mechanical engineering degree in 1932, along with Sunil Das and Gunen Chatterjee. Prof. J. Riffkin was our teacher for Mechanical engineering. One point to mention that Benaras, Patna, Mysore and Poona had already introduced their degree courses for Mechanical stream much before ours.

The introduction of new degree course produced an impact in our campus life, and re-thinking about social relations began to crystalise. Earlier only Civil stream was offered the Degree course, and college had only one club for engineering students, operating from old hospital building, with its own library, and offering social service like evening

classes for artisan boys. In 1930, it moved to the building adjacent to slater hall.

Central wing of Downing hostel had Mechanical students' club. Every Thursday students used to sing Kirton. Haribhakti Pradayini Sabha used to publish the Kirton brochures. Mr. B.C. Mitra was our hostel superintendent. And Civil students were staying in the western wing of library.

Interestingly, with the increase of Muslim students, soon the entire eastern block of Downing hostel was allotted for all Muslim students, with Janab K.A. Kamran as their superintendent. They had their own dining hall at the ground floor, but their kitchen was at the nearby servant's quarter.

Earlier only students of Civil Engineering were getting the Degrees, & they had their own Society. It had library of story books. The students extended social services like night classes for artisan boys, & a debating society. The Society had a permanent place at Slater House. Now with the introduction of degree course, a feeling developed amongst many students' minds that Civil and Mechanical students were on equal footings. Few students were suffering from superiority complex, and it was not that all the students accepted the doctrine spontaneously. The protagonists of equality in rank were prominent enough in formation of different clubs. Downing hostel formed Downing House Club, irrespective of whether he is from Mechanical or Civil stream. Similarly different clubs were formed: Slater House Club, and Heaton House Club for the Anglo-Indian students. Finally, another society was formed for the students of Mechanical Engineering.

Prof. Macdonald called us, saying a draft must be made for unity of all the students, irrespective of their courses. It was not unreasonable that our unity should be definitely expressed in our campus life, and even after our passing out. He was stressing on a true common reunion involving all the streams.

It was then Prof. A. Macdonald, advised all the students to form a common society & the BECSI ((B.E. College Student's Institute)

was announced on 11th April 1932 at our Assembly Hall (what we now know as Institute Hall). The membership for students was made compulsory. It had 4 units at Downing Hall, Slater Hall, Heaton Hall, & European Barrack. Rules were framed out, all simple rules. College would bear the subscription cost. BECSI was founded in the premise of old hospital (now demolished). Though rules were framed, but one particular clause "maintain the rights of students" was not approved by the government. It was as expected and not so unusual as the ruling British government was always alert if any group of youth or students are forming any association or club, whatever it be. The bomb explosion in 1906 by the revolutionary Ullaskar Dutta in the heart of our BE College campus was also an example. However, it was Prof. Macdonald who was determined that it was not related to any political intention. He stood like a rock. Finally, it was approved, in 1941, much after his tenure in BE College.

Prof. McDonald with BE College Students Union, 1932

Photo shows the BECSI office and the first Executive Committee with students of Mechanical and Civil stream. Prof. Macdonald was the President, Sourin Dutta as Vice President, and myself as the Secretary. Our BECSI started in all earnest to

end the rancour prevailing amongst different streams. Then the Engineering Students' Club (for students of Civil and Mechanical stream) was formed, Rai Bahadur Chunilal Sarkar was invited in our inauguration program. We immediately celebrated our Bengali New Years' Day (1932) which was attended by Prof. Macdonald and Prof. Miller. We had 3 sub committes: Library, Social, and Social Gathering. Arrangements were made with St. John ambulance for first-aid certificate examination.

With the blessings of Prof. Macdonald, and a new responsibility on me as the Secretary, our next plan was to unify the two different Reunion functions into a common one. During that time, Rai Bahadur Girish Chandra Das, was very popular among the old Civil engineering boys. He attended the 1932 reunion, and then when we approached him for an combined reunion, he said "No", and narrated his strained relation with the diploma students of his time. He could not forget that a bucket full of night soil was spread over his bed ((at his time, the activated sludge plant was not installed), and he would never forgive those even at that age. It was contended that many were serving in Calcutta Corporation under the Chief Engineer Suresh Sanyal, a diploma holder in Overseer examination from our college. Rai Bahadur said it was so in office, but within the college precincts, they could not sit in the same bench with Diploma holders. Important to mention that Diploma holders were also invited in our reunions). The attitude reached such a fanaticism the even after the introduction of unified reunion, some old boys of Civil stream, boycotted the event, and they had their own steamer party reunion. When Prof. Wolfenden of Mechanical engineering department became the Principal, he also patronised the idea of unified reunion.

BECA Magazine:

Record says, a multilingual but mostly in Bengali journal Shibpur College Patrika started in 1903, and government granted Rs.100/- for that, but it was not regular. Long after that, in 1928 during our first

year, the students of Civil engineering published a magazine Engineers' Annual. In 1931, on the occasion of reunion, students of Mechanical stream published our first B.E. College Annual (BECA), combining both Civil Engineers' Annual, and Engineers' Annual. My friend Kabiruddin Ahmed was the first editor. However, again we landed in dispute. Civil students objected to the name and boycotted the 1931 reunion. However, the BECA remained, and whatever BECA we see today, had its historical beginning in 1931, let's not go into dispute who made it: Civil, or Mechanical? BECSI and BECA continued in full swing. Then college crest was designed through a competition.

Honestly, as the Secretary of BECSI, and having good ranks in merit list, I had the opportunity of several face-to-face interactions with Prof. Macdonald. The man was soft and kind but also a towering personality and strict disciplinarian. His life influenced me to the extent I can not describe in words.

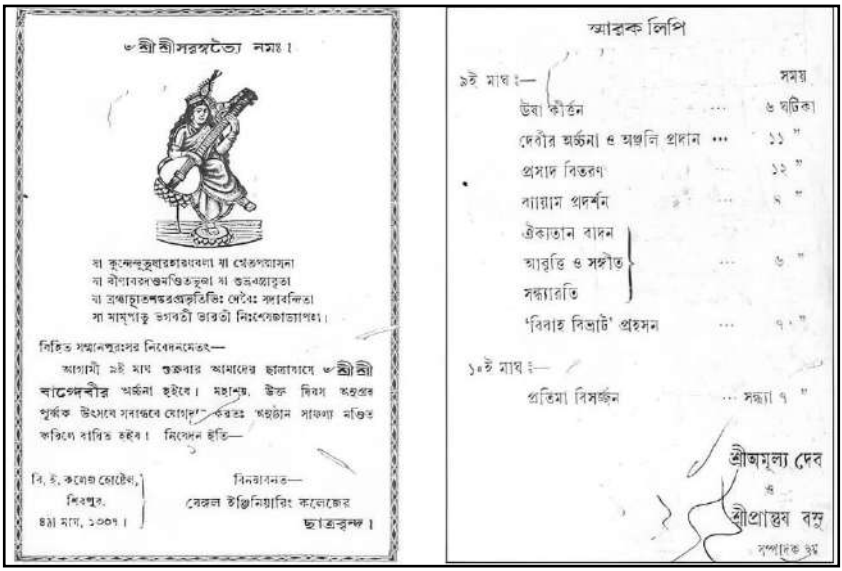

ওঁ শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদাবন্দিতা
সা মাম্পাতু ভগবতী ভারতী নিঃশেষজাড্যাপহা।

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আগামী ৯ই মাঘ শুক্রবার আমাদের ছাত্রাবাসে ৺শ্রীশ্রী বাগ্দেবীর অর্চ্চনা হইবে। মহাশয়, উক্ত দিবস অনুগ্রহ পূর্ব্বক উৎসবে সবান্ধবে যোগদান করতঃ অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

বি. ই. কলেজ হোষ্টেল,
শিবপুর,
৪ঠা মাঘ, ১৩৩৭।

বিনয়াবনত—
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের
ছাত্রবৃন্দ।

স্মারক লিপি

৯ই মাঘঃ—

		সময়
উষা কীর্ত্তন	...	৬ ঘটিকা
দেবীর অর্চ্চনা ও অঞ্জলি প্রদান	...	১১ "
প্রসাদ বিতরণ	...	১২ "
ব্যায়াম প্রদর্শন	...	৪ "
ঐকতান বাদন / আবৃত্তি ও সঙ্গীত / সন্ধ্যারতি	...	৬ "
'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসন	...	৭ "

১০ই মাঘঃ—

প্রতিমা বিসর্জ্জন	...	সন্ধ্যা ৭ "

শ্রীঅমূল্য দেব
ও
শ্রীপ্রাণতোষ বসু
সম্পাদক দ্বয়

Clock Tower:

In earlier days, most of the students did not have any personal watch, but our authority was very strict that students must attend classes in

time. They were dependent on our barrack employees who used to call us in early morning. Then Sir Rajendranath Mookherjee, our senior alumnus presented the large Turret clock that was mounted at such a height that we could see the time from our hostel. To add, it had the bell also. This turret clock was installed much before our time, and we enjoyed its benefits.

Institute Hall:
The Institute Hall, as it it known now-a-days had two main purposes. The primary reasons were gathering of students for any occasion like lecture or student's function or re-union. Additionally, it was often used by the Europeans for their social parties. The wooden floor was specially made to make it suitable as their dance floor.

Bakery:
Our commute with Calcutta was not so easy. Howrah bridge was in planning stage, so ferry was the only option. The European staff and students had a different food habit. So a bakery was founded at the backside of institute. A bell used to ring intimating people that the foods were ready. The bell was mounted at the top of its chimney with a small chandelier so as to save it from rain, and a light with it. Many people later thought it was a lighthouse. Our bakery was very popular with the Europeans, and we also often used to go for a different taste of foods.

CESC Tunnel:
CESC Tunnel was an interesting site for us. We used to form large group and reach the Hooghly riverside at Botanical Garden. We could see labours, mostly from the state of Bihar used to dive deep and then come back after 2/3 minutes. The labours were digging a well on the Hooghly riverside of Botanical Garden. We were told that would be the first underwater tunnel in Asia, to be used for electric power transmission line from Kolkata to Howrah.

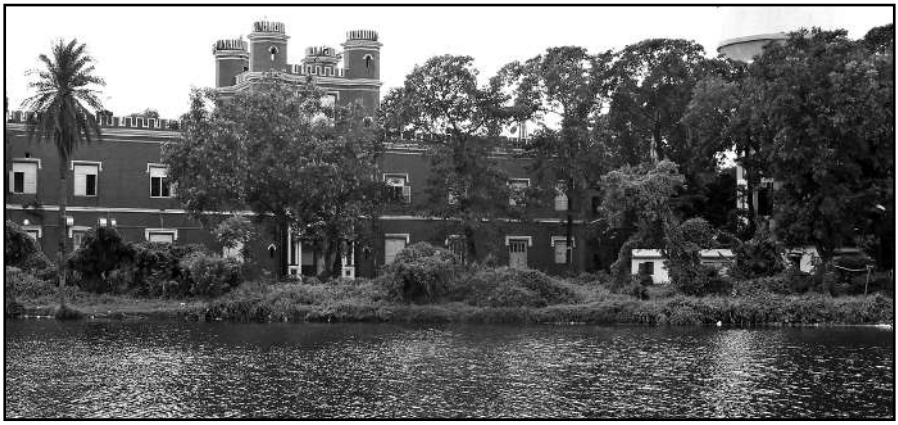

We, the B.E. College boys always enjoyed enviable status among the assembly of students during UTC (now a days known as NCC), and in Beighton Cup hockey tournament. College was declared unofficial holiday, and we marched in full uniform under the command of Major B.C. Gupta and Lt. Amaresh Chakrabarty, from the college ferryghat at Botanical Garden. Interestingly, our barrack employees carried Luchi and Egg Curry for us. We crossed the river Hooghly to Taktaghat, and again then marched for the Maidan. Our arrival was impressive and earned prestige from others. Our platoons were grouped with students of Presidency and Medical College. Our turnout was truly dignified inside the camp, as well as on parade ground.

I remember, in 1932 Beighton Cup we reached fourth round and lost to a Delhi team. Tennis was very popular with the European staff and their family. During our time, college made 10 new tennis courts by the side of Downing hostel. My batchmate Sudhir Kanjilal (Civil) created University record in long distance run.

Those were our hey-days of B.E. College.

** This article was first published in BECA edition, 1977.

** Source of article: Asim Deb, 1977 Electronics & Tele-communication Engineering.

** A few historical facts are added by Asim Deb, that he could know during several personal interactions with the author.

Remembering Our Shihsa Gurus – the Glowing '50s

©Amitabha Ghoshal, 1957 Civil Engineering

We, the 1953 entrants to B E College, have often been reminiscing of our eventful college days and the discussions would end with the thought on how lucky we had been to have our engineering education by paying ₹160 per year — the youngsters please don't laugh derisively- that was the princely amount we paid- and with large number of scholarships many did not have to pay any!!

Some of us recall all the time that we owe a large debt to the society that funded our studies and try to repay by putting back to the society in our individual ways, despite our social commitments and advanced age.

Seldom had we collectively deliberated in our ADDA, what and how much, we owe to our teachers who had braved muted catcalls, cowardly taunts from students hiding behind the safe protection of hostel Windows, –and much more at times. The life of a teacher, and his family members, in a residential campus was much different from the respected "Mastermoshai' in the then society. Being born in an educationist family I had always learnt that while a teacher was never wealthy, he earned a special adoration in those days even from the illiterate vegetable vendor, who would hide his best produce for the Mastermoshai who would come with a lean purse.

In the sprawling campus of B E College, with seven permanent hostel buildings and the sprawling Barracks (legacy from the second world war time, few temporary sheds built for defence emergency, and then used by fresh entry students those days, – 12 in each shed having corrugated sheet roof), teachers would have accommodation in the single story shed structures at one end of the campus, except for the senior professors who were accommodated in grandiose colonial buildings on river front.

Of course, there were the brave ones who were in charge of a hostel and used to get accommodation in a two-story building with separate entrance, a reward for the additional challenging duty of managing and administering a hostel with more than hundred students. With about thousand students romping around the campus, our teachers and their family members managed to time their movements to keep clear of us as far as possible- a situation we hardly realised, or were bothered about, in our student days.

When Sahityika came forward with the request for an article on teachers of our times, as a tribute to the teaching community, I did realise that with the limited facilities in their command, how much they had achieved in converting the students, raw and fresh from I Sc course, with no knowledge of the ways of the engineering profession, into seasoned professionals who had during their professional life been lauded often for deep insight and profound knowledge !! The professors, junior tutors and the technical staff, who made up the "teachers" succeeded in tempering the 'steel' that lay hidden in every student. I offer my silent 'Gurudakshina' to all our SIKHSAGURUS on behalf of my batch mates, who are always defined as the 1953 Entrants.

Recalling the student life of our college and the teachers, the first image that jumps out is that of the Interview Board, a much-dreaded entity embossed in mind of the seniors we had contacted before admission, through distant relatives or friends. Reaching out to a BEC graduate in person was a big deal those days- with only about 150 pass out in a year and spread out across the country widely – they were in high demand and a rarity! The interview came immediately after clearing the tension filled and embarrassing medical test hurdle under Dr. Sahana!

The Board was headed by a grave looking and awe-inspiring Principal Prof. S. R Sengupta, with an unlit pipe in his lips, flanked by Professors A.C. Roy with his piercing glowing eyes and a stern looking Prof. G.P. Chatterjee with an aloof look. There were others, with more benign look, who became friendly later during college stay, but the impression was created by the Central group, who claimed riveted attention.

One favourite question, I had been tutored, was "Why have you chosen Civil Engineering (in my case)". I had on my way to college, riding on Bus 55, just heard from some eagerly vocal candidate students that it is Civil Engineers who built the Howrah Bridge. I promptly responded that I want to design a bridge like Howrah Bridge, and the formidable trio gave the hint of a squeezed smile and my spirits restored! Next suggestion was an embarrassing advice that with my 5′ 2″ height and fair complexion I should agree to play female roles in college drama- those were all male student days! I giggled out of the quip, but that moment knew that a soft heart for students lie in that exterior rough look, and many times we had found that reflected during our stay in college.

Admission formalities over, and after the fresh hurdle of Freshers Welcome, preceded by a mild (by recent standards) bout of ragging by a team led by a heavy built senior, Aluwalhia, posing as the Inspector General for student discipline, we settled down to our studies.

The first two years in the college, our classes were common for all

the departments, and we were more involved in subjects away from our chosen course. Awareness grew that these were preliminaries, but the going was strewn with mine-fields, as failure in any subject was equally critical, leading to supplementary examination or losing a year in class with "repeat", and in the extreme case the dreaded "CNR"- Can Not Repeat, means being thrown out of campus. A failure in Sociology & Legal Matters was as serious as a failure in Applied Mechanics, the base knowledge for Civil Engineering. We had to treat all subjects and their teachers with the same respect, and that made us a coherent and reasonably balanced human being. Unfortunately, this knowledge was lacking in our student days, and we were often tempted to skip 'unimportant' subjects- and that, I now realise, led to huge dropouts and failures!

The teachers of the first two years whom I vividly recall, are headed by Prof Asok Sanyal, the most dreaded teacher of Drawing for two years, and famous for breaking costly Staedtler pencils on drawing sheet for observation of mistakes or negligence and doing that with his large and rotund presence supported on the board, that would creak with his weight! I realise, he really had driven into us the statement on the first drawing sheet "DRAWING IS THE ENGINEERS LANGUAGE". When we encounter recent pass outs, we realise our gain.

Then there was our Survey teacher Prof. Bhattacharyya (nick named universally for generations as Bhotu) who will be showing us the Azimuth circle with his large torch, in winter nights during Survey camp. He had very little personal contacts with students and perhaps other colleagues of his as well. Students were scared of making false entries in survey readings as they were sure it would not escape his trained eyes!

Others who come to mind are Prof. Phanindra Nath Mukherjee who used to teach us Engineering Law and Sociology (was also Superintendent of Slater Hall) and made his teachings easy enough for unwilling students to pass out based on class lectures. There were very learned teachers like Prof. Mukherjee of Geology and Prof. Dhar

of Economics, all doyens in their own field but hardly appreciated by engineering students, who knew these subjects are not going to earn their living! But they slogged sportingly and used to take their classes seriously, hoping that they will be able to upgrade our knowledge.

The first two years we had the benefit of being taught by seasoned teachers like Professors P.N. Chatterjee and Bimalendu Sen (both Applied Mechanics), Sankar Sen (Electrical), N.C. Neogy (Engineering Chemistry), Chiranjeeb Sarkar (Chiranjeebda even in College and still a loving senior, alive and alert), Kamada Babu (Physics) who all had continued in college for long periods after we left and about whom many other contributors will surely deliberate on.

A special mention about Kamada Babu, who left this world few years back at the age of 100++, – whenever we had our batch get together on completion of fifty years / sixty years, and even beyond, he would join us for for lunch along with other invited living teachers, and invariably cheer us and our spouses up by a strong call of " B E Colleger naame HOOO !!"

We initiated the practice of inviting old teachers to our batch get togethers as an opportunity for showing our respect and gratitude, and we are happy to find that this practice has since caught up. The bond with our teachers spilled into our professional life too, with some of them giving consultancy for solving difficult problems – like Amitabha Ghosh Dastidar gave us innovative solution in Geotechnical Engineering with Sand Wick, a new invention for building multi-storied buildings on the soft soil at Salt Lake in early days (1968).

Before I conclude, let me mention the few teachers, whom most of our juniors never met, as they left the college to undertake bigger responsibilities! Professor S.R Sengupta, the then Principal (now remembered by Sengupta Hall, dedicated in respect), had to take over the responsibility of making IIT Kharagpur what it is today, from the Founder Director Dr Gyan Ghosh, FRS. An astute administrator, he quickly made IIT K the premier technical institution of the country and role model of the future IIT s. What was B E College's loss was

becoming the gain of IIT K. Prof. G.P. Chatterjee, went over to take charge of the National Metallurgical Laboratory at Jamshedpur, that made India an important member of the International Metallurgy domain.

After we reached our 3rd year and started belonging to 'the department', we were exposed to a galaxy of foreign educated, highly experienced professional teachers like Prof. S.K Mukherjee (known as Lords), Asim Mukherjee, Kalyan Banerjee and BEC alumni Khaunish Roy.

I must talk in detail about the HOD of Civil Engineering, Prof Khaunish Roy, who had joined BE College, with lien from PWD, and made all of us proud to become a Ciivil Engineer. He had been part of the PWD team that designed and built the famous Coronation Bridge in North Bengal, a standing example of high-quality engineering construction, even after seventy years of use. Prof Roy (Khaunisda is what we called him after graduation, as he was an Alumni) was a very unassuming person, given to Paan chewing habit (and therefore despised by his anglicised colleagues), but an excellent innovative engineer. He gave us as final year project, the design and detailing of a large span Balanced Cantilever concrete bridge and saw to it that we really do the design seriously and make the detail drawings, including that of the concrete articulation joint, which I am sure many post-graduates would not be able to handle easily. He was friendly with every student, going to their drawing board even at night (those were Raat Phuto Kara days!) and saw to it that they really understand what they are doing.

Let me conclude with a personal anecdote- We had the centenary celebration during our fourth (and final year) in December- January 1956-57 and as a student member of the high-profile B.E. College Centenary Committee, got immersed in the preparatory meetings and then implementation of the colourful week-long celebrations- first time that our Prime Minister Jawaharlal Nehru came to college with Dr. B.C. Roy, CD Deshmukh and many others. In the meetings the

main task of student members were to consume the pastries and cakes that used to be served, and largely untouched by the Chief Engineers and Managing Directors, but during actual execution an untimely rain and consequent flooding made our task a difficult one and we had to spend long hours till midnight to make the exhibition successful!

Exhausted but exhilarated, at the end of the event that saw presence of Bade Ghulam Ali and Ali Akbar Khan participating in evening soirees, and all the while encouraged by our teachers to make the event a success (and that included Prof Roy), the day I returned to department project room, I met Prof Roy on the way. I was expecting another pat on the shoulder for the successful event but had a rude shock!! "Ki Ghoshal mosai, barite Babake bole elen je e bachar ta collegeai thakben, centenary kore". My happy dreams were over and again had to start 'Raat Phuto Korar' exercise to make it to the final exams.

I have never lived out of that SHOCK TREATMENT!!!

One epilogue: – Our professors were role model enough to encourage many of our batch mates to join the educational line…
Arun Deb and Amitabha Dasgupta in BE College.
Bholanath Ghosh and Amal Sinha in Jadavpur University.
Amiya Basu and Pulin Bhattacharyya at IIT Delhi,
Sankha Bannerji at University of Missouri
And for brief periods Sudhangshu Chakraborty and Amar Bannerjee at BE College as Lecturer.

কষ্টকল্পিত

©শ্রীমতী দুর্গারাণী বড়াল, (ডক্টর শঙ্কর সেবক বড়ালের স্ত্রী)

আমি দুর্গারাণী বড়াল।

আমি তোমাদের প্রিয় মাস্টারমশাই ডক্টর শঙ্কর সেবক বড়ালের স্ত্রী। আশির দশক অবধি বিই কলেজের পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই আমাকে চিনবে। আমি তোমাদের অনেকেরই মাসীমা।

একটা ছেলে, তোমাদের স্যারের ছাত্র, আর সেই সূত্রে আমাদের বাড়ির সকলের সাথে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পরিচিত, সেই কবে থেকে আমাকে অনুরোধ করে যাচ্ছে, সেইসময়কার একটা লেখা দিতেই হবে। কিছুতেই সে আমায় ছাড়ে না। ছেলেটাকে বলেছি, আরে আমার লেখার দৌড় ঐ আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লেখা, ব্যাস এই পর্যন্ত। তবে হ্যাঁ, স্কুলে নদী, বর্ষাকাল, এসব নিয়ে রচনা লিখেছি, কিন্তু তাঁর জন্য পাঠ্যবই ছিল। তাই বলে নিজের কথা লিখবো, আর এই ৯৯ বছর বয়সে? আমার জন্ম ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবর দুর্গা ষষ্ঠীর দিন রাত দশটার সময় বিহারের ডালটনগঞ্জ শহরে। আজ এত দীর্ঘজীবনের অনেক কিছুই যেমন মনে আছে, তেমনি অনেক কিছুই আর মনে নেই। ছেলেটা তবু ছাড়ে না, তাই তোমাদের জন্য একটা লিখেই দিলাম।

প্রথমে আমার মা বাবাকে নিয়ে কিছু লিখি।

আমার মা সারদামণির জন্ম বিহারে ডাল্টনগনেজ আমাদের মামাবাড়িতে। মায়ের বাবার নাম ভুবন মোহন বড়াল। চন্দননগরে দাদামশাইএর নিজস্ব বাড়ি ছিল। পরে ছয় ছেলে ও চার মেয়ে নিয়ে সপরিবারে ডালটনগঞ্জে চলে আসেন। মা ছিলেন তৃতীয়া কন্যা, ছোটবেলায় তাঁর ঠাকুমা মানুষ করেছিলেন। আমার মা আর আমার শাশুড়ি'মা ছোটবেলায় দু'জনে খেলার সঙ্গী ছিলেন। সেই সূত্রে সুন্দর পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। আমার মামাবাড়ির সাথে শ্বশুরমশাইদের আত্মীয়তাও ছিল। ভুবন মোহন বড়াল, আমার মায়ের বাবা, উনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন, আর নানান বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। শিবপুর বিই কলেজে ছ'মাস পড়েছিলেন জমির মাপজোক (সার্ভেইং) ইত্যাদি বিষয়ে। তখন বিই কলেজের ক্লাস প্রেসিডেন্সি কলেজে হত।

তখনও পুরোপুরি রেল চলাচল শুরু হয়নি। ১৯০৫ সালে ডালটনগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। তাই যেতে গেলে কিছুটা পথ রেলে, কিছুটা গরুর গাড়ি ও কিছুটা

হাতে টানা গাড়িতে যাতায়াত করতে হত।

এগারো বছর বয়সে আমার মায়ের বিবাহ হয় হুগলির কেদারনাথ দত্তের সাথে। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। আমার ঠাকুরদাদা যখন বারাসতে ছিলেন তখন বাবার জন্ম হয় ঠাকুর'দার কর্মস্থলে। তিনি তখন হুগলি কলেজে আই এ পড়তেন আর আমার বাবার যখন পাঁচ বছর বয়স, ছয় মাসের ব্যবধানে আমাদের ঠাকুরদা ও ঠাকুমা মারা যান। ঠাকুরদাদা তখনকার দিনের সাবজজ ছিলেন। সেসময় পূর্ববাংলা ভাগ হয়নি। আর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাও একসাথে ছিল।

বাবা ও কাকাবাবুরা ছিলেন দুই ভাই, আর চার বোন। বাবার যখন পাঁচ বছর বয়স, আর কাকাবাবুর চার বছর, তখনই তাঁরা মা বাবাকে হারান। তখন তাঁদের এক পিসিই তাঁদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেন, ও একে একে সেই চার বোনের বিয়ে দেন। আমার বাবা প্রথমে হুগলির মল্লিকবাড়ির স্কুলে পড়াশোনা করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি হুগলি মহসিন কলেজ থেকে আই এ, আর তারপরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিলজফি অনার্স নিয়ে বিএ ও তারপর আইন পাশ করেন। আইন পড়ার সময় তাঁর সহপাঠি ছিলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যিনি পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। তাঁরা উত্তর বিহারের অধিবাসী ছিলেন। সেইসময়ের কিছু চিঠিতে আরো জানতে পারি যে অনেক বিখ্যাত লেখকও তাঁদের সঙ্গে পড়তেন। আমার বাবার যাঁরা সহপাঠী ছিলেন তাঁরা সবাই বছরে একটিবার সকলে মিলে সহপাঠী সম্মেলন করতেন, তোমরা যাকে রিইউনিয়ন বলো।

আই এ পাশ করার পর, আঠার বছর বয়সে বাবার বিবাহ হয়। এরপর ল' পাশ করার পর এক বছর হুগলির কোর্টে প্রাকটিস করেন। এরপর কলকাতার হাইকোর্টে এসে প্রাকটিস করেন। ১৯০৫ সালে প্রথম ট্রেন চালু হলে তিনি ডালটনগঞ্জ আসেন। তাঁর বড়মামা স্বর্গীয় আশুতোষ বড়াল ওকালতি করার জন্যই তাঁকে কলকাতা থেকে ডালটনগঞ্জ নিয়ে আসেন। সে সময় এ কাজে ভালোই পসার ছিল।

সেই সময়ের ডালটনগঞ্জ ছিল জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা এক ছোট্ট শহর, যার তিনদিক ঘিরে কোয়েল নদী। গ্রীষ্মকালে নদীতে জল থাকত খুব কম, হেঁটেই নদী পার হওয়া যেত। কিন্ত বর্ষার সময় দেখা যেতো তার রুদ্ররূপ। নদীতে বান এলে, বিশাল উঁচু উঁচু ঢেউ এসে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেত। স্রোতের টানে ভেসে আসতো ডালপালা শুদ্ধ বড় বড় গাছ। আর লোকেরা সেই কাঠ সারা বছরের জন্য সংগ্রহ করে রাখত। তখন সেই অঞ্চলে কাঠের আগুনেই রান্না হত। তাই কাঠ সংগ্রহ করে রাখাটাই চল ছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মোটরগাড়ি খুবই কম ছিল। ওকালতি কাজের সুবিধার জন্য ডালটনগঞ্জ এসে কিছুদিন তিনি আমার মামার বাড়িতে ছিলেন। পরে ভাড়া বাড়িতে চলে যান। এরপর এক বাঙালি ব্রাহ্মণ, নাম কেদারনাথ মুখার্জ্জি,

উনার থেকে বসতবাড়ির জন্য ১২ কাঠা জমি কেনেন। তখন প্রচলিত ধারণা ছিল যে তীর্থস্থানে মৃত্যু হলে পুনর্জন্ম হয় না। সেই বিশ্বাসে বৃদ্ধবয়সে কেদারনাথবাবু বেনারস চলে যান।

আমার দাদা, মানে মায়ের বড় ছেলে এই শহরে প্রথম গাড়ি কেনেন। উনি প্রথম সেই গাড়িতে দিদিমা ও নিজের মা'কে নিয়ে এলাহাবাদ কুম্ভ মেলায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

তখন বাড়ি তৈরি করতে গেলে আগে ইঁট তৈরি করে তারপর বাড়ি করতে হত। ইঁট বানাতে নদী থেকে মাটি আনতে হত, ভারীরা জল এনে দিত। তারপর সেই ইঁট আগুনে পুড়িয়ে, সেইভাবে বানিয়ে বাড়ি তৈরিতে ব্যবহার হত। ১৯১৪ সালে বাবা প্রথমে একতলা বাড়ি করেন। পরে আমার দাদা দোতলা ও তিনতলা বানান। একশ আট বছরের সেই পুরানো বাড়ি আজও অটুট আছে। বরাবরই ডালটনগঞ্জে গ্রীষ্মকালে জলের সমস্যা। তাই কুয়ো বানিয়ে রাখা হত। আজও সেই কুয়োর জল ব্যবহার করা হচ্ছে।

যখন বাড়ি কেনা হয়, একতলায় ছিলো মায়ের ঘর, মেজদার ঘর, আর ছিল এক ছোট বারান্দা। পরে সেগুলোই মেরামত করে ঠিক করা হয়। মা নিজে পরিশ্রমী ছিলেন। আর কোনরকম অপচয় পছন্দ করতেন না। আমার দাদা ছিলেন মায়ের ডান হাত। বাড়ির যতো কাজ, মায়ের যা যা প্রয়োজন সব দাদাই দেখতেন। আর বাবা ব্যস্ত থাকতেন বাইরের কাজে। আমার মা নিজের ছেলে আর মেয়েদের কখনই আলাদা চোখে দেখতেন না। বাড়ির বৌমারাও তাঁর নিজের মেয়ের মতোই ছিলেন। মেয়ে, বৌ এই দুইএর তফাত কখনো তিনি করেননি। লক্ষ্মীপূজো, দুর্গাপুজোর দিনে মেয়ে, বৌ সবার জন্য একই রকমের শাড়ি হত। খালি রংটাই আলাদা। তাই পড়ে সবাই একসাথে মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যেতেন। পুজোর সেই ক'দিন মা অনেকরকম ও অনেকের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করতেন। অষ্টমীর পূজো হতো আমাদের বাড়িতে। মা পুজোর পর বারোজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াতেন, দক্ষিণা দিতেন। বাড়ির অঞ্জলির পর দুর্গাবাড়িতে পূজার অঞ্জলি দিতে যাওয়া হতো। দিনের পূজোর সকল উপাচার, নৈবিদ্য বড় বারকোষে সাজিয়ে কাজের লোকের হাতে মা দুর্গাবাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

ডালটনগঞ্জের সেই ছোটবেলাটা আমাদের খুবই আনন্দে কেটেছে। পাঁচ দাদা, চার বৌদি, পাঁচ দিদি, ভাইপো, ভাইঝি সবাই মিলে একসাথে আমরা আনন্দের সাথে কাটিয়েছি। আজ শুধু আমরা দুই বোন আছি। আমি ও আমার দিদি।

***

মা, বাবাকে নিয়ে আমার স্মৃতিকথা লিখলাম। এবার নিজের কিছু কথা বলি।

আগেই বলেছি, আমার জন্ম ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবর দুর্গা ষষ্ঠীর দিন বিহারের ডালটনগঞ্জ শহরে। বাংলা স্কুল একটাই ছিল। আর ছিল পাঁচ-ছটা হিন্দী স্কুল।

আমার দাদু সেই সব স্কুলেরই চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি যে স্কুলে ভর্তি হই, তার নাম ছিলো 'বাংলা স্কুল', এই স্কুলে আমার দিদিমাও পড়েছেন।

আমার বিয়ে হয় ১৯৪৮ সালের ২৮শে মে। তখন আমার বয়স উনিশ, আর তোমাদের মাস্টারমশাইয়ের বয়স ২৯ (জন্ম ১৯১৯ সালের ১৫ই অক্টোবর)। তার আগে আমার স্বামী স্বর্গীয় শঙ্কর সেবক বড়াল ১৯৩৯ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বিএসসি (ফিজিক্স অনার্স) করে তারপর ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে এমএসসি করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডক্টর হৃষিকেষ রক্ষিতের ডাকে কলকাতা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে জয়েন করেন। আয়নোস্ফিয়ার (ionosphere using radio pulse echo technique) এর উপর উনি রিসার্চ করতেন। কাজের চাপে সবদিন চন্দননগর ফিরতেও পারতেন না। অনেক সময়ই রাত জেগে কলেজের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে হত। তখন বাড়িতে না এসে সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরিতেই রাত্রে থেকে যেতেন, আর নিজেই রান্না করে খেতেন। সেই সময় রেডিওতে একটা অনুষ্ঠান পপুলার সায়েন্স এর উপর অনেক বক্তব্য রেখেছেন। লেকচার দেবার আগে সেটা লিখে নিতেন, আর তারপর সবসময়ই আমাকে পড়ে মতামত দিতে বলতেন। আমি আমার মতামত দিলে বলতেন "দাঁড়াও আগে ঘসে মেজে শেষ করি। তারপর দ্যাখো"। সত্যিই শেষ হলে দেখা যেত যে লেখাটা খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে।

উনি ১৯৫৫-৫৬ সালে বিই কলেজে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হয়ে যোগদান করেন। তখন থেকেই বিই কলেজের সাথে আমার আত্মিক যোগাযোগ। বিই কলেজ জয়েন করার পর সায়েন্স কলেজ উনি ছেড়ে দেন। তবে যখনই সায়েন্স কলেজ থেকে লেকচার, রিসার্চ বা কোন দরকারে ডাক এসেছে, তখনই সাড়া দিয়েছেন। বিই কলেজে এসে ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠা করেন। আমার প্রিয় এই বিই কলেজ ক্যাম্পাসে আসার পর থেকেই চারিদিকের সবুজের মাঝে শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে এত সুন্দর এক আশ্রমিক পরিবেশে আমাদের দিনগুলো সত্যি খুবই ভালো কেটেছিল। সেই দিনগুলির কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

আমি বিহারের ডালটনগঞ্জে বড় হয়েছি, বাংলার অনেক কিছুই জানতাম না, কিন্তু উনি কখনো আমাকে অবজ্ঞা করেননি, বুঝিয়েই বলতেন। টাকাপয়সা যা রোজগার করতেন আমাকে দিয়ে আলমারিতে তুলে রাখতে বলতেন। নিজে একবারও খুলতেন না। দরকার হলে আমাকেই আলমারি খুলে বের করে দিতে হত। সংসারের সব ভালোমন্দের সাথে মানিয়ে চলতেন। উনি রান্না জনতেন। তাই আমি অসুস্থ হলে, বা ছুটির দিনে রান্না করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন। তাঁদের জন্মদিনে বই, পেন উপহার দিতেন। নিজে পড়াশোনায় ভালো ছিলেন, অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

নিজের পড়াশোনার সাথেসাথে ছেলেমেয়েদেরও খেয়াল রাখতেন। ফলস্বরূপ আজ আমাদের ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত।

বিই কলেজের ক্যাম্পাসে থাকলেও শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির সাথে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই সায়েন্স কলেজ যেতে হতো আর বাড়ি ফিরলে দাদার ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসাতেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের ছোটকাকাকে খুব মানতো।

একটা ঘটনা মনে আছে। সময়টা সঠিক মনে করতে পারছি না, (বলেছি না? এই ৯৯ বছর বয়সে সব সঠিক মনে পড়ে না), মনে হয় ৭৯-৮০-৮১ সাল নাগাদ। ছেলেদের পরীক্ষার সময় হঠাৎ কি একটা ব্যাপারে সেই মেসের স্ট্রাইক হয়। তখন ইলেকট্রনিকস বিভাগের সকল ছাত্র আমার বাড়িতে এসে দিনকয়েক খাওয়াদাওয়া করেছিলো। স্যার ওঁদের বারণ করে দিয়েছিলেন যেন বাইরের হোটেলের খাওয়া না খায়। আর আমি একলাই সেই রান্না করেছিলাম। আরেকটি ঘটনা, এটা মনে হয় '৬৫ সাল নাগাদ হবে। পরীক্ষার সময় ইলেকট্রনিকস বিভাগের একটি ছেলের শরীর খারাপ হয়ে কলেজের হসপিটালে গিয়ে ভর্তি হয়। স্যার খবর পেয়ে ওঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ছেলেটি আমাদের বাড়িতে থেকেই দু'তিনটে পরীক্ষা দিয়েছিল।

ক্যাম্পাসে যেহেতু বয়সে আমি অনেকের বড় ছিলাম, তাই কিছু অতিরিক্ত দায়িত্বও ছিল। সেগুলো পালন করে আনন্দও পেতাম। যেমন চিত্রা (প্রফেসর অরুণ শীলের স্ত্রী) ছেলেমেয়েদের শরীরের একটু এদিক ওদিক হলেই ঘাবড়ে যেত। সামান্য ব্যাপার, তাও ঘাবড়ে যেত। আমি অনেকবার গিয়ে সামাল দিয়ে এসেছি। আর ছিল শ্যমলী, প্রফেসর যাদব চক্রবর্তীর স্ত্রী। এছাড়া ছোট ছোট বাচ্চাদের ফরমায়েসি সোয়েটার বোনা তো ছিলই। খুব আনন্দের ছিল সেই দিনগুলো।

স্যার বিই কলেজ থেকে রিটায়ার করার পর আমরা চন্দননগরের পৈতৃক ভিটেয় ফিরে আসি। আবার আমার শ্বশুরবাড়ির সবার সাথে মিলবার সুযোগ হয়। তখন তোমাদের স্যারের কাছে অনেকেই পড়তে আসত। বিনা পয়সায় উনি ভালবেসে সবাইকেই পড়াতেন। আর সবাইকেই কিছু একটা করে দেখাতে বলতেন। কারোর রেজাল্ট ভাল হলে খুব খুশি হতেন। জীবনে এগিয়ে যেতে, প্রতিষ্ঠিত হতেও অনেককে নানানভাবে সাহায্য করেছেন। এভাবেই উনি সারাজীবন সকল ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

পড়াশুনার বিষয়ে তোমাদের স্যারের গভীর আকর্ষণ ছিল। তাই সবসময়ই নিজের নানান রকমের পড়াশোনার মধ্যে থাকতেন ও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকেও নজর রাখতেন। যখন নিবিষ্ট মনে লেখাপড়া করতেন, তখন অন্য কোনদিকে মন থাকতো না। শাশুড়িমায়ের কাছে শুনেছি একবার হারিকেন জ্বেলে পড়ার সময় হারিকেন থেকে বিছানায় আগুন ধরে যায়, কিন্ত উনি পড়ায় এতটাই মগ্ন ছিলেন

যে পাশেই আগুন ধরে গেছে সেটাও বুঝতে পারেননি। এইরকম নিবিষ্ট মনে পড়া আমি বিই কলেজেও দেখেছি।

সব সংসারেই নানান সুবিধা অসুবিধা থাকে। তার মধ্যেই আমাদের দিন ভালভাবেই কেটেছে। ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়ে গেছে। যে যার নিজের জায়গায় ভালভাবে ঘর করছে। ছোটবেলায় বাবা-মায়ের আমি অনেক আদরে বড় হয়েছি। বিয়ে হয়ে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সবার থেকে অনেক সম্মান ভালবাসা পেয়েছি। শিবপুর থেকে এসেও সবার সাথে থেকেছি। আমার ছেলেমেয়েদেরও সবাই খুব ভালবাসতেন। আমার ছোটবয়সে বাবা চলে যান, ওনারও তেমনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা চলে যান। ওনাকে দাদারাই মানুষ করেন। তখনকার ফরাসি আমলে সার্তিফিকা পরীক্ষায় পাশ করলে কলেজ অবধি ফ্রী-তে পড়াশোনা করা যেত। আমার স্বামী ওই পরীক্ষায় প্রথম হন। তাই কলেজে পড়ার সময় কোন খরচ লাগেনি।

চিরকালটা উনি খুব সাদামাটা জীবন যাপন করেছেন। কখনো কোন বাবুয়ানী করতে দেখিনি। ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। কাজের চাপে সবসময় পড়াবার সময় না পেলেও রবিবার সকাল থেকে সন্ধে অবধি তাঁদের নিয়ে বসতেন। বিকালে তারা খেলতে যেত কিন্ত সন্ধ্যা হবার আগে বাড়ি না ফিরলে রাগারাগি করতেন। আর মিথ্যাকথা বললে খুবই রেগে যেতেন। ছেলেমেয়েদের আলাদা করেও দেখতেন না। সবসময় চাইতেন তাঁরা পড়াশোনা করে কিছু একটা করে দেখাক। কোন অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করতেন। আর অভ্যাসের মধ্যে রোজ ভোরবেলা হাঁটতে যেতেন। ভগবানে বিশ্বাস করতেন, রোজ গীতাপাঠ করে পূজো করতেন। তুবড়ি বানাতে ভালবাসতেন। কালীপূজার সময় ক্যাম্পাসের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সকলে মিলে তুবড়ি বানাতেন। তুবড়ির মালমশলা নিজেই কিনে আনতেন।

তোমাদের স্যার স্কুল-কলেজে অনেক প্রাইজ, বই, মেডেল পেয়েছেন। অনেক সোনার ও রুপোর মেডেল পেয়েছেন। সেইসব আমার নাতিনাতনিদের দিয়ে দিয়েছি। বলেছি যত্ন করে রাখতে। এমনিতে একদমই রাগ ছিল না, তবে মেয়ে বাণীকে যখন ডাক্তারী পড়তে দিলাম না, তখন উনি আমার ওপর খুবই রেগে গিয়েছিলেন। পরে বাণী, আর দেবু দুজনেই তো বিনা চিকিৎসায় রামকৃষ্ণলোকে চলে গেল। সম্প্রতি রমুও চলে গেল। উনিও শেষ সময় বলতে গেলে কোন চিকিৎসাই পাননি।

আমার আজ ৯৯ বছর বয়স। আমার বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ির অনেকেই অনন্ত ধামে চলে গেছেন। সবার আত্মার শান্তি কামনা করি। আর তোমরাও সবাই সুস্থ সবল, নীরোগ ও আনন্দ নিয়ে থেকো। সকলের মঙ্গলকামনা করি ও আশীর্বাদ জানাই।

—তোমাদের সকলের মাসীমা দুর্গারাণী বড়াল

রবীন্দ্রনাথের ‘শারদোৎসব’ নাটক

©সংকলনে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮১ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ’ বইটিতে লিখেছেন[1] শান্তিনিকেতনে “পূজার ছুটির পূর্বে ‘শারদোৎসব’ এবং গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে ‘অচলায়তন’ প্রায়ই অভিনীত হইত। ...শান্তিনিকেতনে ‘বিসর্জন’ নাটক বহুবার অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।....‘মুক্তধারা’ বা ‘রক্তকরবী’ শান্তিনিকেতনে কখনো অভিনীত হয় নাই। ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ ঘন ঘন অভিনীত হইত। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক পড়িল ‘বসন্ত’, ‘বর্ষামঙ্গল’, ‘শেষবর্ষণ’ প্রভৃতি পালা-গানের উপর।”

প্রমথনাথ বিশী তাঁর স্মৃতিচারণে আরও বলেছেন, “ ‘শারদোৎসব’ নাটক উপলক্ষে তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] অভিনয় ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সম্রাট বিজয়াদিত্য সাজিয়াছিলেন। জগদানন্দবাবু সাজিতেন লক্ষেশ্বর; এই কমিক ভূমিকায় তাঁহার শক্তি পুরাপুরি বিকাশের সুযোগ পাইত। মাঝে দু-একবার তপন চট্টোপাধ্যায় লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনিও এই ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। আমি প্রথমবার ধনপতি নামে একটি বালকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। বয়স বাড়িলে এই নাটকে অন্য ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছি। পরে শারদোৎসবের নূতন রূপ ‘ঋণশোধ’ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ শেখর কবির ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।”

এবার একটু আগে ফিরে দেখা যাক। ১৮ জানুয়ারী ১৯০৭, শ্রীপঞ্চমীর দিন শমীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের প্রথম ঋতু-উৎসব বসন্তোৎসব হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন না। সেবার ক্ষিতিমোহন সেন ও অন্যান্য শিক্ষকগণ বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করলেন। অবশ্য এই উৎসবের অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন।[2]

ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন[3], “মনে আছে একদিন বর্ষার সন্ধ্যা। কয়েকজন গুরুদেবকে চারদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছি। বর্ষার অজস্রতায় একটি গভীর ভাব

১) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন – প্রমথনাথ বিশী, প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

২) রবিজীবনী (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃ: ২৩ – প্রশান্তকুমার পাল, প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স।

৩) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন – ক্ষিতিমোহন সেন, প্রকাশক : পুনশ্চ, কলকাতা।

সকলের মনকে পাইয়া বসিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন, "যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতামহেরা হয়তো এই তত্ত্ব জানিতেন। তাই প্রাচীনকালের আয়োজনের মধ্যে ঋতুতে-ঋতুতে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার যে সব উৎসব ছিল তাহার একটু-আধটু অবশেষ এখনও খোঁজ করিলে ধরা পড়ে। আমরাও যদি ঋতুতে-ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?" ...আমরা মনে মনে স্থির করিলাম – এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা-উৎসব করিতে হইবে। ...কিন্তু হঠাৎ কি কারণে গুরুদেব কিছুদিনের জন্য বাহিরে গেলেন। যদিও সেবার বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করলেন ক্ষিতিমোহন সেন ও অন্যান্য শিক্ষকগণ" [অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে]।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে বর্ষা-উৎসবের বিবরণ শুনলেন। বিশেষভাবে শরৎকালকে এবার আহ্বান করতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন, "বর্ষা গেল, খুব ভালো করিয়া শারদোৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন, বেদ হইতে ভালো শারদশোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটি নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়। তাহার পর তৈয়ারি হইয়া উঠিল শারদোৎসব নাটক।"

ক্ষিতিমোহন সেন নাটকটি প্রসঙ্গে অন্যত্র লেখেন, "১৩১৫, ৩রা ভাদ্র তারিখে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] গান বাঁধিলেন 'বেঁধেছি কাশেরি গুচ্ছ' ও 'অমল ধবল পালে লেগেছে'। ৭ই ভাদ্র গান হইল 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে'। ইহার প্রাক্তন রূপ ছিল 'আমার সফল স্বপন এলে'...। তখন তিনি প্রকৃতির শুধু হয়তো আনন্দরূপটিই দেখিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মনে আসিল একটি গভীর তত্ত্বকথা। বর্ষার এই পৃথিবী আকাশ হইতে অজস্র রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী তাহা ফিরাইয়া দিয়া ঋণ শোধ করে – এই কথাই গুরুদেবের মনের মধ্যে তখন ছিল ভরপুর হইয়া। সেই কথাটাই শারদোৎসবের বীজ-সত্য।"

ক্ষিতিমোহন আরও লিখেছেন, "গুরুদেব প্রথমে শরতের কয়টি গানই রচনা করছিলেন। তারপর তিনি ঐ কয়টি গানের সঙ্গে গাঁথিয়া গল্পটি মিলাইয়া দিয়া শারদোৎসব রচনা করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অজস্র ধারায় আসিল আরো কয়টি গান; যথা – 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়', 'আনন্দেরই সাগর হতে', 'তোমার সোনার থালায়', 'নব কুন্দধবলদল'। ইহার মধ্যে যজুর্বেদ হইতে একটি বেদমন্ত্রও তিনি গ্রহণ করিলেন এবং বন্দীদের রাজপ্রশস্তি 'রাজরাজেন্দ্র

জয়" – গানটি যে শারদোৎসবে বসাইলেন তাহা পূর্বে একসময় প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার দ্বারাই রচিত হইয়াছিল।

শারদোৎসব নাটকের কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুরুদেব তাঁর আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে শরৎশোভার কয়েকটি গান দিয়ে দিলেন। ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে। দিবারাত্র শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে তখন ধ্বনিত হল "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।..." বা "আমরা বেঁধেছি কাশেরি গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা।..." ইত্যাদি। কিন্তু এতে ছেলেদের মন ভরে না, ছাত্ররা গুরুদেবকে বললে গান তো আছে কিন্তু অভিনয় কই? গুরুদেব বললেন এবার গানই হোক, অভিনয় পরে আর একবার হবে। ছেলেরা নাছোড়বান্দা, অনুনয় করলে, বললে চলবে না। অভিনয় না হলে আমাদের মন ভরবে না। ছেলেদের আবদার রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন কি করে?

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন, "প্রতিদিন প্রভাতে কবি তাঁর সকাল বেলাকার আহ্নিক শেষ করে আশ্রমের চারদিক একবার ঘুরে বেড়িয়ে যান। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের নিয়ম। প্রভাত হল। কিন্তু কই দোতলা থেকে কবির নামবার নাম নেই। সকাল গেল। মধ্যাহ্নও যায়। ছোট্ট বাড়ি দেহলির দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসে কবি লিখেই চলেছেন। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ক্রমাগত লিখছেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, গুরুদেব দপ্তর ছাড়লেন। সকলকে ডেকে বললেন, আমার লেখা হয়ে গেছে। অর্থাৎ শারদোৎসব পালাটি, অভিনয়ে আর গানে ভরপুর হয়েছে, সার্থক হয়েছে। তিনি বললেন, আপনারা আসুন, আমি শোনাই।"

ছাত্রদের একান্ত অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্নানাহার সেরে নাটকটি পড়তে আরম্ভ করলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন "কী অপূর্ব পড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে কী তার গান! সবই কবি একলা করেছেন – কখনো গান গেয়ে কখনো পাঠ করে। নাটক পড়া চলছে। এক-একটি পাত্র প্রবেশ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি-চারিটি কথা শুনেই শ্রোতার দল ঠিক করে নিচ্ছেন, আশ্রমের কাকে কি সাজানো যায়।"

ক্ষিতিমোহন সেন আরও লিখেছেন[4], "ইতিমধ্যে আশ্রমে আমার ঠাকুরদাদা নামটি চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি ভাবিয়াছিলেন আমি ভালো গাহিতে পারি, সেইজন্য শারদোৎসবে ঠাকুরদার ভূমিকাটি আমাকে দেওয়া হইবে স্থির করিয়া তাহাতে অনেকগুলি গান ভরিয়া দেওয়া হয়। যখন আমি বলিলাম, গান আমার দ্বারা চলিবে না, তখনও কবির সংশয় দূর হইল না। তিনি অগত্যা অজিতবাবুকে ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার উপর সন্ন্যাসীর পার্ট করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গান আছে, যদিও সংখ্যায় অল্প। তাহা লইয়াও বিপদ বাধিল কিন্তু গান থাকিলেও সন্ন্যাসীর অভিনয় আমি করিব। ঠিক হইল, গানের সময় বাহিরে আমার

৪) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন – ক্ষিতিমোহন সেন, প্রকাশক : পুনশ্চ, কলকাতা।

অভিনয় চলিলেও ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ গান করিবেন। শারদোৎসব নাটকটি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বাহিরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, এতদিনে এমন একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারেন। সহজে এই কৃতিত্ত্ব লাভ করিয়া খুব খুশি হইলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছিল।"

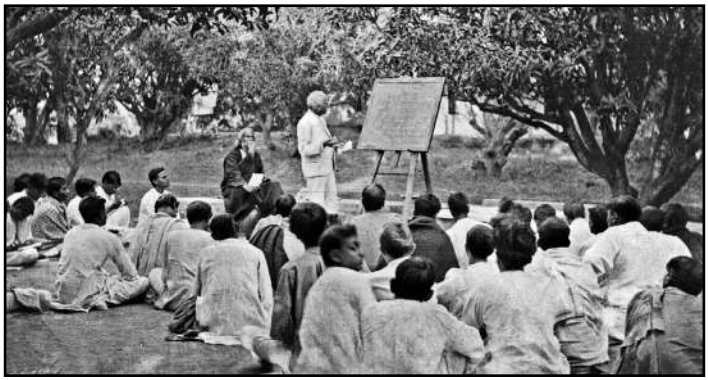

প্রমথনাথ বিশীর কথা[5] দিয়ে এই লেখাটি শেষ করি। "রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে সব নাটককে ঋতু-উৎসব পর্যায়ের মনে করেন, শারদোৎসবে তাহাদের সূচনা।... রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ঋতু-উৎসবের পালা মুখ্যত শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্যই রচিত। ঋতু-উৎসব এই বিদ্যালয়ের একটি প্রধান অঙ্গ; বস্তুত কবির ঋতু-উৎসবের পালা ও এই বিদ্যালয়কে ভিন্ন করিয়া দেখা একরকম অসম্ভব। তাঁহার ঋতু-উৎসবের যথার্থ পটভূমি ও পীঠস্থান এই আশ্রমবিদ্যালয়। ইহার কারণও আছে, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতির বিশেষ স্থান আছে। তাঁহার বিদ্যালয়ে যেমন ধর্মোপদেশের দ্বারা ছাত্রদের কাছে ভগবানের ইঙ্গিতদানের চেষ্টা আছে, তেমনি ঋতু-উৎসবের দ্বারা ছাত্রদের মনকে প্রকৃতির প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টাও আছে, কারণ মানুষ, প্রকৃতি ও ভগবানে মিলিয়াই তাঁহার জগৎ সম্পূর্ণ।"

তথ্যের খাতিরে জানিয়ে রাখি 'শারদোৎসব' অভিনয় হয় মহালয়ার আগের দিন ৮ আশ্বিন [বৃহ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮]। এর পর বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেলে ছাত্র-শিক্ষকেরা আশ্রম ত্যাগ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ১১ আশ্বিনই ক্ষিতিমোহনকে লিখছেন: 'আমাদের আশ্রম শূন্য হয়ে এল। ছেলেদের মধ্যে কেবল পটল ও ভোলা আছে - অধ্যাপকদের মধ্যে শাস্ত্রীমশায়, শরৎবাবু ও যতীন এবং বাজে লোকেদের মধ্যে ম্যানেজারবাবু ও আমি, ...তেজেশ [তেজেশচন্দ্র সেন] লাইব্রেরির মধ্যে নিমগ্ন।'

৫) রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ (দ্বিতীয় খণ্ড) – প্রমথনাথ বিশী, প্রকাশক : মিত্রালয়, কলিকাতা।

‘লাল পাহাড়ির দেশে যা’ – একটি কবিতার পঞ্চাশ বছর

©অরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৭০ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
সংযোজনে অসীম দেব, ১৯৭২ ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

ভাই অসীম,
যে কবিতাটি নিয়ে সারা পৃথিবীর বাঙালির আদরের অন্ত নেই, তিনটি প্রজন্ম নাচ্ছে, গাইছে, অন্য ভাষায় অনুবাদও হয়েছে, সেই কবিতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল, নানা জায়গায় পালন হয়েছে ও হচ্ছে, তারই ওপর লেখাটি পাঠালাম, পড়ে দেখো কেমন লাগে।

আমি, ১৯৬৮ তে পাশআউট হওয়ার কথা, ১৯৬৩ তে কলেজে ভর্তি, কিন্তু পাসআউট ১৯৭০, পাহাড়, হিমালয়ে ট্রেকিং, বাউল সাধনা, অবদুতের কাছে তন্ত্রতালিম, বাংলার মেলায় মেলায় ঘোরা, বাংলায় অকারণ বিপ্লব, খুন, অযাচিত রক্তপাত, শহীদযাপনের অবমাননা, আসল শহীদ দেখতে আন্দামান চলে যাওয়া, আর কবিতার ঘোলাটে চর্চা, ষাট দশকে কবিদের দাদাগিরি, ১৯৫৮ সালের বিই কলেজের প্রাক্তনী কবি বিনয় মজুমদার, সিনিয়র কবি ও কলেজতুতো দাদার অপমান, জঙ্গলমহল জীবন, আদিবাসী সঙ্গ, ওদের প্রকৃতি চেতনা, সংস্কৃতি গান, একতাবোধ, ওদের নিপীড়ন, অবহেলার ইতিহাস,... সব মিলিয়ে দুটো বছর পেছিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু যা পেলাম তা আমার জীবনে পরম পাওয়া... একটা আবেগ করে যায় ভেতরে ভেতরে, হয়তো সেই জন্যেই সব কিছু গুছিয়ে কিছু করা হয়ে উঠলো না। একটি এলোমেলো, বহেমিয়ান জীবন যাপন করলাম।

ভাই, কী হল জানি না, তবে গানটি আছে, থেকে যাবে। ১৯৭২ সালে লেখা, ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মুখে মুখে আবৃত্তির মাধ্যমে সারা বাংলায় ছড়িয়ে যায়, ১৯৭৯ সালে পুজোর গান হিসেবে, প্রকাশ পায়, মানবেন্দ্র, হেমন্ত, দ্বিজেন, আরতি, সন্ধ্যা, আরও অনেকের পাশে নতুন গান, নতুন মুখ, একটা চ্যালেঞ্জ ছিলই।

একটি কবিতার পঞ্চাশ বছর

১৯৭২ সালের এক আবেগময় মুহূর্তে একটি কবিতা লিখেছিলাম ‘লাল পাহাড়ির দেশে যা’। আজ ২০২২ সালে এই কবিতাটি গান ও কবিতার রূপে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছে। পিছুপানে তাকিয়ে এর ইতিহাস নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে হল।

ভুমিকায় বলি, পৃথিবীর সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে শ্রেষ্ঠ শিল্প হলো গান, তারপরেই কবিতার স্থান, কবিতাকে আমরা বলি সূক্ষ্ম চেতনা শিল্প, আর কবিতায় সুরারোপণ হলেই সংগীত, প্রায় সাড়ে আটশো বছর আগে কবি জয়দেবের সময় থেকে গীতিকবিতার পর্ব শুরু হয়েছে। কবি কবিতা লিখতেন আর রাজা লক্ষণ সেনের রাজসভার অন্যতম কবি জয়দেব, কবিতায় সুর স্থাপন করে গাইতেন, এমনটিই ছিল তখনকার বিনোদন ব্যবস্থার রূপ। কবিতার উৎসমুখ (nucleation) ছিল রাধাকৃষ্ণের লীলার অনুরাগ, বীতরাগ, অভিমান, দেহবল্লরীর নিবিড়তা, কামবিলাসের অপূর্ব মগ্ন অনুভব, লীলার গভীর ঘনত্ব, দেহ থেকে দেহাতীত অবস্থানে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি শেষে মানসিক রমণের আয়োজন। নানান রাজকার্যে নিমগ্ন ক্লান্তি অবসাদ থেকে রাজা মুক্ত হয়ে আবার নব উদ্যোমে রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন। সেই থেকে গীতিকবিতার ধারা আজও বয়ে চলেছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে। এ এক অপূর্ব পরম্পরা, রবিঠাকুরের গীতাঞ্জলি সেই প্রবহমান ধারার অনবদ্য শ্রেষ্ঠ উপহার, আমার মনে হয়েছে যে কোনো সৃষ্টির মূলে একটি উৎসমুখ থাকা খুবই জরুরি। সেই উৎসমুখটিকে বলতে একটি nucleation site, যেখান থেকে চিন্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তারপর বর্ধন বা বেড়ে ওঠা (growth), এরপর রূপান্তরিত হওয়া (transmigration) যে কোনো গঠনে, কবিতায়, গানে, ভাস্কর্যে, নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, ছবিতে (painting) বা রম্যারচনায়। এভাবেই একটি বিজ্ঞান সব সৃষ্টির অন্তরালে কাজ করে চলেছে তিনটি phase বা অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে,

1. Nucleation,
2. Growth,
3.Transmigration

এটিই অপূর্ব বিজ্ঞান মেনে বা না-মেনে, জেনে বা না-জেনে সৃষ্টিকররা নিজ নিজ কাজটুকু করে চলেছেন,...

আমাদের শরতকালে নীল আকাশ আছে, তাতে সাদা মেঘেরা ভেসে বেড়ায়, এটি শরতকালের চিরকালীন চিত্রপট। আমরা দেখেছি, আমাদের আগেও মানুষজনেরা দেখেছে, কিন্তু রবিঠাকুর এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে কবিতা লিখলেন ... নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই ... এই লেখায় সুরারোপণ করে গান হল, আমাদের ছেলেমেয়েরা একশো কুড়ি বছর ধরে নেচে চলেছে,...

ঠিক এভাবেই, সেটা ছিল ১৯৭২ সাল, আমাদের হুগলী জেলার শ্রীরামপুর স্টেশনে একটি মহুয়া গাছকে দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এ গাছটি এখানে কেন? বুঝতে পারলাম একটি nucleation site তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই মহুয়া গাছ আমার খুবই প্রিয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, রাঁচি, হাজারীবাগ, মধ্যপ্রদেশ, সিংরোলি, বিহার, ঝাড়খণ্ড আরও অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত দেখেছি। সারা জঙ্গলমহল

জুড়েই এদের অবস্থান, আর এদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে আদিবাসী সমাজ, ওদের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, বিনোদনের ঘন উপাদান, অপূর্ব বন্ধনক্রিয়া। আর আমি নিজের মনেই প্রশ্ন প্রশ্নে জর্জরিত... লালমাটির গাছ এখানে কেন? আমাদের এই হুগলী জেলায়, এই জেলা তো ধানের দেশ, আলুর দেশ, আমের দেশ। তাহলে এখানে কেন?

এরপরই আমার মগজে কবিতার জন্ম। আমি অনেক আগেই লিখেছিলাম, কইতে কহ যে, কবির জরায়ু থাকে কবির মগজে, কে বোঝে সহজে, কবির জরায়ু থাকে কবির মগজে... তারপর আমার এই কবিতার জন্ম, গাছটা বেমানান, এই স্টেশনে গাছটিকে এক্কেবারেই মানাচ্ছে না। যেমন আমি, ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম, হয়ে গেলাম ইঞ্জিনিয়ার। ঘণ্টা হল, একটি অসফল কারিগর, কিন্ত মগজজাত একটি সন্তান প্রসব হল। সে এক চূড়ান্ত যন্ত্রণা, nucleation পর্যায় থেকে growth পর্যায়ে শেষ। একটি সৎ ফসলের জন্ম ঘটাতে অন্তর্লীন শক্তির বিক্রিয়া তখন কোষে কোষে ঘটাচ্ছে বিপর্যয়, আলোড়ন, ভ্রূণ থেকে শিশুর অবয়ব ঘটে গেছে মগজের গর্ভাধারে। সে যে আলো চায়, পৃথিবীতে আসতে চায়, গর্ভফুলের কোরকের অন্ধকার আর তাঁর ভালো লাগছে না। সে আসবেই, প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে সে প্রকাশিত হবেই আপন মাধুর্যে। পাথরে পাথরে বপন করে যাচ্ছে তৃষ্ণা, চাই চাই, তৃষ্ণা যে মেটানো চাই। অরণ্য ভর করেছে, বনবাসীদের নিটোল কালো মুখগুলি আমার চারপাশে, কী চায়? পাতায় পাতায় বেজে উঠছে আদিম মাদল, গান। নৃত্যমুখর পায়ে পায়ে যাচ্ছে সাতসাগরের ঢেউ। কতগুলো স্নায়ু ছিঁড়ল, আর কতো বাকী? কষ্ট যে আর সহ্য হয় না, বড্ডো কষ্ট হে, বড্ডো কষ্ট। শব্দ চাই, শব্দের রঙ চাই, শাদা ক্যানভাস কই? হে অরণ্য, শব্দ দাও, মাদল, সুর দাও, লেখার তুলি দাও, কবিতা এবার জন্ম নাও। কবি প্রস্তুত, হে পাঠক, তুমি? হে প্রবহমানতা, তোমার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের ছিঁটেফোঁটা আমাকে অর্পণ করো, শব্দের ছবিতে ওকে লালন করবো,... আমাকে মুক্তি দাও,...

কে বসালো এই গাছ? এপ্রিল মাস, স্টেশনের ব্যস্ততা, একটু আগে বিরাট একটা ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন কাটোয়া লোকাল টেনে নিয়ে গেছে। একটা অপূর্ব অতি চেনা গন্ধ আমাকে সচেতন করে তুলল। আনমনে খুঁজতে খুঁজতে দেখি যে আপ স্টেশনের শেষপ্রান্তে একটি পাতাহীন গাছে অজস্র ঝুমকো ঝুমকো মহুয়া ফুলের গুচ্ছ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। গাছের গোড়ায় মহুয়া ফুল ছাড়িয়ে রয়েছে, অনাবিল আনন্দে, যেমন জঙ্গলমহলে করে থাকি। স্টেশনের সেই নোংরা মাটি থেকে মহুয়া ফুল কুড়িয়ে খেতে লাগলাম। আহা, কী আনন্দ সেই ফুলের রসে রসে। হঠাৎ খেয়াল হল আমাকে ঘিরে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবাক হয়ে দেখছে, কী সব বলাবলি করছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরতেই, সুরিন্দর চাওয়ালা, আমাকে আগে থেকেই চিনত, বললে, সাব, ঠিক হ্যায় তো? আমি আর ফুল কুড়িয়ে না খেয়ে, পকেট থেকে

রুমাল বের করে তাতে রাখতে লাগলাম। একটু লজ্জা আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তখন কী আর করতে পারতাম? সুরিন্দরের কাছ থেকে চা নিয়ে খেতে লাগলাম।

এইবার এই ভাবনা থেকে শুরু হল আমার চিন্তন প্রক্রিয়া। ওদের প্রসন্ন মুখগুলি মনে পড়লো, মনে পড়লো ওদের গান, বাই বাগিয়াম তিনা গ, সুরজমণি রাণী গ, বাই বাগিয়াম তিনা, অপূর্ব পরস্পর কোমরবন্ধনে আবদ্ধ সমবেত নাচ, মাদলি মাদল বাজাইন দাও হে, তুরুতরু তুরুতরু, কইলকাতা থেকেন আইলেন বিদ্যাসাগর গুরু... পায়ে পায়ে ভেঙে যাচ্ছে হাজার সাগরের ঢেউ, অপূর্ব তালে ছন্দে উদাত্ত মাদলের বোলে নেচে নেচে উঠছে আকাশ বাতাস,

গুবদাগুপুং গুবদাগুপুং গুপুং

গুবদাগুপুং গুবদাগুপুং গুপুং

অপূর্ব মগ্নতায় আচ্ছন্ন তলতলে মুখ, মেয়েদের খোঁপায় ফুল, শালপাতার ঝুলর, গলায় বনফুলের মালা, অপূর্ব নিজস্ব ঢংয়ে আটোসাটো কাপড়ের শারীরিক বিন্যাস, মুখে মুখে লেগে আছে সারল্যের উদ্ভাসিত আলো, মনের গভীর অন্তরালে কবিতার জন্মবীজ মগজে অঙ্কুরিত হচ্ছে ...

জন্ম নিলো কবিতা...

হে পাঠক, তোমার অধিকার বুঝে নাও এবার...

শ্রীরামপুর ইস্টিসনে মহুয়াগাছটা

হাই দ্যাখো গ', তুই ইখানে কেনে,
লাল পাহাড়ির দেশে যা,
রাঙামাটির দেশে যা
হেথাকে তুকে মানাইছে নাই গ'
ইক্কেবারেই মানাইছে নাই
অ-তুই লালপাহাড়ির দেশে যা...
সিখান গেইলে মাদল পাবি
মেইয়া মরদের আদর পাবি
অ-তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা লারবি যদি ইক্কাই যেতে
লিস না কেনে তুয়ার সাথে
নইলে অ-তুই মরেই যা
ইক্কেবারেই মরেই যা
হাই দ্যাখো গ', তুই ইখানে কেনে,
লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙ্গা মাটির দেশে যা
রাঙ্গামাটির থানে যা...

অনুলেখ :—
ঐ মহুয়াগাছ আমার মনের মধ্যে যে বিস্ফোরণ ঘটালো, অন্য কবির মধ্যেও ঐ বিস্ফোরণ অন্যভাবে ঘটাতে পারে, এ কথা অনস্বীকার্য। যে কবি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার স্বস্থান থেকে সত্যকার আত্মপ্রকাশ ঘটুক, সৎ রুচিশীল সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নিশ্চয় তাই...

এরপর নানান জায়গায় কবিসম্মেলনে কবিতাটি আবৃত্তি করি। ১৯৭২ সাল, কবিতাটি অনেকেই ধীরে ধীরে গ্রহণ করছে। ষাট দশকে কফি হাউসের সো কল্ড আঁতেলরা কিন্তু নেয়নি। অন্য আঞ্চলিক কবিতাগুলি, লিবে লিবে বাবুগুলা সব লিবে, লিয়ে লিয়ে মজা লুইটবেক, হাই গো জঙ্গলমহল জুড়ে শহর আইছে গো শহর আইছে, আনধার থাইকবেক নাই, কফি হাউস নেয়নি...

এরপর বিখ্যাত সংগীত সুরকার ও কম্পোজার ভি বালসারা মশাইয়ের আনুগত্যে আমার আর আমার অগ্রজ কবি রূপনারায়ণপুরের অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দুটো দুটো করে চারটি কবিতার প্রচলিত সুরে গান গাইল বেলিয়াতোড়ের সুভাষ চক্রবর্তী। সেই সময়, মানে ১৯৭৯ সালে মান্না দে, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাস, নাজিম হিকমত... কবিতার গান, আধুনিক গান গাইতো। তখন ওকে বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র এবং আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ শুনে ওকে আমার কবিতা দেখাই, এবং ও চারখানা গান তৈরি করে। আমি এরপর ওঁকে বালসারা সাহেবের কাছে নিয়ে যাই। বালসারা সাহেব INRECO কোম্পানি থেকে, তখনকার নিয়ম অনুযায়ী আমার কবিতার গান পুজো সংখ্যার গান হিসেবে প্রকাশিত হয়। বালসারা সাহেব মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টটা দেখতেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, যে লোকসংগীতের একটা অন্যরকম চাহিদা থাকেই, অন্তত গ্রামবাংলায়। হলও তাই। রেকর্ড বের হবার পর ত্রিপুরা, আসাম, গ্রামবাংলায় ঐ গান নিয়ে হই হই পড়ে গেলো। ঐ রেকর্ডে লাল পাহাড়ির দেশে যা, এই নাম দিয়ে লিরিক হিসেবে চিহ্নিত হলো, সংগীত পরিচালনা ও গায়ক সুভাষ,...

এরপর চূড়ান্ত জনপ্রিয় গান লাল পাহাড়ি দেশে যা, যখন বাউলদের কানে গেল, ওরা বেশ মজা পেয়ে গাইতে গাইতে আরও জনপ্রিয় করে তুলল। নিমাই গোসাঁই বাউল গানের পাশাপাশি লাল পাহাড়ি গেয়ে ওর দর এমন বাড়তে লাগল যে গানটি আসরে দুবার তিনবার গাইতে হল। শেষে একদিন আমার কাছে এসে বললে, গুরু, (সে আমাকে গুরু মনে করত), গানটো বড়ো ছোটো হইনছে, উটাকে বড়ো কইরে দ্যান, আমি তখন দুটো স্টানজা বাড়িয়ে সুর দিলাম। সেই গান আজ সারা পৃথিবী

সুরে সুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, বাউলরা গাইছে, ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট থেকে বাচ্চা বাউল গানটি গাইছে,...

তবে এই গানকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ছাপা কবিতা, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থে অরণ্য হত্যার শব্দে সংকলনে মুদ্রিত, রেকর্ডে আমার নাম মুদ্রিত, তবুও কেউ কেউ বলে যাচ্ছেন যে এটা তাঁদের গান। একটা ভুল আমার দিক থেকে হয়েছে যে, আমি গানটির কোনো কপিরাইট করিনি। আসলে কপিরাইট যে করতে হয় সেটা আমি জানতামই না। মুদ্রিত রেকর্ডে আমার আরও একটি গান, যা হবার তা হবেক গো,... আমার তিনখান কবিতা পাঞ্চ করে ভূমি নামক একটি ব্যান্ড ওদের নিজেদের গান বলে চালিয়ে প্রচুর ব্যবসা করল। অনুমতি নেয়নি। কোনো সিডি বা ক্যাসেট দেয়নি, গানটির মধ্যে নাগর বলে একটি শব্দ যোগ করে ওদের গান বলে চালিয়ে গেল। পরে, কবিতাটির চল্লিশ বছর উদযাপন করার সময়, আয়োজক সহাজিয়া ব্যান্ড, রবীন্দ্রসদনে, কলকাতা, সৌমিত্র ব্যান্ডের গায়ক পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিই। প্রথমদিকে অনেকেই দাবী করেছে যে তাদের গান তাঁদের সুর, কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। আর কি করেই বা দেখাবে,...

একদিন দিল্লি থেকে OVER DOZE প্রোডাকশন হাউসের ডিরেক্টর স্পন্দন ব্যানার্জি এলেন। লাল পাহাড়ি গান নিয়ে তিনি ডকুমেন্ট করলেন। অনেক আগে থেকেই অনেকে নানান সুরে গানটি গাওয়ার চেষ্টা করেছিল। পবন দাস দাবী করল সুরটি নাকি তার, যদিও তার অনেক আগেই প্রচলিত কোম্পানি থেকে সুরে গানটি রেকর্ড হয়ে গেছে। গানটি কোনো এক সিনেমায় নাকি ব্যবহার করেছেন নাম দেয়নি, অনুমতি নেয়নি, লেখক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন, অনুমতি নেননি, নামও দেননি। অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় উষা উথুপ, আমাকে কাছে ডেকে অনুমতি নিয়ে গানটি গেয়ে শুনিয়ে টাকা দিয়ে, কিছু উপহার দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। দিল্লির ছেলেরা যে ফিল্মটি বানিয়েছিল, Youtube-এ আছে, you don't belong, নিউ ইয়র্কে প্রিমিয়ার হয়েছে। অন্যান্য বিদেশে, দেশেও হয়েছে। দিল্লিতে হয়েছে, গানটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। কেরল সরকার ফিল্মটিকে পুরাস্কৃত করেছেন। কয়েক বছর আগে সহজমা অর্থ সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেছেন,...

এখনও কিছু ছেলেমেয়ে কবিতাটি বলে, কেউ কেউ গান গেয়ে প্রাইজ দেখাতে আসে,...

কয়েক মাস আগে শান্তিনিকেতনে একটি দল ওখানে বেড়াতে এসে, আমাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে, প্রায় তিরিশ জন ঘুরে ঘুরে লাল পাহাড়ি গান গেয়ে নেচে দেখাল। তারপর একজন বয়স্ক মহিলা এগিয়ে খুব খুশি হয়ে বললেন, দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, দেখলাম, সবাই খুশি। পরে বললেন, আমি দিদিমা, এই আমার

মেয়ে, এই আমার নাতনি। তার মানে তিন তিনটি প্রজন্ম গানে গানে মজে আছে। সবাই ভুলভাল গাইছে। যে যেমন খুশি ইম্প্রোভাইস করছে।

অনেকেই জানিয়েছেন ঠিক গানটি চাই, সেটি এখানেই থাক, পাঠক, গায়ক ও আবৃত্তিকাররা খুঁজে নিক। তবে একটা কথা ঠিক, আমি তো ছোটো কবিতা লিখেছিলাম, সেটি গান হয়ে সারা পৃথিবী ছড়িয়ে গেল, বাংলা কবিতার জয় হোক, বাংলা গানের জয় হোক...

কবিতা : লাল পাহাড়ির দেশে যা
কথা ও সুর অরুণ কুমার চক্রবর্তী

হাই দ্যাখ গো, তুই ইখানে কেনে,
ও তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা
রাঙামাটির দেশে যা
হেথাকে তুকে মানাইছে নাই রে
ইক্কেবারেই মানাইছে নাই রে
লাল পাহাড়ির দেশে যাবি
হাঁড়িয়া আর মাদল পাবি
মেইয়া মরদের আদর পাবি
হেথাকে তুকে মানাইছে নার রে, ইক্কেবারেই মানাইছে নাই রে
নদীর ধারে শিমুলের গাছ
নানা পাখির বাসা রে নানা পাখির বাসা
কাল সকালে ফুইটবে ফুল
মনে কতো আশা রে মনে কতো আশা
সেথাকে যাবি প্রাণ জুড়াবি
মেইয়া মরদের আদর পাবি
হেথাক তুকে মানাইছে নাই রে, ইক্কেবারেই মানাইছে নাই রে
ভাদর-অ আশ্বিন-অ মাসে
ভাদু পূজার ঘটা রে ভাদু পূজার ঘটা
তু আমায় ভালোবেসে পালিয়ে গেলি
কেমন বাপের বেটা রে কেমন বাপের বেটা
মরবি তো মরেই যা
ইক্কেবারেই মরেই যা
হেথাক তুকে মানাইছে নাই রে
ইক্কেবারেই মানাইছে নাই রে...

Durgotsav and Navaratri (Autumnal)

©Sarasij Majumder, 1971 Civil Engineering

'Durgotsav' is observed every year in 'SHUKLA PAKSHA' of Ashwin (Early Autumn Month) in West Bengal, Tripura, in part of Bangladesh, and Nepal, and performed by Bengali Hindus. This regional ritual cum Festival performed in West Bengal is not related to Rama, Ravana, or Ramayana. 'Navaratras' is performed twice, by mainly rest of the North Indian Hindus—once in Spring—connected to birth of Lord Sri Rama, and again during same period as Durga Puja, conceived connected to Rama's win over Demon King Ravana.

Now let us review the ancient texts for relevance, and connection. We will look into the historical background also.

Photo: The Temple of King Kangsa Narayan, at Tahirpur, Rajshahi, Bangladesh. According to legend, Bengali Durga Puja was performed for the first time here in the Indian subcontinent in the year 1580.

VALMIKI RAMAYANA:

According to the Valmiki Ramayana, Ravana was killed on the Amavasya (new moon day) of the month of Phalguna.

Details about this date from the epic as under:

- The final battle is said to have occurred on the last day of the Hindu year, which was Phalguna Amavasya day.
- Some calculations suggest this day corresponds to November 15, 7292 BCE, based on astronomical observations described in the text, such as Mars's ascension on the Vishakha Nakshatra.
- As per Valmiki Ramayana, Rama didn't perform 'AKAL BODHONO'.
- We can conclude that Valmiki wrote it around 400 BCE. Rama might have ruled around 7,000 years ago. Astronomical calculations and evidence such as the Ram Setu suggest the events occurred around 5114 BCE (approximately 7,100 years ago)
- There are hundreds of sites confirmed by archaeological findings that relate to the events listed in Ramayana, but the events of the epic have not been conclusively dated to 7,000 years ago by scientific dating or archaeological evidences.
- This is in contradiction with Vijayadashami, the tenth day of the bright half of Ashwin, which is the date commonly celebrated for the defeat of Ravana in modern practice.

RAMCHARITMANAS by TULSIDAS:

No, the story of 'Akal Bodhon' does not appear in Tulsidas's 'Ramcharitmanas' also.

- The Ramcharitmanas focuses on Rama's supreme divinity and DIVINE POWERS. It does not include the episode of Durga worship or the need for an elaborate puja to awaken her.
- In Tulsidas's narrative, Rama is considered a direct incarnation (Avtar) of God (Vishnu), and his victory over Ravana is a natural outcome of his divine power, rather than needing intervention and support from another deity.

- According to the Ramcharitmanas, the demon king Ravana was killed by Lord Rama on the tenth day of the bright fortnight of the Hindu lunar month of Ashvin. This day is celebrated as Vijayadashami, as well as Dussehra.
- Commemoration: The annual festival of Dussehra marks this day and celebrates the victory of good over evil. In northern India, it is traditionally celebrated with the burning of effigies of Ravana, along with his key alliances, brother 'Kumbhakarna' and son 'Meghnad'.
- Tulsidas began writing the Ramcharitmanas in 1574 CE (Vikram Samvat 1631) and completed it in 1577 CE, during the reign of the Mughal emperor Akbar. It is written in the Awadhi dialect of Hindi. The composition of the scripture started in Ayodhya on Ram Navami and significant portions were later written in Varanasi.

RAMAYANA BY KRITTIBAS OJHA:

The narrative of Rama performing an untimely worship (akal bodhon) of Goddess Durga to receive her blessings before defeating Ravana is originated from this version of the Ramayana, known as the Bengali Krittivasi Ramayana. This is a 15th-century Bengali version of the epic. Krittibas is estimated to live from 1381 to 1461, and the Krittivasi Ramayan was composed in the first half of the 15th century. This places it composed before the famous 'Ramcharitmanas' written by Tulsidas.

REFERENCES OF HINDU RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL TEXTS ON 'AKAL BODHANA':

Actually—there are three aspects: (1) Akal Bodhana. (2) Performing that in 'Sharadiya Shukla Paksha' and (3) Lord Rama performing it from Krishna Navami (?) to Shukla Navami in the month of Ashwin to awaken Devi Durga to kill Demon King Ravana. We will examine all the three in ancient texts—but still some ambiguity remains.

** Śrīmahābhāgavatapurāṇa: This Pouranic text is the primary source for the Akalabodhana, or "untimely awakening" of the goddess, which got traditionally linked to the story of Rama worshipping Durga to gain victory over Ravana.
** Bṛuhaddharma Purāṇa: This text describes the story of Rama's invocation of the goddess during the autumn (Sharat), instead of the traditional spring worship. Bṛuhaddharma Purāṇa, was composed in the second half of the 13th century. Modern scholars believe it was written in Bengal, based on its use of some specific Sanskrit words and proverbs that were observed popular in that region. The text itself identifies as the last of the 18 Upapurāṇas (minor Purāṇas). Academic dating: The dating is primarily based on the analysis of modern scholar R. C. Hazra. This narrative is the basis to the 'Akal Bodhana' ritual performed during Durga Puja today.
** Role of Other Puranas in Durga Puja: The Kalika Purana, along with the Devi Purana established the procedural guidelines (Paddhati) for Durga worship. It provides the framework for performing the ritual, but not the mythological justification for the 'Akal Bodhona' in autumn. The Kalika Purana is a major Shakta Upapurana (a minor Purana) composed around the 10th or 11th century CE in the Kamarupa region (modern Assam). It glorifies Goddess Kali and Kamakhya and provides detailed, tantric rituals for the worship of the goddesses.

Timing of worship: The Puranas refers to the practice of worshipping Durga but does not mention the Akal Bodhon myth to explain the autumn timing. The timing of Durga's worship in autumn (Sharad Navratri) is described in a few places, but the specific story of Rama awakening her out of season is not present in these texts.
** Devi Bhagavata Purana: This sacred text, focusing on the goddess Mahadevi, includes narratives and references relevant to the worship of the goddess, including the ritual of her awakening.
** Bengali Version of Bhagavata Purana: According to the Bengali version of Bhagavata Purana, when Ravana awakened Kumbhakarna and sent him to fight in the Lanka war, Rama was terrified. Brahma

assured Rama and told him to worship Durga for success on the battlefield. Rama told Brahma that this was not the proper time (akala) to worship the goddess as it was the time, prescribed for her sleep. Brahma assured Rama that he would perform a puja for the awakening (bodhana) of the goddess. Rama agreed and appointed Brahma as the purohita (priest) of the ritual. Brahma performed the puja from the period of Krishna Navami till the death of the Ravana, during Shukla Navami.

SOURCE: Written by 'Vedabyas' and translated by "Mahamahopadhyay Panchanan Tarka Ratna." This PURANA, originally compiled by Sage Veda Vyasa, between 800-1,000 CE seems to be the latest, and best source of Rama performing Akal Bodhon of Devi Durga, to defeat Ravana.

Bengali Durgotsav:

Durga Puja is not an ancient SANATANI RITUAL. The Markandeya Purana on which Durga Puja is based was written in the post-Buddhist era, during the time of Shankaracharya. The 700 verses selected from this Markandeya Purana are called DURGASAPTASHATI or SRI SRI CHANDI. And the other religious texts on which Durga Puja is referred are 'Devi Purana', 'Devi Bhagavata', 'Kalika Purana', 'Durga Bhaktitarangini', 'Bruhat Nandikeshwar Purana', and other texts referred before. None of these religious texts are older than 1600 years. And before the Pathan era in BENGAL, the Goddess Durga mentioned in various scriptures was "ASTOBHUJA". Durga Puja was not even performed in the near post-Buddhist era, in Bengal, including the Pala and Sena eras. The history is silent on this.

The autumn Durga Puja of the ten-armed Goddess Durga as seen today in Bengal was first introduced during the Pathan era. It was introduced by one of the 'BARO BHUNIYANS'—Kangsanarayan Roy (original surname was Sannyal), a very big landlord of Taherpur in Rajshahi district of Varendrabhumi. He declared, "I want to perform

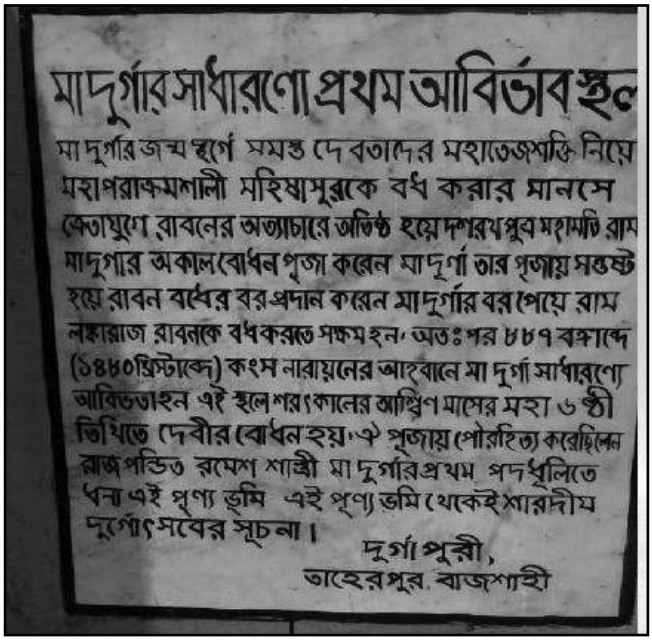

the Rajsuya Yajna or Ashwamedha Yajna".

Brahman Pundits told him that Ashwamedha/Rajsuyo are not allowed to be performed in Kali Yuga. Instead, He should Worship the Devi Durga as mentioned in the Markandeya Purana. He then

performed Devi Durga Puja in Autumn, in 1480, by spending seven lakh gold coins. The puja became so popular and had profound impact on Hindu Bengali society. Further, Raja Kangsanarayan Roy allowed all Hindus under his Zamindari area, of all casts and Varnas, to participate in that Puja. This happened for the first time. An all-inclusive celebration!! After that, the puja gained popularity among Zamindars, and gradually spread - first among the landlords, then among others. In the end, the matter became a competition to advertise personal wealth. It is said, first Kangsanarayan and the next year, the Zamindar of Jessore, Jagadvallabh Roy, spent eight lakh rupees on this puja.

This zamindari festival gradually spread to other levels of society about 300 years ago. In Calcutta/Kolkata, 'BABUs started performing Durga puja about 270 years ago, and are associated with a dirty, inhuman culture, related to Indian Roller mistaken as 'NILKANTHA' bird, but I will cover that separately, in another 'BLOG'. In Guptipara of Nalagarh police station in Hooghly district, a few young men there (twelve friends, Baro Yar) collected money from local residents, and performed this puja, by CROWD FUNDING about 225 years ago. After that, this puja was taken to the general level and was named "BARO-YARI DURGA PUJA."

DURGA IDOL CONCEPT:

Buddhist Tantric goddess Raj Rajeshwari (also taken from Hindu Tantric, or Shakti cult) may be the basis of this idol. More than 1,100 years ago, this four-armed goddess (Buddhist Tantric Goddess evolved and transformed again into a Hindu mythological Goddess) was transformed into an 'Ashtavuja'. The name is Dakshayani. Again, later, this goddess became 'ASTADASHAVUJA'. The name is Goddess Chandi, who can have 8, 10, or even 18 hands depending on the specific form and iconography. The 'DASHAVUJA' goddess Durga is a form of Devi Chandi, and that we see today was first worshipped by Kangsanarayan Roy.

In West Bengal this year (2025), approximately 45,000 Durga Pujas were estimated had been performed, with about 3,000 in Kolkata and the remaining 42,000 in the other districts of the state.

MITHILA CONNECTION:
The location of Mithila is disputed among Janakpur in present-day Nepal, Baliraajgadh in present-day Madhubani district, Bihar, India, Sitamarhi in present-day Bihar, India, and Mukhiyapatti of Mukhiyapatti Musharniya rural municipality of Dhanusha in present-day Nepal. In Mithila, 'DURGA MAIJI' was worshipped in Autumn Navaratri, even before it was started in Bengal—but I will cover that in a separate 'BLOG'.

WHAT EMERGE:

1. 'Navaratra' in Shukla Doshomi of Ashwin Month ends with 'Ravan Badh' by Lord Rama, in hindi speaking North India. Devi is worshipped in nine (9) forms.
2. 'Bijoya Doshomi' in West Bengal and in adjoining areas end with the killing of Demon King' Mahishasur' by Devi Durga, who is also worshipped in an elaborated manner for 4 days or more.
3. 'Akal Bodhona' is related to this Puja but not mentioned in 'Valmiki Ramayana'. The day Rama killed Ravana is different there.
4. Krittibasi Ramayana corelated this based on some puranas.
5. One of 'Baro Bhuiyans' Zamindar Kangsa Narayan of Taherpur started this puja in Bengal in 1480.
6. Baro Yar of Guptipara made it a Public Religious Festival in Bengal, and present CM made it a Carnival in West Bengal.
7. UNESCO added the 'Kolkata Durga Puja' to the list of 'Intangible Cultural Heritage of Humanity'.
8. Oldest Durga Puja may have a 'MITHILA' connection.
9. I think—'Bharat Mata', who is typically shown dressed in a saffron

or orange sari, holding a saffron flag (sometimes National Flag) and standing beside a lion, may be modelled on Devi Durga. A famous 1904 painting by Abanindranath Tagore depicts 'Bharat Mata' as a four-armed goddess, offering symbolic gifts to her children.

References: All Are Mentioned In The Text.

Images: Personal Image Library & Internet.
** Further details about Kangsa Narayan Roy and the Taherpur zamindari is covered in my 'BLOG' on 'BARO BHUIYAN'.

Disclaimer: I don't intend to offend any person with specific religious concept of Devi Durga. I only explained my understanding with various references, which I read.

Our BE College Sports Days, 1959-63

©Contributors: (All from the 1963 batch)

I am Jayanta Majumdar, 1959-63 B.E. College, Metallurgy.

When you ask me to name a few star players of our days or few incidents, indeed a difficult task. Remembering all those now after so many years is not that easy, one of the toughest task for me. Even my HOD, respected Prof. Arun Seal never gave me such a difficult assignment. But Sahityika editors Asim who asked me if I can. That "if I can" was an indirect task. Knowing Asim for the last few decades, he won't let me go. And so, I had to agree.

First, let me remember a few names:

The first name that I remember, my hero, my sports idol, that was Subrata Mukherjee, 1954-58 batch of Electrical Engineering. He captained our college team in all the 3 major team games- Football, Hockey, and Cricket.

I could not meet him at college, as he passed out before my admission at B.E. College. However, we both were from the same childhood township of Ranchi, known as Bhanu-da. So, I have some রাঁচিতুতো brotherhood connection with Bhanu-da. During his working career he shifted to UK, and also played English local league cricket for many years. He was a swing bowler. Later he became President of the sports club in his English Town. There he was known as Sandy Mukherjee, most probably because of his skin colour.

Then I would recall another senior Dada, J.S. Postwala, the handsome smiling Parsee boy. Probably from 1956-59 batch. He was seen to play all the games, but he specially excelled in Hockey. He was our ever-dependable goalkeeper. We lovingly used to call him এক পোস্তওয়ালা তাও জাল (ভেজাল)।

Nirmal Chandra Banerjee quotes:
My schooling began at Naihati Pathshala where I studied till class IV, and then went to Noihati Mahendra Uccho Bidyaloy, where I started playing football. We had less opportunity to play at school, compared to my local club. Then I took admission in BE College in 1958, and it was my Oval ground where I could spread my wings. I became football captain in my 3rd year, and that was the eventful day in 1961 when we brought the Ashutosh Mukherjee Shield at our campus.

We won the Ashutosh Mukherjee Memorial Shield, 1961-62 beating Bangabasi College in the final. Being the captain of our college football team, it was an unforgettable moment for me. I also received the Player of the Tournament award, Ashim Som Trophy. Today, now at the age of 85, I do vividly remember all my sporting days. Our tournament structure was divided into two groups of about 10 colleges in each group, and then the group winners clashed in the final.

We had friendly match against Mohan Bagan at Oval, when the legendary Saien Manna was playing against us. We lost the match, probably by a solitary goal. Though it was friendly match, to me personally an incident was no so well taken. Sailen Manna made a dangerous foul, kicking on my right thigh and I had to leave the ground. The wound was so much that even after 60 years, I am carrying that mark of boot-studs on my body. However, recognizing my excellent skill on the ground, for whatever time I was playing on the ground, Sailen Manna took me on his arms. The incident had a short coverage in the next day's newspaper.

But the surprise was still waiting for me. The very next day, recruiter from two Calcutta senior division clubs Aryans and Howrah Union came to my hostel, with a proposal that I should join their club and play in Calcutta soccer. Though the opportunity came from the blue and knocked my door, I could not grab, for the obvious socio-economic reason that I should be an Engineer, not a Sportsperson. Later days, I continued my love of football with my Noihati Sporting Club, even after my completion of studies.

I would bring the end of my words, recalling the two names of Prof. Bhupal Dutta and Prof. Anil Kumar Chowdhury (more popular with the ornamental name of Anarkoli). If we have done well, it is also because of their patronage.

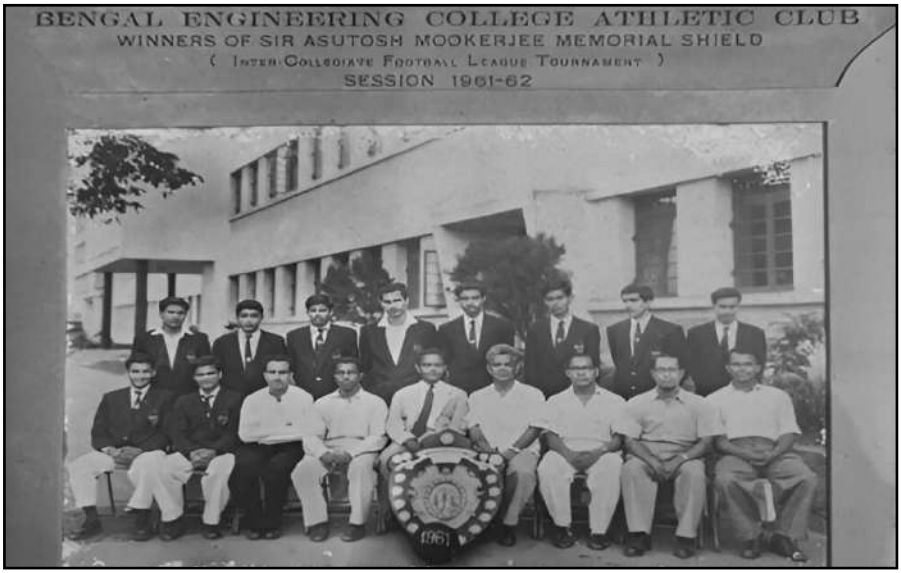

Sitting, from left: Ranjan Ghosh (General Secretary, popular with the name Micky), Nirmal Banerjee (Captain, football), A.K. Mukherjee (Physical Instructor), Prof. A.K. Chowdhury (Prof-in-Charge of football), Principal A.C. Roy, Shri A.W. Mahmood (our Proctor, and President, Athletic Club), Prof. Bhupal Dutta (Prof-in-Charge of Tennis), Sri S.N. Guha (Physical Instructor), Sri K.G. Bhattacharya (Physical Instructor).

Standing, from left: Pijush Gupta, Amit Ghosh, Samir Rudra, Kamalendu Ganguly, Samar Pal, Chandan Ghosh, Partha Ganguly, Bhola. Nandy.

The missing one is Bidyut Chatterjee, a half back, either 1961 or 1962 batch.

One of our regular players Amitabha Sen (Bhola) is missing in the photo. He was not fielded, though he was in the team.

Our team was:

Partha Ganguly, 1963 Civil, under the crossbar.

The defence citadel had Samir Rudra (1966), Ranjan Ghosh (Micky), and Chandan Ghosh.

The mid-field was well orchestrated by Bidyut Chatterjee, Samar Pal (1963) who was also the topper in our Mechanical and stood 3rd in I. Sc in the University before joining our B.E. College. And the strong attacking squad had Kamalendu Ganguli (1963) in the right wing, myself Nirmal Banerjee (1963) in right inside forward, Amit Ghosh (1964) the centre forward, Pijush Gupta as left inside forward, and left wing Bhola Nandy.

Our Partha Ganguly, the goalkeeper says:
I had a wonderful chat full of reminiscence with Nirmalda. He was delighted to get together albeit on the phone. We talked about our two wins in the Inter College tournaments. He told me about an incident in the friendly game against Mohan Bagan where the great Mannada was playing in midfield - and in return I told him about an incident in the Semi Final match in 1961 when we were down 3-0 in the first half and then went on to score 4 consecutive goals in the second half - to get thru to the finals. I will narrate both these incidents on a later date. Just wanted to specially thank Debabrata and Jayanta for re- establishing this contact. Much obliged. Just a brief comment - my humble opinion for what it is worth: I firmly believe that the two footballers from our team who were outstanding speedy dribblers with full control were Nirmal Bannerji and Amitava (Bhola) Sen. Time and again these two teammates of mine have out played many defenders that we have faced - and remember this: lot of the teams we beat had first division players playing for them. Cudos where it is due even after 60 years!

In one of the tournaments, we won against The Calcutta Technical School, SN Banerjee Road in the final at the Maidan. We had a serious feast fight between students of the 2 institutions after the match. They had a East Bengal regular as their captain, and so thought they would not lose.

Bhola (Amitava Sen) writes to Arun Hazra ('63, Civil):
How nice to hear from you after so many years. Yes, what a lovely time

we all had. We miss those days very badly. Of course, we were eating at Aminia when the words started coming that the Polytechnic boys were waiting for us outside Aminia. We hurriedly finished eating and headed outside behind Micky-da and Biswapati-da (most probably, Biswapati Bhattacharya). Micky-da started a dialogue with them but Biswapati-da who was a strongman (he used to do head stands on the railing of our hostel veranda) as well as a head-strong muscled man started the fight by hitting one of the Polytechnic boys (perhaps their leader). No sooner had he hit the boy, chaos started all over the street. The shopkeepers on both sides of the very busy street (forgetting the name) started pulling the shutters down and to close their shops. What a scary but interesting scene it was. I had never witnessed such a scene either before or after that incident. I heard Micky-da shouting "Pala, Pala". As soon as I heard that, I started running and got into a bus going to Gol Park. I felt bad that I did not know nor had the courage to find out who else were where. Late in the evening, l called Micky-da and came to know that everybody was safe.

What an experience!!! Thanks for reminding me of this memorable experience. Such things do not happen anymore. What a pity!!!

Salil Bhattacharya ('63 Electrical) writes:
Dear Bhola, I also did not know of you becoming University Blue. I suppose it was in Hockey.

Recapitulating about old days. Were you present during the fight between BEC and Jadavpur Polytechnic in front of Aminia Restaurant? It happened after we lost to JP. As a supporter I was there. Biswapati (surname not known), a Senior BEC supporter and Mickey, our captain were heroes of the evening assisted by supporters like me. Fortunately, we all had left the spot before the police arrived. Good old days!!

Ashok Basak of Tele-comm stream. He was our university's hurdle champion. Also, an excellent Basketball and volleyball player. After graduation, he became a Sadhu (Ashokananda Swamy) and set up his own ashram near Kharagpur.

We had the B.E. College tennis team of Inderjit Singh ('62 Electrical), Sourin Majumdar ('63 Civil) and Bhaskar Sarkar ('63, Civil). While Sourin represented the Calcutta University Tennis Team, The Inderjit-Bhaskar pair represented and made Calcutta University all India University tennis champion, (however today, I am not sure it was 1961 or 1962). All the 3 players were invited to play in the Asian Lawn Tennis Championship that was usually held at the Calcutta South Club. Sourin and Bhaskar are our batchmates. Sourin (Civil) now settled in Chicago, came to India before Covid era and a few of us had a family dinner at his Kolkata apartment. Retired Col. Bhaskar Sarkar ('63, Civil) is settled at Alwar Rajasthan.

We are the witness of many interesting exhibition matches in the campus used to be between the 2 Indian Davis Cup players - Premjit Lal and Jaideep Mukherjee. It also resulted in a courtship between Premjit and our Principal's daughter then. They got married later on, and the couple also won the "All India Wills Made for Each Other" title.

We wish to mention another name, a hero from our swimming pool. He was Sukdeb Mukherjee (1964 Architecture), the Calcutta University Blue in swimming, and Captain of the All India University Team when combined Afganistan University Waterpolo team came to India for friendly matches. Another interesting fact, during the educational tour of Architecture department in South India he took a challenge and swim crossed the flowing Tungabhadra river.

Very few teachers were ACTIVE participants with students in games. The games watcher's actual name we did not know. He was known as gechhi gechhi. Once he was demonstrating Javeline throw, and his right shoulder got locked. He threw away the jawline on the ground, sat down and started crying: gechhi-re gechhi, gechhi-re gechhi and thus earned hid nick name.

Contributors of the article:

Jayanta Majumdar, Metallurgy
Nirmal Chandra Banerjee, Metallurgy
Partha Ganguly, Civil
Amitava Sen (Bhola)

বিই কলেজের প্রেম এডভেঞ্চার, '৬০ এর দশকে

©জয়ন্ত মজুমদার, ১৯৬৩ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

সময়কাল – ১৯৬২ সাল

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসে অঞ্জন হস্টেলে বেশ আনন্দেই ছিল, আর যেদিন অবসররাপ্ত মেজর জেনারেল ডক্টর মুখার্জীর অপরূপা নাতনীকে সে দেখেছে সেদিন থেকেই তাঁর চিত্তবৈকল্যর আভাস দেখা দিল। মেজর জেনারেল রিটায়ার করে কলকাতায় জমি কিনে নিজের বাংলো বানিয়ে মৌজ করে আছেন। সন্ধ্যার দিকে খানিক সময় ক্লাবে গিয়ে বসেন। ঘরে অপরূপা কন্যা, মানে নাতনি, এবং এই কন্যার রূপেই অঞ্জন মুগ্ধ। একদিন স্কুল ছুটির পর কন্যা যখন ঘরে ফেরে তখন অঞ্জন হঠাৎই সেই কন্যাকে রাস্তায় দেখতে পায়, তারপর কিছুদিন ফলো করে। রোজই ভাবে একবার ডেকে ভাব করে, দুটি কথা বলে, কিন্তু সাহসের অভাবে আর কীভাবে শুরু করি আর কী কথাই বা বলবো, এইসব সমস্যায় কিছুই আর এগোয় না। কন্যাও খেয়াল করেছে যে একজন তাঁকে ফলো করে, কিন্তু ছেলেটি রাস্তা আটকে কথা বলে না, ব্যবহারেও বাজে মন্তব্য বা অশোভন কিছু সে পায় না। সুতরাং ছেলেটির নামে কিছু অভিযোগও করা যায় না।

তাহলে উপায়? কন্যার বাড়ির নেমপ্লেটে মেজর জেনারেল মুখার্জীর নাম দেখে অঞ্জন টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে ফোন নম্বর নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় ফোন করলে অন্য প্রান্তের এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, "হ্যালো, কে বলছেন?"

অঞ্জন চুপ। টেলিফোনের প্রশ্নে যে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন সেই ভাবনাটাই আগে আসেনি।

"হ্যালো, কাকে চাই?"

এটি দ্বিতীয় সমস্যা। কন্যার নামটাও অঞ্জন জানে না। অনেক বুদ্ধি আর সাহস একত্র করে জানালো, "ম্যাডাম আছে?"

"ম্যাডাম সাবিত্রী বাথরুমে, পরে ফোন করবেন। আপনার নাম?"

অঞ্জন ফোন ছেড়ে দিল। যাক, কন্যার নাম অন্তত জানা গেছে, সাবিত্রী। এবং যিনি ফোন ধরেছিলেন, সম্ভবত বাড়ির পরিচারিকা।

সেই রাতেই অঞ্জন কিছু গানের লাইন মিলিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমপত্র লিখল। মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে, প্রেম শুধু এক মোমবাতি, যদি কাগজে লেখ নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে, আমার পূজার ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে, না মন লাগে

না, জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই চিঠি পেয়ে সাবিত্রী কিছুই বোঝে না। প্রেরকের নাম লেখা অঞ্জন দাসানুদাস। সাবিত্রী চিঠিখানি মেজর জেনারেলের হাতে তুলে দিল।

চিঠি পড়েই ডক্টর মুখার্জীর মনে হলো কেউ তাঁর নাতনীর উদ্দেশ্যেই এই চিঠি দিয়েছে। নাতনীকে জেরা করতেই সেও স্বীকার করল যে একটি ছেলে প্রায়ই তাঁকে স্কুলের পরে রাস্তায় ফলো করে। কিন্তু ছেলেটি রাস্তায় কথা বলা, বা বাজে মন্তব্য, অশোভন কিছু সে করে না। সুতরাং ছেলেটির নামে কিছু অভিযোগও সে করতে পারছে না। মেজর জেনারেল নিজের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে দিলেন, পরদিন বিকেলেই ওনার ড্রাইভার চিঠিখানি সাথে নিয়ে অঞ্জনের হস্টেলে এসে জানাল, জেনারেল সাহেব কাল সন্ধ্যা ছ'টায় আপনাকে ক্লাবে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

সেইদিনই সন্ধ্যায় অঞ্জন মোটামুটি নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত যে দিন কয়েকের মধ্যেই সে কলেজ ছেড়ে বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু হস্টেলে আছে মিহির, দ্যা মাস্টারমাইন্ড অফ অল সফট ক্রাইমস। "আরে কলেজ ছেড়ে যাবো বললেই হল? আমরা আছি কী করতে? একটা উপায় বার করতে হবে।"

কিন্তু ব্যাটা তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সে আবার মিলিটারি জেনারেল।

আরে রাখ তোর মিলিটারি জেনারেল। আমি মিহির, আমি জেমস বন্ড, আই এম বন্ড, মাই নেম ইজ মিহির জেমস বন্ড।

কিন্তু অঞ্জন আগাম জানিয়ে দিল, আগামীকাল ক্লাবে সে কিছুতেই যাবে না।

ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। এখানেই তাঁদের সম্মান। অঞ্জনের সমস্যাও একটা প্রজেক্ট, তারও সমাধান তো করতে হবে।

"ঠিক আছে অঞ্জন, তুই না গেলে আমিই একা গিয়ে দেখা করে আসব। দেখি জেমস বন্ডের সাথে মিলিটারি জেনারেল কিভাবে টক্কর দেয়?"

তুই যাবি? তায় একা?

তবে কি বাহিনী নিয়ে যাবো? কোনোদিন কি দেখেছিস যে জেমস বন্ড বিশাল বাহিনী নিয়ে ভিলেনের ডেরায় ঢুকেছে? জেমস বন্ড যাবে, একলাই যাবে। বন্ডের আগামী সিনেমা হবে Encounter With A Military Man.

মিহির যতই বলে একা যাবে, পরিশেষে হস্টেলের টিম মিটিং এ সিদ্ধান্ত হল, না একা নয়। আরও অন্তত দুজন যাবে – সোমদেব আর আমি।

কিন্তু কীভাবে যাবো? গিয়ে কী বলব?

"দ্যাটস মাই প্রবলেম। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ফলো মি, আই এম জেমস বন্ড।"

অঞ্জন জানিয়ে দিল, "আমি কিন্তু এসবের মধ্যে নেই।"

পরদিন বিকেল ঠিক ছটার সময় তিনজনেই ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত। ক্লাবের গেটে ভিজিটর'স খাতায় নিজেদের নাম লিখে ভেতরে ঢুকেই মিহিরের উচ্ছ্বাস,

"আরিব্বাস, কী ক্লাব রে মাইরি!!"

চুপ, আস্তে মিহির, আস্তে। লোকে শুনতে পাবে।

মেজর জেনারেল তাঁদেরকে ডেকে বসতে বললেন। কল্পনায় মিলিটারি জেনারেলকে এঁদের যতটা ভয়ংকর মনে হয়েছিল, সামনা সামনি ততটা মনে হল না। হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে উনি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করলেন, "Who is Anjan?"

এক মুহূর্তে মিহির দাঁড়িয়ে উঠে, "স্যার, আমিই অঞ্জন, আমার বাবার নাম নিরঞ্জন দাস, আমি প্রতিবার পরীক্ষায় ক্লাসে থার্ড হই। আর বক্সিংএও চ্যাম্পিয়ন। এই যে সোমদেব, প্রতিবার সেকেন্ড হয়। আর (আমাকে দেখিয়ে) এ ফার্স্ট হয়।"

সোমদেব আর আমি হতভম্ব! মিহির এসব কী যা তা বলছে? সেই মুহূর্তে যে তাঁরা প্রতিবাদ করবে তারও উপায় নেই, কেস আরও জটিল হয়ে যাবে।

মিহির আরও জুড়ে দিল, "স্যার, ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে আমি আর্মি সার্ভিসে যেতে চাই। আর এই দুজন বলেছে হায়ার স্টাডিজ করবে।"

সোমদেব আর আমি আরও অপ্রস্তুত, বুঝতেই পারছি না মিহির কোথায় গিয়ে থামবে।

ডক্টর সামান্য হেসে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "How do you know Sabitri?'

এবারেও মিহিরের সপ্রতিভ উত্তর, "স্যার, স্কুলের পরে দেখেছি, কিন্তু স্যার কাছে গিয়ে কথা বলার সাহস হয় নি।"

সাহস হয় নি? I don't believe it. I have seen engineers in military services, and they are smart, they are bold. I am surprised that you are our future engineer but feel shy to talk!! What nonsense?

বহু যুদ্ধের জয়ী নায়ক মিহির জেমস বন্ডের মুখে এবার আর কথা নেই।

Young boy. Good to know that you want to join army services, but during my days in military, I have never seen any army engineer following a school going girl on the roads. You are the first such example for me.

এবারেও বহু যুদ্ধের নায়ক জেমস বন্ডের মুখে কথা নেই।

So, Anjan, you have to stop chasing my girl on the street. I have seen young boys, some of them were engineers, visiting our home. I don't mind if you visit my home. Rather, I am inviting you for dinner at my place, so you may come on this Sunday.

মিহির, সোমদেব আর আমি একে অন্যের দিকে তাকাই।

So, you may leave now, and Anjan, you may join our dinner

on this Sunday. And, mind it, no more chasing a school going girl on the street.

তিনজনে বাইরে এসে যেন শরীরে প্রাণ ফিরে পেলাম। মিহিরের ভাট বকায় সোমদেব আর আমি আতঙ্কে কাঁপছিলাম! কিন্তু এবার সমস্যা, মিহিরকে তো এবার অঞ্জনের ভূমিকায় নামতে হবে। অঞ্জন সেজে মেজর জেনারেলের বাড়িতে ডিনার খেতেও যেতে হবে।

কীরকম দিলাম দ্যাখ, মিলিটারি জেনারেলকে একেবারে ঘোল খাইয়ে দিলাম।

হস্টেলে ফিরে মিহির জনে জনে নিজের কীর্তি প্রচার করার ফাঁকে ফাঁকে "যাহা ঘটে নাই সেগুলিও সগৌরবে সবিস্তারে বর্ণনা করিল"। আর অঞ্জন, মানে "দাসানুদাস" জানিয়ে দিল যে এইসবের মধ্যে সে থাকবেই না।

মেজর জেনারেল বাড়ি ফিরে নাতনীকে সব জানাতেই সে তো ভয়ই পেয়ে গেল। নাতনীর এখন অন্য চিন্তা। "দাদু, তুমি যে ছেলেটির ডেসক্রিপশন দিলে, আর যে আমাকে রাস্তায় ফলো করে, দুজনের ডেসক্রিপশন তো একেবারেই মিলছে না। আমাকে যে ফলো করে, সে ছোট হাল্কা পল্কা চেহারা, আর তুমি যার কথা বলছ যে লম্বা, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা।"

এবার মিলিটারি জেনারেলও চিন্তিত।

দাদু, আমার মনে হয় এই অঞ্জন ছেলেটা নিজে ভয় পেয়েছে, আর এবার তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছে। তাও একজন নয়, তিনজনের দল। সেই গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটি নিশ্চয়ই ভাড়াটে গুণ্ডা।

ডক্টর ভাবলেন হতেও পারে। ছেলেটি নিজেই তো বলেছে বক্সিং চ্যাম্পিয়ন।

পরদিন সকালে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর রায় অঞ্জন, সোমদেব আর আমাকে নিজের অফিসে তলব করলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে কলেজে আসার আগে আমাদের ধারণা ছিল যে বিশ্বের ভয়ংকরতম প্রাণী যথা বাঘ সিংহ। কলেজে আসার পর ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, এখন আমরা জানি যে প্রফেসর রয় হলেন পৃথিবীর সবথেকে ভয়ংকর।

So, Anjan, you met Major General yesterday at his club, right?

অঞ্জন প্রায় কাঁদো কাঁদো, "না স্যার, আমি যাইনি, মিহির আমার নাম করে গিয়েছিল।"

My God, it's too interesting. Someone is giving your proxy? So, then call your Mihir.

মিহির এলে প্রিন্সিপাল রয় জানতে চাইলেন, "What makes you to act as Anjan? And so far I know that you are a backbencher in the class, not the third boy in exams. Nor you are a boxing champion."

মিহির স্মার্ট। "স্যার, এটা আমাদের কলেজের আর ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির সম্মানের প্রশ্ন। অঞ্জন ভয় পেয়ে আর দেখা করতে যায় নি। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি যে সিচুয়েশন বুঝে আমরা কলেজের আর কমিউনিটির প্রেস্টিজ রক্ষা করতে পারি।"

মিহির সুযোগ বুঝে ইংরেজিতেও বুঝিয়ে দিল, "Sir, he is an army man, and it would have been cowardice not to go and meet him. We had to prove that engineers have courage in tackling any challenging situation, even with army officers."

প্রফেসর রয় এবার অঞ্জনের কাছে জানতে চাইলেন, "Do you know how old is Sabitri?"

অঞ্জন কী উত্তর দেবে? স্কুল থেকে ফেরার সময় সে দেখেছে মাত্র, জানেই না মেয়েটির বয়স কত।

প্রফেসর রয় ধমক দিলেন, "Don't keep mum, answer to my question."

অঞ্জন আন্দাজে জানাল, স্যার এই পনেরো বা ষোলো হবে।

No, not at all. Her age, I mean Sabitri's age is now thirty-five, that's almost double of your age.

কোথায় যে কী ঘটছে বোঝা মুস্কিল। সাবিত্রী পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে স্কার্ট পড়ে স্কুলে যায়? দেখে তো পনেরো ষোলো মনে হয়।

Listen boys. You chased a minor girl in broad daylight on the main road, I mean a নাবালিকা মেয়ে। It's a crime and Major General has the option to report it to the police. Second, might be unknowingly but you have sent a love letter to a married women who happens to be Major General's daughter in law, I mean পুত্রবধু, her name is Sabitri, and she is the mother of that minor girl. So, here also you can be under a police case. Now, if Major General goes to the police, you can be sure of jail, and also a non collegiate from here.

এবার অঞ্জন কেঁদেই ফেলল।

প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর রয় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই বললেন, "Hang on, hang on. I don't like any engineer crying in front of me. The old doctor telephoned me so that I take action against you four boys. I assured him that I would take care of my boys, but he should also take care that with a young and pretty granddaughter at home,

the boys will naturally hang around his home and that's his own problem."

এবার আমরা চারজন কী যে বলব ভেবেই পাই না। স্যার কি তাহলে আমাদের সাপোর্ট করলেন? স্যার আবার বললেন, "What you four are doing on Sundays is not my business; but the girl you are chasing on roads is a minor, and your Sabitri is Doctor's daughter in law, I am told. So, you Anjan, better step out of your limit else it would be two different police cases and then the College will also kick you out."

কী আনন্দ, স্যার বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কেস ডিসমিসড।

উঠে আসার আগে স্যার বললেন, "I have something more to say. In my teaching life, I have seen many students with soft criminal attitudes. But I have also seen that all of them did well in their future life. So, if I get a chance to meet all of you after twenty or thirty years, I wish I should find all of you shining amongst others, because you all have the attitude and potential."

স্যার ঠিকই বলেছিলেন।

মিহির পরে ইংল্যান্ড থেকে ডক্টরেট, আর মিসাইল এক্সপার্ট হয়ে রিটায়ার করে। অঞ্জন D. Sc. করে MIT থেকে, তারপর ফাইবার অপটিক্স-এ রিসার্চ করে, এখন তাঁর নামে বেশ কিছু পেটেন্ট আছে। সোমদেব armament production এ ভালো কাজ করেছে, আর আমি হলাম এই গল্পকার।

আম্ফান জয়ী গ্রামীণ স্থাপত্য : বারুইপুরের বাঁশের বাড়ি

©অরুনাভ সান্যাল, ২০১৮ স্থাপত্য বিভাগ

দক্ষিণবঙ্গে বাড়ি বানাচ্ছে এক বাঙালি-সুইডিশ দম্পতি, বাড়ির স্থপতি একজন ফ্রেঞ্চ যিনি কলকাতায় থাকেন, বাড়ির মিস্ত্রি বাঙালি আর গুজরাটি এবং ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছে দুই বাঙালি আর পাঞ্জাবী ছোকরা। মানে যাকে বলে একদম Multiculturalism'এর হদ্দমুদ্দ! এরকমই এক প্রজেক্টে মাসখানেকের জন্য কাজের সুযোগ হয়েছিল ২০১৭ সালে।

তখন শিবপুরে আর্কিটেকচার নিয়ে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি। ইন্টার্নশিপ করছি লরেন্ট ফরনিয়ারের কাছে। ফরাসী ভদ্রলোক ছাত্রাবস্থায় পিএইচডি করবেন বলে সুন্দরবনে এসে, বাংলার প্রেমে পড়ে পাকাপাকি ভাবে এখানেই থেকে গেছেন। একটু শক্ত ধাতের আদর্শবাদী মানুষ।

একদিন বললেন, তোমায় এবার বারুইপুরের সাইটে যেতে হবে বুঝলে। বাধ্য ছেলের মত একদিকে ঘাড় নাড়লাম। সেই মত সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম বারুইপুর স্টেশন। অটোর সামনে বসে পাক্কা পনেরো বিশ মিনিট বাদুড় ঝোলার পর সাইটের পৌঁছে তো আমি থ! বাড়ির ছাদে এক প্রকাণ্ড বাঁশের কাঠামো তৈরি হচ্ছে। কলকাতার সেরা কয়েকজন দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের মিস্ত্রিদের নিয়ে আমার বস ছাদে উঠে বসে আছেন। বাঁশের মাচা বেঁয়ে কোনমতে প্রাণ হাতে করে তিনতলার ছাদে উঠলাম।

আসলে গোটা ছাদটা জুড়েই তৈরি হবে এক প্রকাণ্ড খড়ের চারচালা। এ কিন্ত আবার যেমন তেমন খড়ের ছাদ নয়। আজকাল গ্রাম বাংলায় তৈরি খড়ের চাল বর্ষাকাল গেলে প্রায় প্রতি এক-দু বছরে অন্তর বদলে দিতে হয়। তাই সমস্যা আসে বারবার। কিন্ত এক্ষেত্রে এমন ভাবে সেই খড়ের চাল তৈরি হবে যা টিকে থাকবে বছরের পর বছর। এছাড়াও যাতে সহজে আগুন না ধরে যায় কোনভাবে তাই থাকবে উপযুক্ত আগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। আর সবশেষে লাগানো হবে সোলার প্যানেল। বাড়ির মালিক হলেন এক সুইডিশ রিসার্চার। আর মালকিন বাঙালী মেয়ে। যদুবংশীয় (JU)।

তা এ হেন পরিবেশবান্ধব বাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজন দক্ষ মিস্ত্রির। বাঁশের কাজ করছে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বাঁধে এমন কয়েকজন। খড়ের ছাদ বানাতে সেই গুজরাট থেকে এসেছে কয়েকজন মিস্ত্রি (সংস্থার নাম Matha Chaaj)। তাঁরা

আবার বাংলার মিস্ত্রিদের হাতে কলমে কাজ শেখাচ্ছেন যাতে পরের প্রজেক্টে তারা নিজেরাই করে নিতে পারে!

এখানেই শেষ নয়! গোটা বাড়ির বেশির ভাগ ভেতরের দেওয়াল তৈরি হচ্ছে মাটি দিয়ে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে প্রাথমিক কাঠামোটা তৈরির পর তাতে বিশেষ ভাবে মাটি ভরে দেওয়া হবে। কোথাও কোথাও আবার বাইরের দেওয়ালগুলোতে ফাঁক ফাঁক ইট গুলোকে সাজিয়ে তার মধ্যেই ভরে দেওয়া হচ্ছে বিয়ারের রঙিন বোতল।

আর সবথেকে আশ্চর্য হল, বাড়ির কেবলমাত্র মূল ফ্রেমটাই কনক্রিটের। বাকি ঘরের উপর সব ছাদে (roof slab) একটাও স্টিলের শিক নেই। বরং সমস্ত ছাদগুলো আসলে ইটের তৈরি এক একটা চাপা গম্বুজ। রীতিমত ইঞ্জিনিয়ারিং এর

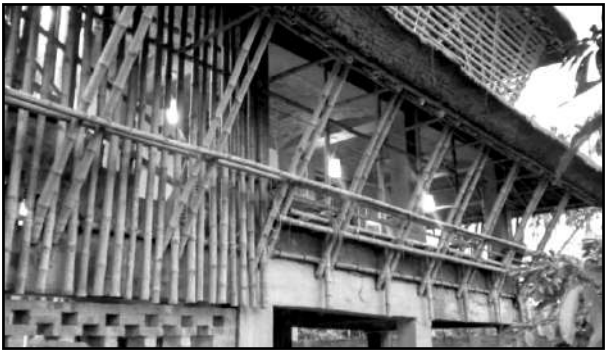

কেরামতি! আর ভদ্রলোক কিন্তু স্থপতি হয়েও এই সব জটিল স্ট্রাকচারের সমস্ত হিসেব নিকেশ নিজেই করতেন, কোন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য ছাড়াই। আর সবথেকে আশ্চর্য ব্যাপারটা কি জানেন? ফরনিয়ার স্যার একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, এই গোটা বাড়িটা প্রথাগত পদ্ধতি মেনে নির্মাণ করলে যে খরচ হত, এক্ষেত্রে প্রতি স্কোয়ার ফিটে খরচ হয়েছে তার থেকে খানিকটা কম।

যাইহোক, আমার কাজ ছিল সাইটের দেখাশোনা করা। ভোর ভোর কোন্নগর থেকে ঢুলতে ঢুলতে পৌঁছাতাম বারুইপুর। মিস্ত্রি কাকারা নিজের মত কাজ করছেন। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম সব ড্রয়িং অনুযায়ী চলছে কিনা। খড়ের কাজটা তেমন কঠিন না হলেও বিশেষ ধরণের টায়ার দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুব ঘন করে খড়ের আঁটি বাধার কাজটা ছিল বেশ শ্রমসাধ্য। কঠিন ছিল বরং ঐ ছাদের জন্য চাপা গম্বুজগুলোর (Shallow Masonry Dome) নির্মাণ করা। কল্যানীর দুই দাদা ভাই ছিল যারা খুব যত্ন নিয়ে এক একটা ইট গেঁথে গেঁথে ঐ ছাদগুলো তৈরি করত। যেমন তাদের হাতের কাজ, তেমনই তাদের চোখের মাপ। এই দুজন

আবার চুন সুরকির কাজও অল্প বিস্তর জানতেন। স্যারই শিখিয়েছিলেন অবশ্য। এই দুজনের দৈনিক মজুরি বাকিদের থেকে অনেকটাই বেশি। অলস দুপুরগুলোতে গল্প করতে করতে সবার সাথে দিব্বি আলাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। এদের সাথেই একমাস বাদে গিয়েছিলাম উড়িষ্যার সেই পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা প্রজেক্টে কাজ করতে।

সাইটে মাঝে মধ্যে জপনীতও আসত। পাঞ্জাবী ছেলে। আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র। ভীষণ শান্ত, ভদ্র আর লাজুক ধরণের মানুষ কিন্ত কাজের বেলায় ভীষণ সিরিয়াস। মিস্ত্রি কাকাদের সাথে যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে আমি দুপুরবেলা খাটিয়ায় বসে ঘণ্টা খানেক ল্যাদ খেতাম। জপনীত কিন্ত ঐ ফাঁকা সময়টাতেও গেট পরীক্ষার পড়াশুনো চালিয়ে যেত।

গোটা প্রজেক্টটায় সব থেকে বেশি ঘোল খেয়েছিলাম বাঁকানো ইটের সিঁড়িটা বানানোর সময়। গোটা সিঁড়িটায় একটাও Reinforcement বা স্টিলের রডের ব্যবহার হয়নি। তিনটে ইন্টারকানেক্টেড ইটের তৈরি আর্চের উপর গোটা সিঁড়িটা দাঁড়িয়েছিল। তা সে, যতবারই ড্রয়িং দেখে বানানো শুরু হয় স্যার এসে বলেন যে ভুল হয়েছে। আমি আর পাঞ্জাবী ছোকরা দুজনেই মাথা চুলকে দুজন দুজনের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করি কেবল। শেষে একদিন স্যার নিজেই গোটা দিনটা সাইটে থেকে সিঁড়িটা বানালেন।

এভাবেই দিন কাটছিল। একদিন কাজ শেষে মিস্ত্রি দাদাদের সাথে গল্প করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ জমেছিল বেশ। কয়েক পশলা বৃষ্টির পর ঝুপ করেই সন্ধ্যেটা নেমে গেল। আমি সাইট থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তাটা ধরে মেন রোডের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম অন্ধকারের মধ্যে। হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমার পায়ের ডানদিক কিছুতে একটা ঘষা খেল। জিনিসটা চলমান। খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে আমি মোবাইলের টর্চ খানা জ্বালতেই, বাবা গো বলে তিন হাত লাফ মারলাম। অন্তত চার হাত লম্বা মোটা সোটা একটা কুমিরের মত জিনিসের পেটের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ। কিছুই না আসলে। প্রমাণ সাইজের একটা গোসাপ। বৃষ্টির পর ভদ্রলোক চড়তে বেরিয়েছেন সন্ধ্যায়। আমি আলো জ্বালতে একটু বিরক্ত হয়েই থপ থপ করে পাশের জলাটায় নেমে গেলেন। তারপর থেকে অবশ্য আরো বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল ভদ্রলোকের সাথে। কাউকে একটা পাত্তা দিতেন না বিশেষ। সে যাই হোক, আমি আমার মত কাঁচা রাস্তাটা বেয়ে হালদার মোড় অব্দি হেঁটে গিয়ে আটো ধরতাম স্টেশনের। তারপর ট্রেনে বাসে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত নটা বেজে যেত। পরের দিন আবার সেই ভোরে উঠে যাত্রা শুরু। মাস খানেক এভাবে চলার পর একদিন হঠাৎ করেই স্যার বললেন যে, এবার সপ্তাহ দুয়েকের জন্য উড়িষ্যা যেতে হবে বুঝলে। বললাম বেশ। তারপর

২০১৭'র আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে দক্ষিণ উড়িষ্যাগামী ট্রেনে চেপে বসলাম পাহাড় জঙ্গল ঘেরা মুনিগুদার উদ্দেশে।

সেই আমার শেষ বারুইপুর যাওয়া। তারপর দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এলাম।

জপনীত এখন এক আইটি ফার্মে কাজ করে। আমি এমবিএ শেষ করে কদিন বাদে আমুলে জয়েন করব। আর্কিটেকচার প্রফেশনে আমরা কেউই আর থাকলাম না। এভাবেই সবাই নিজের নিজের মত জীবনের রাস্তা বেছে নেয় একদিন। শুধু স্মৃতিগুলো রয়ে যায়। বাড়িটা শেষ হবার পর কেমন দেখতে হয়েছিল সে আর দেখা হয়নি। সামান্য দুদিন আগেই স্যার ছবিগুলো পাঠালেন। কিছু ছবি অবশ্য বাড়ির মালিক লিনাসের ব্লগ থেকেও নেওয়া। রুপসা'দির অনুমতি নিয়ে ছবিগুলো ব্যবহার করলাম এখানে। তাই স্থপতি Laurent Fournier ছাড়াও এই বাড়িতে যারা বসবাস করেন সেই, Linus Kendall এবং Rupsha Nath'কে ধন্যবাদ জানানো আমার অবশ্যই কর্তব্য।

বি.দ্র. – বাড়িটা বারুইপুরের হালদার মোড়ের কাছেই অবস্থিত। বারুইপুর স্টেশন থেকে হালদার মোড় অব্দি আটো পাওয়া যায়। তবে যেহেতু এই বাড়িতে একটা পরিবার নিরিবিলিতে বসবাস করেন, তাই সময়ে অসময়ে গিয়ে বিরক্ত না করাই ভালো। ঐ দিকে গেলেও বাইরে থেকে দেখে চলে আসবেন। এই বাড়ির কথা হালদার মোড়ে নেমে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।

এক সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব গুহ

©দেবাশীষ তেওয়ারি, ১৯৬৯ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

বুদ্ধদেব গুহর দু'একটা বই ছাড়া ওনার লেখা বিশেষ পড়িনি। কিন্তু এক সন্ধ্যেয় তাঁর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্রে কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল বছর ২০ আগে। সেই ঘটনা নিয়েই এই প্রতিবেদন।

সেটা খুব সম্ভব ২০০৫ সাল হবে। আমার স্ত্রী স্বাতী তখন রোটারী ক্লাবের মেম্বার। ওদের ক্লাবের ইনস্টলেশান মিটিং, স্বাতী আগেই চলে গেছে, আমায় বলে গেছে সাড়ে সাতটার মধ্যে যেন অবশ্যই চলে যাই, কেন না বুদ্ধদেব গুহ চীফ গেস্ট হয়ে আসছেন।

আমি শুনেছিলাম বুদ্ধদেব গুহ একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট, ঋতু গুহ'র হাসব্যান্ড আবার নিজেও গায়ক, একসময় শিকার করতেন, আবার বইও লেখেন। অনেককাল আগে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক 'মাধুকরী' আমার বেশ ভাল লেগেছিল। আর রাজ্য সরকারের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক, ব্যাস, ঐ পর্যন্তই, এর বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আমার জানা ছিল না। এই জ্ঞান নিয়েই আমি চললাম বুদ্ধদেব গুহকে দেখতে এবং সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে।

অনুষ্ঠান হলে পৌঁছে দেখি বুদ্ধবাবু আগেই চলে এসেছেন। ঠিক সাড়ে সাতটায় প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু, তারপরে স্বাতীর কয়েকটা গান এবং তারপরে মিটিং। আমি বুদ্ধবাবুর পাশেই বসে ছিলাম। স্বাতীর গানের সময় তিনি খুব মাথা নেড়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন দেখে এক সদস্য এসে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে স্বাতীর পরিচয় দিল। গানের শেষে তিনি স্বাতীকে ডেকে বললেন, খুব ভাল গান হয়েছে আপনার। স্বাতী বলল, "আপনার গান শুনবো বলেই আমরা কিন্তু সবাই উদগ্রীব হয়ে আছি।" তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "না না, আমি এখানে চীফ গেস্ট হয়ে এসেছি, বক্তৃতা অবশ্যই দেব, তবে কোন গানটান নয়।"

চীফ গেস্টের বক্তব্যে রোটারীয়ানদের কি ধরণের সেবামূলক কাজ করা উচিত সে তিনি সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন। জানালেন সে রকম কোন স্কীম দিতে পারলে তিনি চীফ মিনিস্টারকে বলে স্টেটের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাও করে দিতে পারেন। চীফ মিনিস্টার তখন আরেক বুদ্ধবাবু এবং তাঁর সঙ্গে এঁনার সম্পর্ক খুবই ভাল।

মিটিংয়ের পরে সোশ্যালাইজিং, মানে সদস্যরা নিজেদের, তাঁদের পরিবারের ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন এবং তারপরে ডিনার। যদিও তাঁর

থাকার ব্যবস্থা সার্কিট হাউসে, বুদ্ধবাবু মনে হয় আগেই বলে রেখেছিলেন, তাই এই হোটেলেও ওনার নামে একটি রুম বুক করা ছিল। আমি সেই রুমে এলাম। সেখানে মাত্র তিনজন, বুদ্ধবাবু, আমাদের জেলাশাসক আর আমি। নবীন এক সদস্যের ওপর দায়িত্ব পড়েছে আমাদের দেখাশোনা করার। সে আমায় বলল, "দাদা, সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আপনি একটু ম্যানেজ করে নিন। বুঝতেই তো পারছেন, আমি ওখানে বসতে পারব না, আমি অন্য মেম্বারদের সঙ্গেই বসছি, সেরকম দরকার পড়লে আমায় ফোন করবেন। এমনিতেও কেউ এখানে আপনাদের বিরক্ত করতে আসবে না আমি ছাড়া। আর কোন স্ন্যাক্সের দরকার হলে বেল বাজালেই এ্যাটেন্ডান্ট আসবে।"

আমরা রুমে এসে বসলাম। দক্ষিণে বিশাল কাঁচের জানালা, কাছে একটা স্কোয়ার সেন্টার টেবিল, তিনদিকে তিনটে সিঙ্গল সোফা, কয়েকটা আর্মলেস চেয়ার। টেবিলে একটা এক লিটারের জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল, তিনটে গ্লাস, মিনারাল ওয়াটার, সোডা আর বিভিন্ন স্ন্যাক্স, কাবাব ইত্যাদি। জমিয়ে বসা হল, বুদ্ধবাবু মাঝের সোফায়, জানালার দিকে মুখ করে, আমরা দুজন দুদিকে। বুদ্ধবাবু বসেই বললেন জানালার কাঁচটা খুলে দিতে।

ডি এম সাহেব ক্ষীণ আপত্তির চেষ্টা করলেন, "গরম লাগবে না?"

"না, এসি তো অন থাকবে। আমি প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে ভালবাসি, যদি অবশ্য উপায় থাকে। কেন? প্রকৃতিকে আপনাদের ভাল লাগে না?"

"হাঁ হাঁ, ভাল লাগে বইকি। এসি অন থাকলে তো আর প্রব্লেম নেই," ডি এম সাহেব ম্যানেজ করলেন। আর আমি বোতল খুললাম হুইস্কি ঢালব বলে। বুদ্ধবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "লার্জ?"

"না।"

কী বিপদ, এখন যদি ছোট ছোট পেগ নিতে হয় তাহলে তো সব আনন্দই মাটি, বুড়ো তো আচ্ছা বিপদে ফেলল। কী আর করা যায়, আমি মনের ভাব মনে চেপেই প্রশ্ন করলাম, "তাহলে, স্মল?"

"না, পাতিয়ালা।" বুদ্ধবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন।

"পাতিয়ালাআআ?"

আমি চমকে ডি এমের দিকে তাকালাম। নবীন বাঙালি আই এ এস, তিনিও অবাক হয়ে গেছেন।

প্রথমে পাতিয়ালা, তারপরে দুটো লার্জ, তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, আর হাঁ জল দেবেন, সোডা নয়।

আমরা তিনজনে তিনটে পাতিয়ালা নিয়ে বসলাম। জানালা খোলা, এসি চলছে, বাইরে বর্ষা, রিমি ঝিমি বৃষ্টি পড়ছে।

দশটা বেজে গেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই বেশ খিদে পেয়েছিল। খেজুরে আলাপ করতে করতে দু'রকমের কাবাব আর মাছভাজা সহযোগে আমরা পাতিয়ালা নামিয়ে দিলাম। শুধু মাঝে আমি একবার একটু বেলাইন করে বসেছিলাম।

"সুনীলদা তো স্কচ অন দ্য রক খায়।"

"কোন সুনীল?" বুদ্ধবাবু সরু চোখে তাকালেন।

"কেন? লেখক সুনীল গাঙ্গুলী, উনি তো প্রায়ই এখানে আসেন।"

"ও তো বাংলা খায়, ওর কথা বলবেন না তো আমার কাছে।"

বুদ্ধবাবু থম মেরে গেলেন, বেশ রেগে গেছেন বলে মনে হল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল তাঁকে সামাল দিয়ে আবার আগের ফর্মে আনতে।

পাতিয়ালা শেষ হয়ে প্রথম লার্জ চলছে। আমি বুদ্ধবাবুকে গুড হিউমারে আনার জন্যে একটা রিস্ক নিয়ে বসলাম, "আচ্ছা দাদা, আপনার লেখায় প্রচুর উর্দু শায়রী পাওয়া যায়। একটা উর্দু শব্দ প্রায়ই দেখি, ম্যাঁয়কাদা। আমি যতদূর জানি আমাদের এই ধরণের আসরকেই তো ম্যাঁয়কাদা বলে, তাই না?"

ততক্ষণে বুদ্ধবাবুর রাগ পড়ে গেছে। মনে হল তাঁর নিজের লেখার বিষয়ে জানতে চাওয়ায় তিনি খুশিই হয়েছেন।

"ম্যাঁয়কাদা হল মধুশালা", বুদ্ধবাবু বাইরে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ম্যাঁয় মানে শরাব আর কাদা বা খানা হল স্থান, ম্যাঁয়কাদা বা ম্যাঁয়খানা হল সেই আসর যেখানে শরাব সার্ভ করা হয়। তাই হ্যাঁ, আমাদের এই আসরকেও ম্যাঁয়কাদা বলা যায় বইকি। আপনি আমার কোন বইয়ে এটা পেয়েছেন?"

"আপনার একটি ধারাবাহিক 'মাধুকরী', দেশ পত্রিকায়, তাতে বেশ কিছু জায়গায়

এই শব্দটি ছিল।"

"হ্যাঁ, দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল বটে মাধুকরী, কিন্তু সে তো প্রায় বিশ বছর আগে।"

"কিন্তু এখনও আমার একটা শায়ের পুরো মনে আছে, আমার খুব ভাল লেগেছিল।"

বুদ্ধবাবু আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন। আমি বললাম, "এটাকে শায়ের বলা যায় কিনা ঠিক জানি না, একটি লাইন মাত্র, 'খন্ডহর বাতাতে হ্যায় কি ইমারত বুলন্দ থী'।"

"কেয়াবাৎ! হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে, এই কথাটা একটা ৩৭/৩৮ বছরের মেয়ে তার ঢলে পড়া যৌবনকে বোঝাতে বলেছিল।"

প্রথম লার্জ শেষ হয়ে দ্বিতীয় লার্জ শুরু হয়েছে, বুদ্ধবাবু গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু মেয়েটি হঠাৎই এটা বলতে গেল কেন মনে আছে কি?"

"না তো দাদা, মনে নেই। কেন বলেছিল?"

"মেয়েটির একটি কিশোরী কন্যা আর বছর দশেকের একটি ছেলে ছিল, স্বামী ছিল, কিন্তু সে তাদেরকে লুকিয়ে তার চেয়ে কম বয়সী এক ছোকরার সঙ্গে রতিরঙ্গে লিপ্ত ছিল। সেই ছোকরাই মেয়েটার নাঙ্গা বুক দেখে একটা শায়র ঝেড়েছিল। এবার মনে পড়ছে?"

"না দাদা, আমার দৌড় ঐ খণ্ডহর পর্যন্তই। আপনিই বলুন, আমরা শুনি।"

দাদা বললেন,

'নীগাহে যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠ কর?
হুঁয়া তো হুসনকি দৌলত গড়ী হ্যায়।'

আমি আড়চোখে দেখলাম ডি এম সাহেবের কান লাল হয়ে উঠেছে, আর আমার অবস্থাও খুব ভাল না, কিন্তু দাদা ছাড়লে তো। তিনি বলেই চলেছেন, "মানে হচ্ছে, 'চোখ তুমি বুক ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ, সুন্দরীর সব সম্পদ তো ওখানেই'।" এই শুনেই না মেয়েটা বলেছিল, 'এটাতো এখন খন্ডহর, হাঁ, একসময় এটাই সম্পদ ছিল বটে।' এবার বুঝলেন তো।"

বুঝলাম, দাদার জিভ এখন আলগা, আর এগুলে বিপদ।

আলোচনা ক্রমে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে আমরা শায়রী থেকে পালিয়ে আসতে চাইছিলাম। বললাম, "দারুণ শায়রী দাদা, তবে এবার একটু গান হলে ভাল হয় না?"

"ও, হ্যাঁ, গান, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি আপনার বৌকে ডাকুন, ওর গান শুনবো।"

"সে ডাকছি, কিন্তু আমরা তো দাদা আপনার গান শুনব বলে আশা করে বসে আছি। ওর গান তো আমি প্রায়ই শুনি।"

ডিএম সাহেবও আমায় সমর্থন করলেন।

"হ্যাঁ, জানি আমার ম্যাডাম দারুণ গান করেন, কিন্তু উনি তো এখানকারই। আপনাকে আজ পেয়েছি, রোজ রোজ তো আর পাবো না।"

"হ্যাঁরে বাবা, গান তো করব, কিন্তু স্বাতীকেও ডাকুন। সেও তো আমার গান শুনতে চেয়েছিল।"

যে ক্লাব সদস্যের ওপর আমাদের দেখাশোনা করার ভার ছিল, সেই ছেলেটিকে ফোন করলাম, "ভাই স্বাতীকে একটু পাঠিয়ে দেবে, বুদ্ধবাবু একটু ওর সঙ্গে কথা বলতে চান।"

ছেলেটি জানাল, "দাদা, স্বাতীদি কয়েকজন গেস্ট নিয়ে এইমাত্র খেতে বসলেন, খাওয়া শেষ হলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

বুদ্ধবাবু গান শুরু করলেন। ডি এম সাহেব অনুরোধ করেছিলেন একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে শুরু করতে, কিন্তু বুদ্ধবাবু বললেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত ঋতুর এরিয়া, আমি ওই এরিয়ায় ঢুকব না, আমি এখন প্রধানতঃ রাগাশ্রয়ী গাইব।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, রিমঝিম গিরে শাওন, খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিহি জলের গুঁড়ো ঢুকছে। দ্বিতীয় লার্জ শেষ করে এখন প্রথম স্মল চলছে। এক সিপ দিয়ে বুদ্ধবাবু বললেন, "আজ বাদলা, কাজরী দিয়ে শুরু করি। পরে ঠুংরি, টপ্পা যেমন যেমন মুড হবে, তেমনি গাইব।"

বলেই তিনি হঠাৎই তান ধরলেন। যেমন দরাজ গলা তেমনি তার আদা। আমি আদার ব্যাপারী, সামান্য মিস্ত্রী মাত্র, গান শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু এইসব রাজা মহারাজার ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ী। তাই বলতে পারব না কী রাগ, কী ঠাট, কী ধরণ, শুধু বলব যে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কটা গান শুনেছিলাম, কটা ছোটা পেগ নামিয়েছিলাম খেয়ালই নেই, হঠাৎ দেখলাম স্বাতীকে নিয়ে ক্লাবের সেই সদস্যটি রুমে ঢুকল।

"কী ব্যাপার, তুমি যে বলেছিলে অন্তত আধ ঘণ্টা লাগবে। এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?"

"দাদা, ফর্টিফাইভ মিনিটস হয়ে গেছে। এখন বারোটা বাজছে।"

বুদ্ধবাবু গানের মাঝেই স্বাতীকে তাঁর পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন বসার জন্য।

আর বড়জোর গোটা দুই গান হয়েছে, কয়েকজন কর্মকর্তা এসে হাজির। "লালা'দা, বারোটা বেজে গেছে, আপনার সার্কিট হাউসে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দি।"

মনঃক্ষুণ্ণ বুদ্ধবাবু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে কলকাতা যেতে কতক্ষণ লাগবে?"

"সেকেন্ড হুগলি ব্রীজ পর্যন্ত ধরে নিন এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট। তারপরে কলকাতায় যেখানে যাবেন। তবে এত রাতে কলকাতার যেখানেই যান না কেন পনেরো মিনিটের বেশী লাগার কথা নয়।"

"আমি আজ রাতেই ফিরে যাব।"

এক কর্মকর্তা বললেন। "সে কী, তা কী করে হয় লালা'দা, আপনার জন্যে সার্কিট হাউসে ঘর আছে, এই রাতে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।"

"না রে, হাইওয়ে দিয়েই তো যাব, এখনই বেরোলে দুটোর মধ্যে পৌঁছে শুয়ে পড়তে পারব, কাল ন'টায় উঠলেই হবে। কালকের দিনটা তাহলে আর মার যাবে না।"

স্বাতীর দিকে ফিরে বললেন, "তোমার গান আর এ যাত্রায় শোনা হল না। যেদিনই কলকাতায় যাবে, আমায় আগে ফোন করে দিও। আমি একটা আসরের ব্যবস্থা করবো। ঠিক আছে?"

স্বাতীও মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, জানাবে।

বুদ্ধবাবুর সঙ্গে সেই প্রথম, আর শেষ দেখা। তাঁকে আর ফোন করা হয়ে ওঠেনি। আর বছর পনেরো বাদে ২০২১ সালে উনি তো আমাদের সকলকে ছেড়ে অন্যলোকেই চলে গেলেন। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলাম না।

গ্রহণ

©বিমলেন্দু সোম, ১৯৬৭ স্থাপত্য

(বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক স্মৃতিগল্প। স্পর্শকাতর বলে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে।)

সাত সকালে আদিত্যর মোবাইল ফোন বেজে ওঠে, 'অতনু, রাঁচি'। বোতাম ছুঁতেই ও প্রান্তে অতনুর কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো, আদিত্য-দা?'

- হ্যাঁ অতনু, বলছি।

- একটা খবর আছে আদিত্য-দা, টী কে গাঙ্গুলী আর নেই। পরশু দিন মারা গেছেন!

- সে কী! ... কী হয়েছিল?

- অচল তো আগেই হয়েছিলেন – হুইলচেয়ার ছাড়া চলতে পারতেন না। সর্বশেষ উপসর্গ শুনেছিলাম "পার্কিনসন্স ডিজিজ"। হবে না? ... কত নির্দোষ অফিসারের সর্বনাশ করেছেন। আর তোমার অভিজ্ঞতা তো সব থেকে করুণ, নির্মম।... ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই?

- হ্যাঁ অতনু, সেটা ঠিকই। কিন্তু আজ আর আমার মনে কোনো তিক্ততা নেই। অবসরের পর আমার মন এখন অনেক শান্ত। তাই আজকের এই খবরটি শুনে বরং একটু খারাপই লাগছে।

আরও কিছু মামুলি কথাবার্তার পর আদিত্য মোবাইল ফোন বন্ধ করে টিভি-র দিকে তাকিয়ে থাকলেও বুঝতে পারে মনের গভীরে ক্রমশঃই উদ্বেল হয়ে উঠছে। অতনুকে ও ভুল বলেছে, মনটা মোটেই শান্ত হয়ে যায়নি। পুরোনো স্মৃতিগুলো ক্রমশঃই ওকে বিবশ করে তুলছে। মনে হচ্ছে, 'এই তো সেদিনের কথা!'...

আদিত্য চলে যায় স্মৃতির গভীরে।

শাস্তিমূলক বদলির নির্দেশে আদিত্যর পোস্টিং হয়েছে রেলওয়ে শহর বিলাসপুরে। পুজোয় দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে রাঁচি গিয়েছিল। দুই ছেলেই ভালো স্কুলে পড়ছে, আর সামনেই পরীক্ষা! তাই ছেলেদের নিয়ে অনুরাধা রাঁচিতেই থেকে গেছে। এখন ছেলেরা অনেকদিন পর বাবাকে কাছে পেয়েছে, তাও পুরো দু'সপ্তাহের জন্য। হৈ হুল্লোড়ের শেষ নেই! সমস্যা দাঁড়ালো ছুটির শেষ দিকটায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে আদিত্য। প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি, বাড়াবাড়ি হওয়াতে ডাক্তার দেখাতে হল। তাঁর নির্দেশে দু' সপ্তাহ পুরো বেড-রেস্ট। অনুরাধা এই অসুস্থতা নিয়ে বিলাসপুর যেতে দিল না।

টেলিগ্রাম করে অফিসে অসুস্থতার খবর জানিয়ে দেয়া হল। আদিত্যর কিন্তু মনে হল এই বুঝি ওকে বিলাসপুর যেতে বাধ্য করা হয়। অনুরাধার কাছেও গোপন রাখল না সন্দেহের ব্যাপারটা।

- 'তোমায় বলি নি, আমারও তাই মনে হচ্ছে।' ... অনুরাধাও একমত। 'তোমার জন্য তো সব কিছুই স্পেশ্যাল। চামচারা যে কোনো বাহানায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ অফিসে অ্যাবসেন্ট থাকলেও তাদের সাত খুন মাফ। কাজকর্ম ভাঁড়ে উঠলেও কোম্পানির কোন মাথাব্যাথা নেই। যত নিয়ম তোমার বেলায়!' অনুরাধার উষ্মা প্রকাশের যুক্তি অবশ্যই ছিল।

সন্দেহের অবসান ঘটে মেডিকেল লিভ চাওয়ার পঞ্চম দিনেই। রাঁচি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে বিশেষ পত্রবাহক মারফত আদিত্যকে পাঠানো হয়েছে এক গোপন চিঠি! বিলাসপুর রিজিওন্যাল ডাইরেক্টরের অফিস থেকে আদিত্যকে বলা হয়েছে অনতিবিলম্বে রাঁচি হেড-কোয়ার্টার্স মেডিকেল সুপারকে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট ফ্যাক্স মাধ্যমে বিলাসপুর অফিসে পাঠাতে। রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য হোক, বা ব্যাপারটায় অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্যই হোক, জানিয়েছেন যে মেডিক্যাল ইনকোয়ারি কোম্পানির চীফ অব একজিকিউটিভের নির্দেশেই এটা করা হচ্ছে।

পরবর্তী ঘটনাগুলো পূর্ব পরিকল্পিত এবং সংক্ষিপ্ত। মেডিক্যাল সুপার ড. কে সি পাল আদিত্যকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেডিক্যাল রিপোর্টটি তার হাতে দিয়ে খুবই চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'মি. সান্যাল, আপনি পায়ের ব্যথা নিয়ে অযথা চিন্তা করবেন না। ড. সিনহার প্রেস্ক্রাইব করা ওষুধ গুলোই চলুক। আমার নতুন করে কিছু দেবার নেই, দিন চারেকের মধ্যে সেরে উঠবেন। আর আপনার ভালোর জন্যই বলছি – দেরি করবেন না। কাল দুপুরের ট্রেনেই বিলাসপুর চলে যান। ফিরে গিয়ে অফিসের কাজে জয়েন করুন। মেডিক্যাল রিপোর্টটিতে লিখেছি, ফিট ফর জয়েনিং ডিউটি। ওটা ফ্যাক্স মারফত আর.ডি. বিলাসপুরকে পাঠিয়ে দিন।'

- সে কী! আপনি সত্যিই কি বিশ্বাস করেন যে আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট মেডিক্যালি ফিট?

- মি. সান্যাল, আমার মেডিক্যাল এথিক্স বলে – না, আপনি ফিট নেই! কিন্তু উপায় ছিল না, একটু আগে চিফ এক্সিকিউটিভ স্যার ফোন করে আমাকে এরকম ইনস্ট্রাকশনই দিয়েছেন। নিজের চাকরিটাতো বাঁচাতে হবে আমাকে ....

অনুরাধার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ড. পালের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে আদিত্য। আজ তো ট্রেন ধরার সময় পেরিয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে গোছগাছটুকু করে নিতে হবে অনুরাধাকে।

- তুমি বরং কয়েকটা মাস রাঁচিতে এসো না। আমাদের জন্য চিন্তা করতে হবে

না, আমরা সবাই ভালোই থাকব। মিতিলের পড়াশোনা নিয়েও তুমি কিছু ভেবো না, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে! নিজে সুস্থ থাকবে এবং খেয়াল রেখো, অন্যায় আর অবিচারের কাছে যেন তোমার মাথা নীচু না হয়। ... ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে অনুরাধা একই সঙ্গে আদিত্যকে সান্ত্বনা এবং শক্তি জুগিয়েছিল।

স্পষ্টভাষী অনুরাধা ছোটবেলা থেকেই ওর বাবার আদর্শে মানুষ হয়েছে। অন্যায়, অবিচারের সঙ্গে আপস করার শিক্ষা সে পায়নি। অনেকে ওকে অহংকারী বলে ভুল করলেও আদতে তাঁর আপাতগম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বময়ী চেহারার আড়ালে রয়েছে এক অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল চরিত্র। আর আদিত্যকে অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সবসময়ই উৎসাহ জুগিয়ে আসছে। আর বুধাদিত্য যোগে জন্ম বলে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশ্বাসী ঠাকুরদা নাতির নাম রেখেছিলেন 'বুধাদিত্য'! ক্রমে সেই নামটা কাট ছাঁট হয়ে 'আদিত্য' হয়ে গেল। ছোটখাটো চেহারা, অত্যন্ত কর্মকুশল আদিত্য শিল্প সংস্থার সিনিয়রমোস্ট আর্কিটেক্ট হিসেবে বরাবর অফিসের কাজকে প্রাধান্য দিতে অভ্যস্ত। তার জন্য কিছু মাশুলও গুনতে হয়েছে, যার ফলে আজ ওঁর এই পানিশমেন্ট পোস্টিং!

নামী পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর রাঁচি সাবসিডিয়ারির সিইও মি. তিলক কিশোর গাঙ্গুলী ব্যক্তিগত বিদ্বেষজনিত কারণে আদিত্য সান্যালকে অসুস্থ শরীর নিয়েই বিলাসপুরের রিজিওন্যাল অফিসে জয়েন করতে বাধ্য করলেও আবার প্রমাণিত হল, তিনি মাঝারি পদমর্যাদার এক অফিসারের অটুট আত্মসম্মান বোধের কাছে ক্রমশঃই হেরে যাচ্ছেন।

দীপাবলির বিলাসপুর, এই প্রথম সে দীপাবলিতে অনুরাধা, তিতির, মিতিলকে ছেড়ে নিঃসঙ্গ! হোস্টেলেও প্রায় ফাঁকা, একাকীত্ব কাটাতে সন্ধের দিকে আদিত্য হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়েছিল। অনুরাধার উপদেশ মেনে রাঁচি যায়নি ছুটি থাকা সত্ত্বেও। পূর্ব পরিকল্পিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী এই দীপাবলিতে দুই ছেলেকে নিয়ে অনুরাধার, অতনুদের ফ্ল্যাটে থাকার কথা। ফোন করে এক সঙ্গে সবার সাথেই কথা হয়ে যাবে, তাই পাবলিক এস টি ডি বুথের সামনে এসে দাঁড়ায় আদিত্য। রাঁচির লাইন ডায়াল করে একে একে প্রত্যেকের সাথেই কথা বলে এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে মনটা এখন অনেকটাই হালকা বোধ করছে। হোস্টেলে ফিরতে হবে, রাত অনেক হয়েছে, অথচ বোঝার উপায় নেই। সমস্ত শহরটি এখনও উৎসব মুখর! অন্ধকার আকাশের বুক চিরে অজস্র আলোর ফুলঝুরি, বাতাসে অল্প হলেও হিমেল অনুভূতি।

মেইন রোড ছেড়ে ডানদিকে বাঁক নেয় আদিত্য।

'গুলমোহর কমপ্লেক্স' ফুলের নামে নামকরণ, খুব সুন্দর আবাসিক কমপ্লেক্স, শিল্প সংস্থার বিলাসপুর সাবসিডিয়ারির অফিসারদের জন্য। খানিক এগিয়ে ডান দিকে হেলিপ্যাড, আর বাঁ দিকে স্কুল। বিশাল স্কুল ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে গেলেই আদিত্যর

নিবাস: 'একজিকিউটিভ হোস্টেল', তথাগত যার নাম দিয়েছে 'অনাথালয়'। খুব অযৌক্তিক নামকরণ নয়। হোস্টেলে বেশ কিছু অফিসার আছেন, যাঁরা আদিত্যর মতোই ম্যানেজমেন্টের কোপ দৃষ্টির শিকার। নানা কারণেই ওঁদের পক্ষে পরিবার নিয়ে আসা সম্ভব নয়। দারা-পুত্র-পরিবার থেকে অনেক দূরে এক 'অনাথ-জীবন' কাটাতে হবে এই হোস্টেলেই।

রাতে ঘুমটা ভালো হয়নি আদিত্যর। ফেলে আসা দিনের অসংখ্য ঘটনা বারংবার ওর মনে পড়ে যায়। কোম্পানির খুব কম হলেও আধ ডজন চিফ এক্সিকিউটিভ বস-এর ব্যক্তিগত বাড়ির নকশা তৈরি করা ওঁকে এক অন্য পরিচিতি এনে দিয়েছিল: 'CMD'S Architect'। আদিত্যর এই জনপ্রিয়তা তিলক কিশোর গাঙ্গুলী আদৌ সহজভাবে নিতে পারেননি। উনি যখন পদমর্যাদায় রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর কিংবা ডাইরেক্টর, তখন থেকেই আদিত্য সান্যাল ছিল তাঁর কাছে নেহাতই এক বিদ্বেষ বিদ্রুপের পাত্র।

ভোরের দিকে বিচ্ছিরি এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায় আদিত্যর। গলা শুকিয়ে কাঠ, গায়ে-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম! বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। সাইড টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসের জলে তেষ্টা মেটায়, তারপর প্রাত্যহিকী সেরে সে লাউঞ্জে এসে বসে। 'অনাথালয়' প্রায় নিঃঝুম, দোতালায় ওরা তিনজন, মি. ত্রিপাঠী, তথাগত আর আদিত্য নিজে। নীচের তলায় সম্ভবত তাও নেই, আছে শুধু দু'জন কিচেন স্টাফ।

- 'কী হচ্ছে সান্যাল সাহেব! আজ এতো ভোর রাতে উঠে পড়লেন যে! রাতে ঘুমটা ঠিক হয়েছিল তো? ... আপনার চোখে মুখে কিন্তু ক্লান্তির ছাপ!' ... ত্রিপাঠী সাহেব জানতে চাইলেন। উনি প্রতিদিন এই সময়ে মর্ণিং ওয়াকে বেরোন। উনিও রাঁচিতে থাকেন, আদিত্যদের পাশের গলিতে। দেড় বছর ধরে এই 'অনাথালয়'-এ আছেন, বছর খানেক পর তিনি অবসর নেবেন।

আজ একটু পরেই শুরু হবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। বিলাসপুরে দেখা যাবে না, তবে দূরদর্শন লাইভ টেলিকাস্ট করে বিভিন্ন স্থানের পূর্ণগ্রাসের দৃশ্য দেখাবে। আদিত্য হালকা ভল্যুমে টিভি সেট খোলে, সেই মুহূর্তে টিভির স্ক্রিন জুড়ে রয়েছে 'নিম কা থানা'র আলো-আঁধারি দৃশ্যাবলী! এই ভোরের বেলায়ও উৎসাহী দর্শকের ভিড় উপচে পড়া দেখে অবাক হয়ে যায় আদিত্য। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বহু প্রতীক্ষিত 'সোনালি বলয়' দেখার জন্য। পুবদিকে 'ওয়াল-টু-ওয়াল' কাচের জানালা দিয়ে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো ছড়িয়ে আছে লাউঞ্জে। ভালো লাগে আদিত্যর, রাত জাগার ক্লান্তিটুকু আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠছে সে।

সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে আসছে রাজকুমার, 'অনাথালয়'-এর কিচেন স্টাফ। এক হাতে হলুদ ছোপ ধরা তিনটি চায়ের কাপ, অন্য হাতে এবড়ো খেবড়ো কেটলি। আদিত্য রোজ এই অমৃত সুধাটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। সিঁড়িতে তথাগত আর

ত্রিপাঠী সাহেবের গলার স্বর শোনা যায়। ওঁরা দু'জনেই প্রাতঃভ্রমণ শেষে হোস্টেলে ফিরে এসেছেন।

- 'সুপ্রভাত, আদিত্য-দা!' ... তথাগত আদিত্যর সামনের সোফায় বসে।

তথাগত মৈত্র - ডেপুটি চিফ সিস্টেমস অফিসার, আদিত্যর পাশের রুমে থাকে। সুদর্শন, তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, কট্টর যুক্তিবাদী, সূক্ষ্ম রসবোধ সম্পন্ন এই হুল্লোড়ে মানুষটি 'অনাথালয়'-এর এক প্রাণশক্তি। অন্যদিকে আদিত্যর অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী।

- 'কী ব্যাপার আদিত্য-দা, আপনাকে আজ এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?' আদিত্যর শুকনো চোখ মুখ ওর নজর এড়িয়ে যায়নি।

- 'রাতে ঘুমটা ভালো হয়নি তথাগত। একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তারই জন্য সম্ভবত আমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে', - আদিত্য বলে।

- 'কী মশাই, দেখলেন তো? আমিও আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিনা, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো? এবার মন থেকে আপনি সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন।'

- 'আদিত্য-দা, দুঃস্বপ্নটা কী, আমি জানতে পারি কি?' তথাগত আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করে। ওর যুক্তিবাদী মন দুঃস্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে চায়।

দুঃস্বপ্নটা এখনও মনে আছে আদিত্যর, তাই সে শোনাতে শুরু করে, "আমরা, অর্থাৎ অনুরাধা, মিতিল, তিতির আর আমি কোথাও যেন বেড়াতে গেছি। জায়গাটা ভারী সুন্দর, অনেকটাই ম্যাকক্ল্যাস্কিগঞ্জের মতো। রাস্তার দু'পাশে ইউক্যালিপটাস, মহুয়া, কৃষ্ণচূড়া আর নাম জানা-অজানা কত রকমের গাছপালা! বিশাল ক্যাম্পাস-ওয়ালা সব বাংলো। সামনে প্রশস্ত বারান্দা কারুকার্য করা কাঠের রেলিঙে ঘেরা। দু'পাশে সুন্দর করে কেয়ারি করা মরশুমি ফুলের বাগান। বাগানে যে কত রঙ বেরঙের ফুল – দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর আমরা যে বাংলোটিতে আছি, তার পিছনেই আউটহাউস। আশপাশে অনেকটাই খোলা জায়গা। মিতিল তিতির দুই ভাইয়ের তো মজাই মজা! ব্রেকফাস্ট সেরে আউটহাউসের ওখানে ওরা দু'জন ক্রিকেট খেলায় মত্ত। অনুরাধা আর আমি বারান্দাতে আরাম কেদারায় বসে আছি। গেটের পাশটাতে বোগেনভিলিয়া গাছ থোকা থোকা ফুলে ছেয়ে গেছে। কী দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে! বারান্দা থেকে মিতিল তিতিরকে দেখা যাচ্ছে না। আউট কিংবা নট আউট, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু আগেও দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শোনা গেছে। হঠাৎ তিতিরের ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার শুনে চমকে উঠি আমরা। মিতিলও চিৎকার করে ভাইকে যেন কিছু বলছে। দু'জনেই সম্ভবত বারান্দার দিকে ছুটে আসছে। কিছু একটা বিপদের আশঙ্কায় তখন আমরা দুজনেই আউটহাউসের দিকে ছুটে যাই। দেখি তিতির মিতিল প্রাণপণে ছুটছে, ওদের তাড়া করছে একটা কুকুর, স্বাভাবিক বলে মনে হল না। আর ততক্ষণে আউটহাউসের দিক থেকে তিনটে লোক ভুঁইফোড়ের মতো বেরিয়ে আসে। লাঠি হাতে ওরা কুকুরটাকে তাড়া করছে।

- 'বাবু তু পালাই যা। .... উটা পাগলা কুকুর বটেক।'

ওরা সাবধান করে আমাকে। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটবার, তা ঘটে গেছে। প্রাণভয়ে ভীত দুই ছেলে আশ্রয় নিয়েছে মা-কে জড়িয়ে ধরে। নিরস্ত্র আমি পাগলা কুকুরটার একেবারে মুখোমুখি। আঁচড়ে কামড়ে আমার পুরো শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি আমি। অনুরাধার কাতর আবেদন লাঠি হাতে তিনটি লোকের উদ্দেশ্যে : 'বাঁচান, আমার স্বামীকে বাঁচান আপনারা। পাগল কুকুরটা ওকে শেষ করে ফেললো।' মিতিল তিতিরও কেঁদে ওঠে : 'বাবা!'...

আর তখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বুঝতে পারি, আমার সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। ঘুম চোখেই নিজের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি। না, কোথাও রক্ত কিংবা আঁচড়ের কামড়ের ব্যথা অনুভব করতে পারি না। গলা শুকিয়ে কাঠ, গ্লাসের জলে তেষ্টা মিটিয়ে উঠে পড়লাম আমি। চোখে মুখে জল দিয়ে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু হল না।"

আদিত্যর দুঃস্বপ্নের বর্ণনা শুনে তথাগত মৈত্র খানিক চুপচাপ বসে বিশ্লেষণ সূত্র ভাবতে থাকে। অবশেষে নিজের এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে হেসে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আদিত্য-দা, আপনার দেখা দুঃস্বপ্ন আসলে প্রতীকী মাত্র। আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দু'জনকে।'

- 'স্বপ্নে দেখা সুন্দর জায়গা, রঙ বেরঙের ফুল, বাংলো বাড়ি, আপনি, বৌদি, মিতিল ও তিতির, এ সবই হ'ল আসলে আপনার রাঁচি স্থিত শান্তির ঠিকানা।

- এরপর রইলো কুকুর, ওটাও প্রতীকী। আমরা মহাভারতে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চপাণ্ডবদের স্বর্গযাত্রায় সঙ্গী ছিল এক সারমেয় অর্থাৎ কুকুর। ওখানে শান্ত সারমেয় ছিল ধর্মের প্রতীক। আদিত্য-দার স্বপ্নে দেখা কুকুরটা পাগলা, অর্থাৎ অধর্মের, অন্যায়ের প্রতীক। কী আদিত্য-দা, বিশ্লেষণটা ঠিক আছে তো? ... আর এই পাগল কুকুরটা হল তিলক কিশোর গাঙ্গুলী ওরফে টি কে গাঙ্গুলী ওরফে 'তিলে খচ্চর গাঙ্গুলী'।'

- 'কিন্তু তথাগত, লাঠি হাতে ওই তিনটি লোক কারা ছিল?'

- 'একেবারে সহজ ব্যাপার' ... তথাগত যুক্তি দেখায়, 'আদিত্য-দা, আমি বারবার বলে আসছি, আপনার প্রতি সহানুভূতি রয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রির টপ মেনেজমেন্ট পর্যন্ত অনেকেরই। অথচ কিছু করার নেই। রাজধানীতে তিলে খচ্চরের খুব স্ট্রং হোল্ড রয়েছে। আদিত্য-দা, লাঠি হাতে ওই তিনজন হল আমাদের শিল্প সংস্থার সুপ্রিম ম্যানেজমেন্টের প্রতীক, যাদের কাছে বৌদি কাতর আবেদন জানাচ্ছেন ওনার স্বামীকে পাগলা কুকুর রূপী তিলক কিশোর গাঙ্গুলীর কাছ থেকে যেন অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হয়।'

স্বপ্ন বিশ্লেষণ শেষ হতেই আবার প্রাণখোলা হাসি লাউঞ্জে ছড়িয়ে দেয় তথাগত। আদিত্য ও গোমরা মুখে বসে থাকতে পারে না, মুখে হাসি ফুটিয়ে ধন্যবাদ জানায় তথাগতকে। ত্রিপাঠী সাহেবের মতো গম্ভীর লোকও মিটি মিটি হাসছেন আর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে টিভির স্ক্রিন জুড়ে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে ঈশারা করছেন। নিকষ কালো অন্ধকার নেমে এসেছে 'নিম কা থানা'র আকাশে! সূর্য পুরোপুরি গ্রহণ কবলিত। কী অপূর্ব সুন্দর স্বর্ণবলয় ঘিরে রেখেছে সূর্যকে ঢেকে রাখা চাঁদের ছায়াকে! 'অনাথালয়'-এর লাউঞ্জ থেকে তিনজনই অবাক বিস্ময়ে টিভির স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখছেন এক অপরূপ দৃশ্য।

- 'আদিত্য-দা, ক্ষত বিক্ষত তো আপনি হয়েছেনই! কিন্তু জেনে রাখুন, ওই তিনজন লোকের লাঠির ঘা অবশ্যই পাগলা কুকুরটার গায়ে পড়েছিল। ওটা অবশ্য আপনি স্বপ্নে দেখতে পাননি। তবে, বিশ্বাস রাখুন ঘটনাটা বাস্তবে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সম্বিত ফেরে আদিত্যর। টুকরো টুকরো ঘটনা জুড়তে থাকে সে। তথাগত ভবিষ্যতবাণী সঠিক করেছিল। সুপ্রিম ম্যানেজমেন্টের ঘা সত্যিই তিলক কিশোর গাঙ্গুলীর ওপর পড়েছিল। অবসর গ্রহণের সুযোগ পাননি তিনি। রিটায়ারমেন্ট ডেট-এর ঠিক আগের দিন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল বিদেশি মুদ্রার হেরাফেরি এবং আরও কয়েকটি গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় সুবাদে। অতনুই সেদিন রাঁচি থেকে খবরটা আদিত্যকে জানিয়েছিল।

কঙ্কাবতী

©বন্দনা মিত্র, ১৯৮৬ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

আদিখ্যেতা করে মেয়ের নাম মা রেখেছিল কঙ্কাবতী। মা ছিল বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রী, শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর মত বুঝুক না বুঝুক একটা বয়সে আধুনিক কবিতার বই ঘাঁটাঘাঁটি করত। তার তরুণ বয়সে, কলকাতা তখনও বাংলায় কথা বলে, শম্ভু মিত্রের মায়াবী স্বর রেডিওতে বা কোন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভেসে আসত – কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী, কঙ্কাবতী গো – মায়ের বুকে কেমন দাগ কেটে যেত সেই হু হু ডাক! মেয়ে যখন হল, সেই নাম আবার গুঞ্জরিত হল মনের মন্দিরে। তখন পড়ন্ত বেলায় কলকাতার রোদে কবিতাপ্রেমী বাঙালির ছায়া একেবারে অস্তমিত হয়নি, তাই মেয়ের বাহারী নাম রেখে সাহিত্যবোদ্ধা বন্ধু স্বজনের কাছে একটু হাততালি কুড়োতে চেয়েছিল মা।

'যশোং দেহি' বলে বায়না কে আর না করে! কিন্তু কে জানত আড়ালে বসে ভ্রূ কুঞ্চনে ডাক দিচ্ছেন দর্পহারী মধুসূদন। মেয়ে তার নিজের নাম ভাল করে উচ্চারণ করার বয়সে আসতে না আসতেই মায়ের বদলি হল অন্য রাজ্যে, যে দেশে লোকে রাজার ভাষায় কথা বলে, বাংলার মত এমন ম্লেচ্ছ অর্বাচীন ভাষায় বাক্যালাপ করে না কেউ। মা মেয়ে পড়ল মুশকিলে। আমাদের এই পোড়া দেশে লোকে অবলীলাক্রমে মারকেটা ভন্দ্রোসোভা বা নোভাক জকোভিচকে নাম নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, আর্নল্ড সোয়াসজনেগার বা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে, কিন্তু দেশী শব্দে একটু তৎসম ছোঁয়া থাকলেই জিভে জড়িয়ে যায়।

কঙ্কাবতী খুব সহজেই শুধুমাত্র নামের জোরেই অন্যান্য শিশুদের কাছে কম্বল ধোলাই-এর প্রিয় লক্ষ্য হয়ে উঠল। স্কুলে ভর্তি করার সময় শিক্ষিকাদের সরল প্রশ্ন "নাম কেয়া হ্যায়?" এর উত্তরের পর্ব চলত পরের দুই প্রহর বেলা ধরে। ক্যানকা, কেনকা, কনকা ইত্যাদি বহু পরিমার্জিত রূপের আড়ালে বাকি প্রশ্নোত্তর কোথায় তলিয়ে যেত! বার কয়েক এমন হওয়ার পর মেয়ে গান্ধিজীর শিষ্যত্ব নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিল। অঙ্ক দাও করে দেবে, ইংরেজি দাও পড়ে দেবে কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করো বলবে না।

এমনিতেই রাজভাষায় দখল না থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডাহা ফেল মারছিল মেয়ে – দোষটা ওর নয়, এমনকি দোষটা কোথায় বোঝার বয়সও হয়নি তার। তার ওপর এই উটকো ঝামেলা। শেষমেশ কপালগুণে এক সহৃদয়া প্রিন্সিপালের

দেখা পাওয়া গেল। তিনি পরীক্ষা নিয়ে বললেন – হিন্দি ও জানে না, সে যাক গে, আমাদের দিদিমণিরা আছেন, তাঁরা শেখাবেন। তবে যেহেতু আপনার মেয়ে বাকি বিষয়ে যথেষ্ট ভাল ফল করেছে, ওকে আমাদের স্কুলে নিতে আপত্তি নেই। পত্রপাঠ ভর্তি হল মেয়ে। নাম বিভ্রাটটা অবশ্য থেকেই গেল।

রোজ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মা দেখে মেয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে। ছোট্টবেলা থেকে মানুষ করেছে যে মাসি সে নালিশ করে, "তোমার মেয়ে বিকেলে কিছু খায়নি কো, অনেক বলছি, শুনছে না। টিফিনও প্রায় সবই ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে। তুমি দেখো, এমন করলে আমি পারব না। ঐটুকু মেয়ে, সারাদিন কিছু খাবে না, শরীর থাকবে নাকি?"

মা মেয়েকে বলে - কী রে, কী হল? আজ তো তোর পছন্দের ফ্রেঞ্চ টোস্ট ছিল টিফিনে।

- আমি কাল থেকে স্কুলে যাব না।

- কেন রে? এত ঝামেলা করে একটা স্কুল জোগাড় হল।

- ওখানে বন্ধুরা আমাকে "ক্যাঁও" বলে ডাকে। সবাই হাসে। কী বিচ্ছিরি নাম রেখেছো তুমি। কেউ বলতেই পারে না। বদলে দাও আমার নাম। ঐ নামে আমি আর থাকব না।

এবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে পাঁচ বছুরে মেয়ে। মা কাছে টেনে আদর করতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের ওপর। আঁচড়ে, কামড়ে, নাস্তানাবুদ করে ফেলে মাকে। শান্ত, বাধ্য মিষ্টি মেয়ের এই রণচণ্ডী রূপ দেখে চিন্তায় পড়ে যায় মা। কলকাতায় মা মনের আনন্দে সকাল থেকে সন্ধে অফিসে ব্যস্ত থাকত। মেয়ে তখন স্কুলবাসে বন্ধুদের সঙ্গে বকবক করতে করতে ফিরত দিদুনের কাছে। খাতায় সব বিষয়ে এক্সেলেন্ট পেয়ে বুক ফুলিয়ে দেখাতো দাদুভাইকে। তার জন্য আলাদা প্রাইজ বরাদ্দ ছিল। দুপুরে দিদুন খাওয়াত রূপকথার গল্প বলে। তারপর দাদুভাই-এর কাছে দেশ বিদেশের কাহিনী শুনতে শুনতে একটু ঘুমের চটকা – দাদু নাতনী দুজনেরই। বিকেলে আলো পড়লে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলা। সন্ধে গড়ালে দিদুনের কাছে স্কুলের পড়া। সন্ধে আরেকটু গাঢ় হলেই মা ফিরত অফিস থেকে। ব্যাস, মায়ের গলা জড়িয়ে সারাদিনের গল্প শোনাতে শোনাতে বাড়ি ফেরা। মাসী যখন রাতের খাওয়া খাওয়াতে বসত মহারাণী তখন দিনের শেষে ঘুমের দেশে।

নিজের কাজের দাবী মেটাতে মা সেই ছোট্ট মানুষটাকে কলকাতার ইস্কুল ছাড়িয়ে, বন্ধু ভুলিয়ে, ঘরছাড়া করে, দাদু দিদুনের অবাধ আবদার ও প্রশ্রয়ের সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে এনে ছিন্নমূল শরণার্থীর মত এক অচেনা ভূমিতে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে – সেই বিপন্ন অনুভূতি প্রকাশ করার মত ভাষা গড়ে ওঠেনি এখনও তার সীমিত শব্দ ভাণ্ডারে। তাই সেই একলা শিশুটির যত রাগ, যত অভিমান নিজের

নামের ওপর, এবং নামদাত্রী মায়ের ওপর। ও নিজের ছোট্ট বুদ্ধিতে বুঝেছে মা'ই যত নষ্টের গোড়া। তাই চারপাশের প্রতিটি ব্যঙ্গ, অপমান, স্ট্রাগল – সে চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেয় মায়ের কাছে, বাড়িতে। তাই তার খাবার পছন্দ নয়, পোশাক পছন্দ নয়, পড়তে বসার ইচ্ছে নেই, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে ভাল লাগে না। অচেনা কেউ আলাপ করতে এলে যদি জিজ্ঞেস করে – তোমার নাম কি? মেয়ে হাঁড়িমুখে চুপ করে থাকে। মা-ও ব্যস্ত তার নতুন কর্মস্থলে মানিয়ে নিতে, কাজের চাপে তার হাঁসফাঁস অবস্থা। তাই যে মনোযোগ দেওয়া দরকার মেয়ের প্রতি সে আর হয় না।

মাথা ঠাণ্ডা থাকলে মা বোঝে এখন মেয়েকে রাখা উচিত ডানার ওমে, আদরে ভালবাসায় ঘিরে, ওর আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। নিজে যতই নিরুপায় হোক, দায়ী তো মা'ই। কিন্তু কাজের চাপে সবসময় মস্তিস্ক এমন হিম শীতল থাকে না। সারাদিনের টেনশন নিয়ে ক্লান্ত মা বাড়ি ফিরে মেয়ের ট্যান্ট্রামস এর বিবরণ শুনে মাথায় আগ্নেয়গিরি জ্বলে ওঠে। মা আবার খুব চেঁচামিচি করতে পারে না। মারধোর করার অভ্যেসও নেই। এতদিন এসবের দরকারই পড়েনি। মা বরাবর রাগ হলে একা হয়ে যায়, কথাবার্তা বলে না। একটা বই টেনে পড়তে বসে, যতক্ষণ না রাগ পড়ছে। এদিকে পাঁচ বছুরে মেয়ে চাইছে মা সব ফেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকুক। যে কষ্ট ও কারোকে ঠিকমত বলতেও পারছে না, বোঝাতেও পারছে না, মা সেটা নিজে নিজেই বুঝুক। কিছু করুক। খেলতে গিয়ে কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে মা যেমন ওষুধ দিয়ে দেয়, ক্ষতে হাত বুলিয়ে দেয়, আদর করে বারবার জিজ্ঞেস করে "খুব লেগেছে?" মনের কাটা ছেঁড়াতেও তেমন স্নিগ্ধ প্রলেপ দিক মা, মা ছাড়া তো এখন রাগ দেখানোর কেউ নেই, আদর করারও কেউ নেই, অভয় দেওয়ারও কেউ নেই। তাই কিছুক্ষণ পর পাঁচ বছুরে নিজের গর্ব অহংকার বিসর্জন দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে এসে, "আর করবো না মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো।" মা মেয়েকে জড়িয়ে নিয়ে মরমে মরে যায়।

"নিজের মেয়ের কাছেও একবার হার মানতে পারলে না, এ কেমন মা তুমি!"

আক্ষেপে মাথা নেড়ে মায়ের ধড়াচূড়ো খুলে ফেলে মা। সেই পরশমণি খুঁজে ফেরা সাধুর মত প্রাণপণ হাতড়ায় তার বুকের বন্ধ ঘর, আগাছা ঢাকা হৃদয়ভূমি। ত্রস্ত সাফ করে ঝুলকালি, দ্রুত কাটছাঁট করে ডালপালা। খুঁজে বের করে কোন অতলান্ত স্মৃতির জলে ভেসে যাওয়া এক পাঁচ বছুরে বালিকাকে।

সেদিন দুই পাঁচ বছুরের কলবলানীর আড্ডা চলে শোবার ঘরে খাটের ওপর, অনেক রাত অবধি। এক বালিকা নিজের কুয়াশা মাখা ইস্কুলের গল্প বলে। কবে কোন বন্ধুর সুন্দর একটা কমলা লেবুর গন্ধওয়ালা কমলা রঙের ইরেজার – ওর কাকা এনে দিয়েছিল বিদেশ থেকে – বড্ড পছন্দ হয়েছিল। বারবার ক্লাসে ওটা দিয়ে খাতা মুছছিল। সে বন্ধু দিদিমণির কাছে নালিশ করেছিল – আমার ইরেজার

ও সমানে নিয়ে নিচ্ছে। দিদিমণি সবার সামনে খুব বকেছিল তাকে, "অন্যের জিনিস নিচ্ছ কেন? বাড়িতে বলো কিনে দিতে।" সেদিনের সেই বালিকাটি খুব কেঁদেছিল অপমানে – যদিও বাড়িতে বলেনি। জানত, ওসব দামী শৌখিন জিনিস কিনে দেওয়ার নিয়ম নেই বাড়িতে, কাজ চললেই হল। এ গল্প সে কারোকে বলেনি এতদিন, আজ পাঁচ বছুরের সঙ্গে শেয়ার করল। মেয়ে তার ছোট ছোট হাত মায়ের গালে বুলিয়ে বলল – "কোই না, আমি বড় হয়ে কিনে দেব তোমাকে।"

মেয়ে একটু একটু রাজভাষা শিখছে। স্কুলে দোলনা ঘোড়ায় দোল খেতে খেতে সেই একদা বালিকা নিজেকে ভাবত রুশদেশের রূপকথার ক্ষুদে ইভান, বড় বুদ্ধিমান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একাই ইভানের সব অভিযান পথের যাত্রী হত সে। মেয়ে উত্তেজনায় উঠে বসে - "আমাদের স্কুলেও রকিং হর্স আছে।"

- ইভানের গল্পও তো তুই জানিস, আমি তোকে বলেছি।

- আবার বলো।

মা গল্প বলে, বাইরে রাত বাড়ে। মেয়ের চোখে ঘুম নামে, মুখে হাসি ফোটে। ঠিক আছে, অন্য বন্ধু না থাক, খুদে ইভান তো রইল, কাল স্কুলে ওর সঙ্গে বাবা ইয়াগার খোঁজে বেড়োতে হবে, তার ছোট্ট কুঁড়েঘর একটা টাকুর ওপর সমানে ঘোরে, কী তাজ্জব কাণ্ড।

দিন কয়েক পর মেয়ে জানায়, "আজ বাসের টিফিন খেতে পারিনি।"

- কেন রে? আবার টিফিন খাস নি?

- সম্ভাবীর সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া হয়নি।

- সম্ভাবীটা কে?

- আমার বন্ধু। ও আজ আমার সঙ্গে খুদে ইভান খেলছিল। জানো মা, ও আমাকে 'কিং কং' বলে ডাকে।

'কিং কং' - হায় ভগবান!

- তোর নামটা কি বদলে দেব? তুই চাইলে বদলে দেওয়াই যায়। কণা বা কেকা? বা অন্য কোন নাম – তোর পছন্দমত।

মহারাণীর মুখটা ঝলসে ওঠে গর্বে, অহংকারে, আত্মগরিমায়।

- কেন? আমার নাম কঙ্কাবতীই থাকবে, এটা একা আমার নাম, আর কারুর নেই। ওরা ঠিক করে বলতে না পারলে আমি কি করব, আমি আমার নাম কারোকে দেব না।

মা এক হাতে জড়িয়ে নেয় মেয়েকে, যাক এতদিন পর মেয়ে বুঝেছে ঝাঁকের কই না হয়ে অন্য জলে সাঁতার কাটার আনন্দ। অবশ্য নামে কিছু যায় আসে না, তবে ভিড়ে স্বতন্ত্র হওয়ার ইচ্ছেটা। ...

মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। মা-ও নিশ্চিন্তে ও পাশ ফিরে ডেকে নেন সেই পাঁচ বছুরে বালিকাকে, কাল আবার দুই বন্ধু খেলতে বসবে।

ফালক্রাম (fulcrum)

©দীপঙ্কর রায়, ১৯৮০ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিক্কলেজের পাঁচবছর যেখানে শেষ, আমার এই লেখা সেখানেই শুরু। তবে শুরুটা শেষের আগেই হয়েছিল। পাস করে গেলে তারপর জোয়ালের চিন্তা। সেটা কী? জোয়াল হল কারিগরী পরিভাষায় ফালক্রাম, মানে পাঠশালার অধ্যায় সমাপ্ত করে, জীবনের পথে চলতে গেলে এই বস্তুটি ঘাড়ের উপর জুততেই হবে। অর্থাৎ কিনা, একটা জুতসই চাকরি, পরিভাষায় প্লেসমেণ্ট।

তা কাগজে কলমে প্লেসমেণ্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা ছিল। আর সে বিভাগের পাইপসেবী প্রধান, যিনি আবার আমাদের অধ্যাপক ছিলেন, খুবই রাশভারী গলায় জানালেন ... ইঞ্জিরিতে কথা কইতে না পারলে জোয়াল জোতার ইন্টারভিউতে ভরাডুবি নিশ্চিত। আমি কিনা নির্ভেজাল বাংলা মিডিয়ামে পড়া বোতাম আঁটা বঙ্গ, আমার স্পোকেন ইংলিশের দৌড়, গুড মর্ণিং, হাউ ডু ইউ ডু এর আগে আর এগোয়নি। তাই মনে বড় শঙ্কা হল। এবারে কী হবে?

দেবাশিস, আমার ছাত্রাবাসসখা, ইংরেজি মিডিয়ার মিশনারী স্কুলে পড়া। সে বেশ ফটর ফটর ইংরিজি কইতে পারত। তো তাকে ধরলুম শেষকালে। "শোন, তুই আর আমি রোজ বিকেলে ফাস্ট গেট থেকে ঝালমুড়ি কিনে ব্যাতাইতলা অবধি যাব। আমার সাথে শুধু ইংরেজীতেই কথা কইবি। অব্যেস দরকার, বুঝলি না? মুড়িটা অবিশ্যি আমিই খাওয়াব।"

তো সে চলল কিছুদিন, তবে মুড়ি খাওয়া ছাড়া কথাবার্তা বিশেষ এগুলো না। বোলতি বন্ধ একেবারেই। শেষে ধুত্তেরি বলে ছেড়ে দিলাম।

আমাদের তো প্লেসমেণ্ট বিভাগ ছিল, কিন্তু এই প্রজন্মের মত এত এত ক্যাম্পাসিং ছিল না। সীমিত যে দু'একটা কম্পানী আসত, সেখানেও বিশেষ কল্কে পেতুম না। নামী অনামী পাব্লিক সেক্টর কম্পানিগুলোর বড় বড় পাতাজোড়া কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতাম। লিখিত পরীক্ষা আর ইন্টারভিউ পাস করে তবেই সেখানে চাকরি। এইরকম এক সংস্থায় আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে অবশেষে আমার ইন্টারভিউয়ে রশিকে ছিঁড়ল, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সেইল) থেকে। কিন্ত ইংরিজিতে কথা বলা? সে তো তখনো শিখিনি!! কী জবাব দেব, সেটা মনে মনে অনুবাদ করে তবেই বলতে হবে।

সেইলের ইন্টারভিউ হয়েছিল কলকাতায়। ফর্সা জামাকাপড় পরে সকাল সকাল

সেই আপিসে গিয়ে হাজিরা দিলেম। টাই পরার অত চল তখন ছিল না, আর থাকলেও টাই পরতেই জানতুম না। সহপাঠী অনেককেই দেখা গেল সেখানে। দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তারা যে আসলে আমারই প্রতিদ্বন্দ্বী সে চিন্তা তখনও আসেনি। সে যাই হোক, ডাক পড়ল ঘরে। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ।

মে আই কাম ইন, প্লিজ সিট ডাউন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

এরপর মনে হল বোর্ডের যিনি মাথা ওনার পাশে বসা অফিসারের সাথে বিশুদ্ধ বাংলায় কী যেন বললেন। শুনে প্রাণে বড় আরাম হল।

- মে আই স্পিক ইন বেঙ্গলী স্যার?

বোর্ডের মাথা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, অ্যাঁ?

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "য়ু কাণ্ট স্পীক ইন ইংলিশ?"

- আই ক্যান স্যার, বাট ক্যান এক্সপ্লেন বেটার ইন মাই মাদার টাং... ভদ্রলোক পুরো এক মিনিট চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটু মুচকি হাসি, আচ্ছা বলো।

সেইলের পুরো ইন্টারভিউটা আমি বাংলায় দিয়েছিলুম। তবে কিনা, মাতৃভাষায় ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরির আশা কেউ করে না, আমিও করিনি। ওটা ছিল আমার পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা মাত্র।

এরই মধ্যে কলেজের হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি চলে এসেছি। জোয়াল খোঁজা চলছে। একগুচ্ছ সাইক্লোস্টাইল করা বায়োডাটা বানিয়েছি। সারা সকাল ঝোলা কাঁধে বিভিন্ন কোম্পানিতে গিয়ে সেই বায়োডাটা একটা একটা বিলিয়ে আসি, আর সারা বিকেল ডাকঘরের অমলের মত, রাজার থুড়ি কোম্পানির চিঠির অপেক্ষায় বসে থাকি। রাস্তার মোড়ে পিওন দেখলেই আশায় আশায় বারান্দায় এসে দাঁড়াই। তো এই করতে করতেই একদিন এল বটে রাজার চিঠি। সেইলের খামে আমার নামে এক চিঠি এসেছে। দেখলাম সেই বাংলায় ইন্টারভিউ এর ফাইনাল সিলেকশন। আমাকে জয়েন করতে হবে ভিলাই নয়, রৌরকেল্লা, সালের, বোকারো কোথাও নয়। একদম বাড়ির কাছেই আর্শিনগর, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায়। বন্ধুরা বলল, বাংলায় ইন্টারভিউ দিয়েছিলুম বলেই আমার এই বঙ্গীয় পোস্টিং। সেইল বোধ করি বুঝেছে, বেচারা হিন্দী ইংরিজি বলতে পারে না, একে ঘরের কাছে রাখাই ভাল।

তখন অক্টোবরের শুরু। বাতাসে শারদীয়া আগমনী। সোনামাখা ভোরে, শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে মনে হল, চিঠিটা নিয়ে এসেছে আমার কত জীবনের স্বপ্ন দেখার রসদ! পূজোটা কাটল শরতের পেঁজা তুলোর মত। লক্ষ্মীপুজোর পর এক খুশিয়াল ভোরে, বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে, গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়ে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম....

আমি জানি, এই পর্যন্ত পড়েই অনেকেই চোখ কোঁচকাচ্ছ। আরে ব্যাটাকে তো

বরাবর তেলবেচা তেলী দেখে এলুম, পেট্রোল ডিজেল আর রান্নার গ্যাস বেচছে। এর মধ্যে আবার স্টীল এল কোদ্দিয়ে?

আসলে গল্পটা তো এখনো শেষ হয়নি! না, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় আমি জোয়াল জুততে পারিনি শেষমেশ। পারব কী করে? ডাক্তারী পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেলুম তো? ডাক্তার বললেন আমার দূরদৃষ্টি সেইলে কাজের উপযুক্ত নয়। এ ব্যাপারে আমার একটা খটকা ছিল অবিশ্যি। বিজ্ঞাপনে লেখাছিল বটে, চশমার পাওয়ার চারের বেশী হওয়া চলবে না। তাই চোখ পরীক্ষার আগে ঘরে ঢুকেই, বোর্ডটা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম, যাতে কম পাওয়ারেও বোর্ডের অক্ষরগুলো বলতে পারি। তো ডাক্তারবাবু পড়তে টড়তে বললেন না। স্রেফ চশমাটি নিয়ে পাওয়ার মিলিয়ে বললেন, "এঃহে, হবে না তো। তোমার তো দেখি সাড়ে চার। অ্যাপ্লাই করার সময় দেখনি, লিমিট ছিল চার?"

অতএব, দূরদৃষ্টির অভাবে আমি বাতিল। বাক্স বিছানা নিয়ে ফেরার ট্রেনের অপেক্ষায় দুর্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গাছতলার বেঞ্চে বসে আছি। পুজোর রেশ তখনও যায়নি। স্টেশনের বাইরে প্যান্ডেল খোলা হচ্ছে, আর সরে যাচ্ছে এক বাইশ বছরের তরুণের মনের রঙ্গিন ক্যানভাসগুলো। কোজাগরীর পরে চাঁদের আলোয় স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ভেসে যাচ্ছে। সেই আলোয় গা ভিজিয়ে মনে মনে বললাম, এই শহরে আর কোন দিন নয়। তখন ডাউন ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢুকছে।

গল্পটা কিন্তু এখনেও শেষ নয়। বছর ছয়েক পরের কথা। আমি বিহার নেপাল সীমান্তের একটি গঞ্জ শহর রক্সৌলে পেট্রোলিয়াম মজুতের ডিপো নির্মাণে আছি। কলকাতা থেকে মুজফ্ফরপুরে ট্রেন বদল করে আসতে হয়। কলকাতার কাগজ পৌঁছয় পরের দিন সন্ধ্যায়, চিঠিপত্র সপ্তাহে একদিন। সেইদিন সকাল থেকেই বসে থাকতাম বাড়ির চিঠির জন্য।

তো এইরকম একদিন, বাবার চিঠি এল খামে করে "তোমাকে বলিয়াছিলাম তোমার বিবাহের জন্য পাত্রী দেখা চলিতেছে। একটি সম্বন্ধ আমাদের পরিবারগত ভাবে পছন্দ হইয়াছে। কন্যার পিতা দুর্গাপুরে সেইল হাসপাতালের চিকিৎসক, কন্যা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরতা"... ইত্যাদি ইত্যাদি।

জীবনের দুটো ফালক্রাম, একটা জীবিকার আর অন্যটি জীবনের। দুর্গাপুরের জীবিকার ফালক্রামে বাতিল হয়ে আবার ফিরে আসতে হল জীবনের ফালক্রামে, সেইবন্ধন, যা কিনা অবিচ্ছেদ্য। এরপর তো কতবারই যাওয়া আসা দুর্গাপুরে। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের সেই গাছতলার বেঞ্চিটা মিটিমিটি হাসত কি? বলেছিলে যে, আর আসবে না এই শহরে?

না এসে কি পারি? আমার দ্বিতীয় হোম টাউন যে!

নেশা

©রঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, ১৯৭২ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

অ্যাসেম্বলি লাইনের বেল্ট বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতে ভাসছে ছোট ছোট যন্ত্রাংশ। সুপারভাইজর অজয় লক্ষ্য করল অনাথের মাথা নীচু। সামনে দিয়ে যন্ত্রাংশ চলে গেল ওর হেলদোল নেই। "কী রে? লাইনে কাজে বসেছিস নাকি মাজাকি হচ্ছে?" অজয় হুঙ্কার ছাড়ে।

সাগর ঠেলা মারে অনাথকে। অনাথ বিড়বিড় করে, দাঁড়া, দাঁড়া এক সেকেন্ড।

অজয় ততক্ষণে লাইনের সামনে। সাগর আর বিষ্ণু অনাথকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, "অজয়দা, দেখে নিও, একপিসও কম হবে না। আমরা সব মেকআপ করে দেবো।"

অজয় অনাথকে লাইন থেকে তুলে নিল। "চল, আজ তোর ছাড়ান নেই। অনেকদিন সাবধান করেছি।"

এত কিছুর পরেও অনাথ কেমন যেন নির্বিকার।

ব্যাপারটা এইচ আর ঘুরে আমার কাছে এল। "নিন স্যার, কী করবেন একে করুন। এ শোধরানোর নয়। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি।"

অনাথ মাথা নীচু করে বসে আছে। কুচকুচে কালো চেহারা। একমাথা চুল। আজকালকার ঢঙে দুপাশ চাঁচা, ওপরে বেশ বড়ো চুল একপাশে হেলে আছে। বেশ বড় কালো ফ্রেমের চশমা। ওকে দেখছি। চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার মত ওর প্রথম দিনের কাহিনী ভেসে গেল।

"বাড়িতে কে কে আছে?"

"মা আর আমি।"

"চলে কী করে?"

অনাথ চুপ, উত্তর দেয় না।

"চুপ করে থাকলে তো হবে না।"

আবার অনাথ চুপ।

ওকে কথা বলাতে আমার একটু সময় খরচ হল। এই সময়টা আমি যত্ন করেই খরচ করি। যাদের কেউ নেই তাদের জন্য। আমার নিজের কথা মনে পড়ে। ভোর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস, দু'ঘণ্টার বাস, চার ঘণ্টার ট্যুসন পড়ানো, আবার বাস। বাসের হাতলে জানলায় ঠোক্কর খেতে খেতে চোখ খোলা রাখতে পারতাম না।

বাচ্চুদা আমার খাবার রেখে দিত। রাতে নিজের পড়া একটু। স্কলারশিপ্টা ধরে না রাখতে পারলে পড়াই বন্ধ হবে যে।

আজ আমি দাম জিজ্ঞেস না করেই বাজার করি। এই সমাজ আমাকে অনেক দিয়েছে। আমি সামান্য ফিরিয়ে দিতে চাই। তাই।

"কী রে? কী করেন মা?"

"মা কাজ করে।"

"কী কাজ?"

"বাড়ি বাড়ি।"

"এতে লজ্জার কী আছে? মাথা নীচু করে আছিস কেন? মা কষ্ট করে তোকে আই টি আই করিয়েছেন। তাঁর কথা বলতে মাথা নীচু?"

একটু থেমে বললাম, "ধরে নে আমার এখানে তোর চাকরি হয়ে গেল।"

আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো ছেলে। এক ঝলক। আবার চোখ নামালো।

"তবে শর্ত আছে। প্রতিজ্ঞা কর যে মাকে আর বাড়ি বাড়ি কাজ করতে দিবি না।"

আবার অনাথ চুপ, উত্তর দেয় না।

"কী হল?"

"স্যার, কত পাবো হাতে?"

"যা পাবি তোদের দুজনের চলে যাবে।"

"রাজী, স্যার।"

অনাথ উঠে এল আমাকে প্রণাম করতে।

"নিজেকে প্রণাম কর, আমাকে নয়।"

অনাথ বুদ্ধিমান, কাজের ছেলে। কাজ শিখল, মাইনে বাড়ল, হাতে ফোন এল, জামাকাপড়ও ভালো হল।। সবকিছুই হল আমার চোখের সামনে। আমি দূর থেকে খেয়াল রাখতাম। ভালো লাগত। খোঁজখবরও নিতাম।

"মা কেমন আছেন?"

চোখ তুলেই নামিয়ে নিল।

"কবে থেকে চলছে?"

আবার অনাথ চুপ।

"কাজে না এলে তো মাইনে কাটা যাবে। আবার ঠেলে দিবি মাকে? কাজে আসবি তুই, লাইনে না। আর এখানে আমার কাছে আসবি। আমি কাজ না দিলে বসে থাকবি। তোর ফোন আমার কাছে থাকবে।"

ওর বন্ধুদের থেকে জানলাম যে অনাথের একটাই নেশা, মোবাইল ফোন। অন্য আর কোন নেশা সে করে না।

দু দিন বাদে এইচ আর ছেলেটি আমার কাছে এল।

"স্যার, একটা নোটিস দিলে হয় না? লাইনে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দি?"

"বেশ তো, নোটিস দাও। তবে বাংলায়।"

"ওটা পারব না স্যার। বাংলায় হবে না।"

"আরে? তাহলে পড়বে কে? ইংরেজি ওরা তো ফিরেও দেখবে না।"

"তাহলে স্যার, আপনি যদি... লিখে দেন।"

নোটিস পড়ল পর দিন বাংলায়।

এই লেখা পড়ার পরই মদ, গাঁজা, সিগারেট, ড্রাগ এই সব মাথায় আসছে। তাই না? এই সবের থেকেও মারাত্মক এক নেশা আমাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। তার বিস্তার অনেক বেশী। সারা পৃথিবীতে যত লোক ওপরের সব নেশায় আসক্ত, তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি আসক্ত এই নেশায়। এই নেশায় আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের হাতে ধরা ফোনটি। এর আসক্তি মদ গাঁজা ড্রাগের থেকেও মারাত্মক। কারণ মায়েরা নিজেদের সুখ আর স্বস্তির জন্য এই নেশাটি দুধের শিশুদের ধরিয়ে দিচ্ছেন। মাস তিনেক বয়সের পর থাকেই সে তার নেশা না পেলে কান্না, হাত পা ছোড়া, না খাওয়া দিয়ে জানান দেয়। চোখের সামনে ফোনটি পেলেই সে শান্ত।

আর মা বাবাও ঘুম ভাঙ্গলেই হাত বাড়ান ফোনের খোঁজে। মজার কথা হল এই নেশাটি ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ করে না।

এই ফোনাসক্তি ছোটদের খুবই পছন্দের কারণ এই যন্ত্রটি ওদের কথা শোনে। এটা এক অন্য জগত যা রিসেট করা যায়। খেলতে খেলতে কেউ মারা গেলে রিসেট করে আবার খেলা শুরু করা যায়। বাস্তব থেকে অনেক দূরের এই সব খেলা যদি শক্ত মনে হয়, একটা ধাপ নামিয়ে তাকে সহজ করে নেওয়া যায়। অঙ্কটা শক্ত মনে হলে তাকে সহজ করে নেবার এমন সহজ রাস্তা নেই কিন্তু।

বলা হয় হাতের মুঠোয় ধরা এই ফোন থেকে ওরা কত কী শেখে! তাই কি? ওরা তাই শিখবে, যা এই খেলার কারিগর ওদের শেখাতে চাইবে। তা ওর জন্য ভাল মন্দ যাই হোক। গভীর ভাবে চিন্তা করার দরকার নেই তো। এটাকে এখন 'চাপ' বলা হয়, চিন্তা নয়। ফোনের ওপর 'হাল্কা' করে এদিক ওদিক আঙ্গুল চালালেই চলে যায়।

এরা ফোনের সাথে নীরব কথা বলে। সামনা সামনি মুখোমুখি কথা বলার দক্ষতা এদের তৈরি হয় না। যুক্তি দিয়ে কথা বলা, আলোচনা করা, তর্ক করা, দর কষাকষি করা, যত্ন করে শোনা, তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়ার সামর্থ্য তৈরিই হয় না। ফোন তো আর রাগ করে না, অনুযোগ করে না, অভিমান করে না। জবাব দেয় না মুখে মুখে, ভুলও বোঝে না। চুপ করে থাকে। এরাও তেমনটাই প্রত্যাশা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কি, কেন, কবে, কোথায়, কিভাবে – সব প্রশ্নের একাধিক জবাব হাতের কাছে পাওয়ায় খোঁজার জেদ, পরীক্ষা করে দেখার ধৈর্য আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে।

একবার যদি জোর করে ফোন কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে রাগ, ঝগড়া, মারামারি, অনশন, খুন খারাপি, আত্মহত্যা কী হয়নি! এমনকি অফিস মিটিঙে ফোন বন্ধ রাখতে বললে উসখুস, অমনোযোগ, সুচিন্তিত অভিমতের অভাব সবই দেখা যায়। অর্ধেকটা মানুষ যেন ফোনের সাথে বাইরে আছে! সামাজিক মেলামেশায় যে দেওয়া, নেয়ার ব্যাপার আছে, ফোনাসক্তরা তাতে অভ্যস্ত নয়। তাদের কি অসামাজিক বলব? ওরা যে এই সমাজেই থাকে।

একটা ওষুধ বলতে পারি। ফোনুপাস। অঞ্জলি দেবার আগে যেমন। নিজেকেই করতে হবে। দিনে এক ঘণ্টা থেকে সপ্তাহে একদিন। একটা হয়ে যাক খেলা। চিটিং চলবে না নিজের সাথে।

কদিন পর অনাথ এসে বলল

স্যার, আমায় একটা কপি দেবেন?

কিসের কপি?

ওই যে নোটিসের।

ওটা পড়েছিস?

হ্যাঁ স্যার, পড়েছি।

তা এই নোটিশ নিয়ে কী করবি?

স্যার, আমাদের ক্লাবে লাগাবো।

Sketch: ©Dipayan Lodh, 2009 Civil Engineering

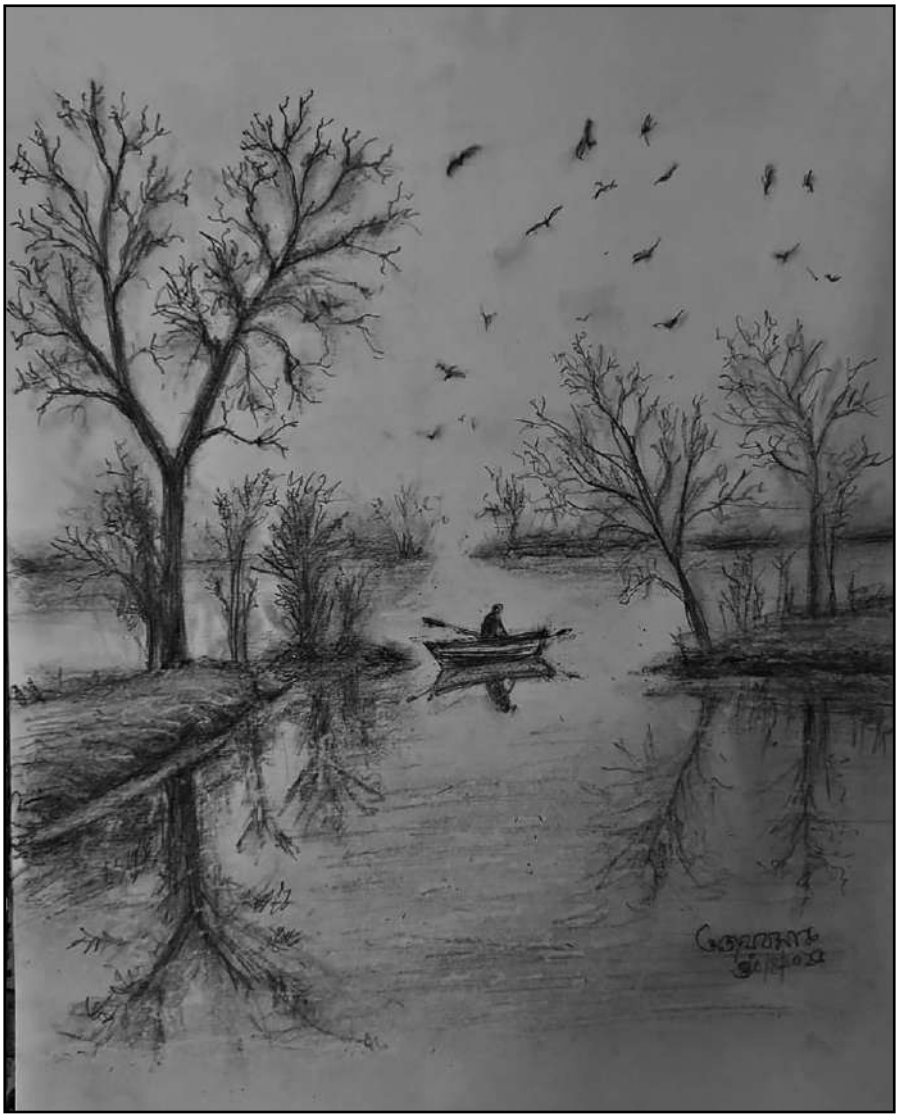

Sketch: ©Ajay Kumar Basak, 1972 Civil Engineering

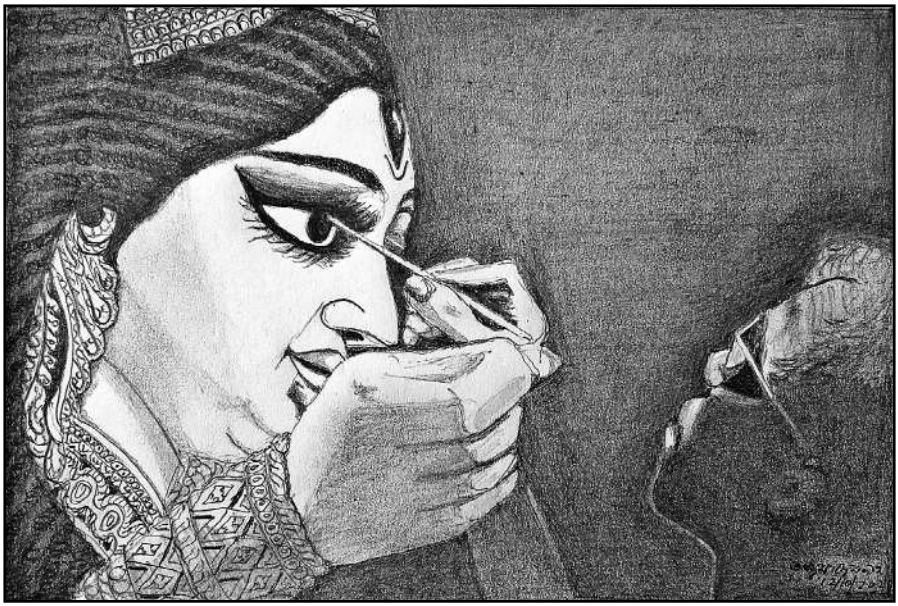

Sketch: ©Ajay Debnath, 1970 Electrcal Engineering

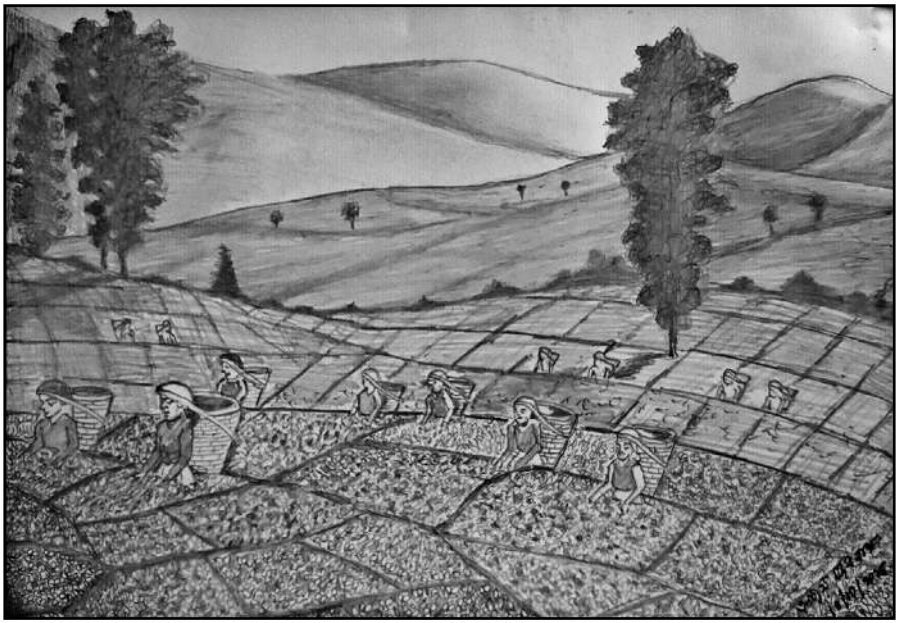

অনুপ্রেরণা

©অনিরুদ্ধ রায়, ১৯৮৩ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

আমার দুই ভাগ্নী, বড় জনের নাম সুমি, আর ছোট জন মিমি। বাহ্যিক চেহারা এবং চারিত্রিক দিক থেকে দুজনে পুরো পোলস এপার্ট। বড় জনের হুইটিশ কমপ্লেক্শন, মাঝারি হাইট। ছোট জনের গায়ের রং চাপা আর উত্তুঙ্গে লম্বা, পাঁচফুট নয় ইঞ্চি। বড় জন মেধাবী, শান্তশিষ্ট। উল্টোদিকে ছোট জনের পড়াশোনায় কোনোই মন নেই, ভীষণ উচ্ছল অদ্ভুত প্রকৃতির। যদিও এদের দুজনের বয়সের তফাৎ সাত বছর, তবু নিজেদের মধ্যে খুবই ভাব। দুই ভাগ্নীই আমার নেওটা তবে ছোটোটাই কেন জানি না আমার কাছে বেশি প্রিয়। দুষ্টু, অমনোযোগী বলেই হয়তো অন্য সব গুরুজনের অনাদরের পাত্রী আর সেই কারণেই হয়ত ওর প্রতি আমার বিশেষ মমতা। তবে সারল্য আর মিষ্টি হাসি দেখলে যে কোন লোকেরই মন ভালো হয়ে যায়।

বড় ভাগ্নী সুমি এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস, অসাধারণ গান গায়, রান্নাবান্নার হাত ভালো, মিষ্টি ব্যবহার ইত্যাদি কারণে আত্মীয় মহলে প্রভূত সুনাম। যেচে তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। এদিকে ছোটো বোন মিমি মাধ্যমিকে কোনো মতে পি ডিভিশনে পাস করে এরপর কোনো স্কুলে আর এডমিশন পায় না। শেষে থার্ড লিস্টে নাম উঠিয়ে এক স্কুলে গিয়ে ভর্তি হল। সব মিলিয়ে বড় মেয়েকে নিয়ে আমার দিদি-জামাইবাবুর যতটা গর্ব ছোটো মেয়েকে নিয়ে ততটাই সঙ্কোচ।

বড় জনের মুম্বাই প্রবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড একাউন্টেন্টের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ এলো। অত্যন্ত ভালো পরিবার, সবাই জ্ঞানে, মানে, প্রতিষ্ঠায় সমাজের প্রথম সারির দিকে। মেয়ে অত দূরে চলে যাবে ভেবে আমার দিদি জামাইবাবুর প্রথমে একটু দোনামনা ছিল কিন্তু এত ভালো পাত্র আর হাতছাড়া করলেন না। বড় মেয়ে সুমির এই পাত্রর সাথেই ঘটা করে বিয়ের ব্যবস্থা হল। আর ছোটো মেয়েকে বাড়ি শুদ্ধ সবাই বোঝাল, দিদির বিয়েতে ভদ্র হয়ে থাকিস, অসভ্যর মতো বরযাত্রীদের সামনে নাচানাচি করবি না।

সব গুরুজনদের কথা শুনে মিমি সুন্দর শাড়ি পরে দিদির বিয়েতে সবার তদারকি করতে লাগল। ঢ্যাঙা চেহারায় শাড়িতে মিমিকে বেশ অন্যরকম লাগছে। দিদির অতি মেধাবী, প্রবাসী পিসতুতো দেওরের চোখে মিমিকে ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাস মডেল, কেন্ডল জেনরের সমগোত্রীয় মনে হল। তাঁর ইংরেজি ঘেঁষা আনইম্প্রেসিভ আলাপ জমানোর প্রচেষ্টায় মিমি জল ঢেলে দিয়ে বলে, "তুমি বাংলায় কথা বললে আমি

তোমাকে পাত্তা দিতে পারি।"

সেই ছেলে তার মগজস্থ বাংলা কবিতার ভাণ্ডার কোনরকমে হাতরিয়ে "হাট্টিমাটিম টিম" বার তিনেক শুনিয়ে দিয়ে বলল, "কয়েকটা বাংলা পোয়েট্রি তুমি আমায় শিখিয়ে দাও না, প্লীজ?"

আর বিয়ের মালা বদল অনুষ্ঠানের আগে মিমি তার দিদির কানে কানে বলে দিল, "দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা।"

সুমি ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "এই, তুই কিছু গড়বড় করে বসিস না, পটাই আই আই টি, পাওয়াইয়ে কম্পুটার সাইন্সে চান্স পাওয়া ছেলে। ওরকম মারাত্মক ভালো ছেলের সাথে তোর একেবারেই পটবে না আগেই বলে দিলাম। ওদিকে একদম ভেড়ার চেষ্টা করবি না তাহলে আমারই লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।"

মিমি গিয়ে পটাইকে বলে দিল, "এই শোনো, তুমি বড্ড বেশি ভালো ছেলে। তোমার সাথে আমি মিশব না।"

পটাই সকাতরে বলে, "আরে না না, আমি ক্লাস সেভেনে ভূগোলে ফেল করেছিলাম আর এই ফার্স্ট সেমেও গেঁড়াতে পারি।"

মিমির জবাব তৈরি ছিল, "ঠিক আছে, আগে গেঁড়াও তো, তারপরে দেখছি।"

পটাইয়ের কাছে মডেল গার্ল মিমি তখন এতটাই ইম্পরটেন্ট যে ক্যারিয়ার শিকেয় তুলে ও ফার্স্ট সেমেস্টারে কয়েকটা পেপারে ইচ্ছে করেই গেঁড়িয়ে বসল। সেই নিয়ে পিসির বাড়ি প্রবল অশান্তি। শাঁকচুন্নীর পাল্লায় পড়ে ছেলে বিগড়েছে। পরিস্থিতি দেখে-বুঝে সুমিরও খুব খারাপ লাগছে। সে তাঁর ছোট বোনকে ফোন করে বলল, "ওরে লক্ষ্মীছাড়া, তুই এই ভালো ছেলেটার মাথা খাস না। তুই ওকে বুঝিয়ে বল পড়াশোনায় মন দিতে।"

মিমি বলে, "ধ্যাৎ আমি মাথা খাওয়ার কে? তাছাড়া আমি ওকে কী করে ওকে পড়াশোনায় ভালো হওয়ার কথা বলব? আমি নিজেই তো পড়াশোনা করি না।

- একটা কিছু কর আমার লক্ষ্মী বোন, ফার্স্ট ইয়ারে ফেল করলে ওদের কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন জুহু বীচে মুফলি বেচা ছেলেকে কি তোর ভালো লাগবে?

- খারাপ কেন লাগবে? মুফলি ভালো ভাবে বেচতে পারলে খারাপ কী?

- দূর পাগলি, ওর মা-বাবার কথাটা তুই ভাববি না? আমার কথা শোন, ও গরমের ছুটিতে কোলকাতায় যাবে, তুই প্লিজ ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লেখাপড়ায় ফেরা।

- ঠিক আছে, এত করে যখন বলছিস তখন ওকে একবার বুঝিয়ে বলি।

এবার গরমের ছুটিতে মিমি ওকে ডেকে বোঝাল, "এই যে ছেলে, শোনো। ফেল টেল তো খুব হল। এবার পড়াশোনা করে দেখাও দেখি ভালো পাশ করতে পারো কিনা। আর তুমিও পড়, আমিও পড়ি।"

পটাই আতঙ্কিত হয়ে বলে, "আমি পড়লে তো পাশ করে যাব, কিন্তু তুমি?"

মিমির তাৎক্ষণিক জবাব, "আমি স্কুটার চালাতে জানি, ফেল করলে সুইগির ডেলিভারি গার্ল হয়ে যাব কিন্তু তুমি তো ভালো করে মুম্ফলিও বেচতে পারবে না।"

- তা ঠিক, তবে ব্যাপারটা একটু রিস্কি হয়ে যাবে না?

- আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমিও একটু পড়ে দেখি না? আগে তো পড়াশোনা করা প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। এবার না হয় তোমার জন্য পড়ি।

পটাই ভালো নম্বর পেয়ে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেল, মিমিও হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে সাইকলজিতে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হল। এখন ওঁরা বিয়ে করে সিডনিতে থাকে, দুজনেই নিজ কর্মক্ষেত্রে সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠিত। ওদের এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের বাপ মায়ের দেওয়া শিক্ষা হল, যা করতে মন চায় ভালোবেসে তাই কর বাপু, তাতে প্রাথমিক ভাবে অসফল হলেও লেগে থাক। তাছাড়া জীবনে সাফল্যের আনন্দ পেতে হলে এক আধবার ফেল করাটাও খুব দরকার।

শান্তনু'র কড়চা

©শান্তনু দে, ১৯৮৬ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

বি ই কলেজের হাতখরচা

টমাস হার্ডির, 'জিউড দ্য অবসকিয়র' বইয়ের নায়ক জিউড ফলি অক্সফোর্ডে গিয়ে পড়তে গিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, অনেকটা আমাদের অপরাজিত'র অপু যেমন কলকাতায় পড়তে এসে অথৈ জলে পড়েছিল, সে রকম... বা তারও বেশী।

আমি যখন বি ই কলেজে ঢুকলাম আমার অবস্থা ঠিক অত করুণ না হলেও বেশ সঙ্গিন ছিল। থাকা, খাওয়ার প্রবলেম ছিল না, প্রবলেম ছিল হাত খরচের। আমার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। আমার হাত খরচটাকে ভাবতেন মহার্ঘ্য ভাতা। তাছাড়া হাতে বেশী টাকা পয়সা পেলে ছেলে বদসঙ্গে বখে যাবে সে ভাবনাটা তো ছিলই। সেটা খুব একটা অমূলক নয়, কারন আমি ক্লাস এইটেই সিগারেট, টেনে বিয়ার ধরেছিলাম। বাড়িতে কেউ ঠিক জানত না, তবে কিছুটা আঁচ করতে পারত বোধ হয়।

ফার্স্ট ইয়ারে সপ্তাহে পেতাম পঁয়তিরিশ টাকা। বছরে বছরে মহার্ঘ্য ভাতার মতই বেড়ে বেড়ে ফোর্থ ইয়ারে পঁচাত্তর টাকা হয়েছিল। সেই সীমিত পুঁজিতে কীভাবে চালানো যায়, দিনে এক প্যাকেট সিগারেট আর সপ্তাহে তিনটে সিনেমা দেখে, তার মধ্যে একটা অন্ততঃ এস্প্ল্যানেড-এ... এই কথা ভাবতে ভাবতেই কলেজ লাইফটাই শেষ হয়ে গেল।

দু একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা হল, বই খাতার পিছনে অযথা পয়সা নষ্ট করব না। চার বছরে কোনো বই কিনব না, কিনিওনি, এমন কি ক্যালকুলেটর, ড্রইং বোর্ডও কিনিনি।... একদম শেষে মানে কলেজ জীবনের গোধূলি লগ্নে, ফোর্থ ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষার আগে, কোনো একটা কুইজে জিতে কিছু প্রাইজ মানি পেয়ে, দুটো গাবদা বই কিনেছিলাম। জানাদার দোকান (আমাদের কলেজের বুক স্টোর) থেকেই কিনেছিলাম... জানাদা গুনগুন করে গান গাইছিল, "কত যে দিন বসেছিলাম পথ চেয়ে আর দিন গুনে, দেখা পেলাম ফাল্গুনে।" সেই বই দুটো অনেকদিন শো কেসে সাজানো ছিল, তারপর আমারই কলিগ পড়তে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। স্টীল প্ল্যান্টে চাকরি করতে হলে মেটালার্জির বই কী কাজে লাগতে পারে সেটা এখনো ভেবে পাইনি। বই না কিনলেও বাড়ি থেকে বই-এর

জন্য টাকা তো নিতাম। সেটাই সারা বছর ভাঙিয়ে খেয়েছি। আমার এই নিম্নমানের মনোবৃত্তির জন্য যারা আমাকে মনে মনে তিরস্কার করছেন, তাদের জানিয়ে রাখি বি ই কলেজের প্রাচীন অরণ্য প্রবাদানুসারে আমাদের এক সিনিয়র, লগ টেবিল কেনার জন্য বাড়ি থেকে অনেক টাকা জোগাড় করে বোম্বে আর গোয়া ঘুরতে গেছিল। বাড়িতে বলেছিল, লগ টেবিল মানে কাঠের বড় টেবিল।

আর একটা যুগান্তকারী ডিসিশন ছিল যে, কোনদিন বিড়ি না কেনা। চাইলে সিগারেট কেউ দিত না, কিন্তু নিতান্তই অমানুষ টাইপের হাড়কেপ্পন না হলে, বিড়ি দিতে কাউকে কার্পণ্য করতেও দেখি নি।

সিনেমা দেখতাম বেশির ভাগ নিউ এম্পায়ার-র চারতলার ব্যালকনিতে। এক টাকা থেকে শুরু হয়ে, বাড়তে বাড়তে সেটা বোধ হয় দেড় টাকা অবধি হয়েছিল। নিউ এম্পায়ার-এ অতিরিক্ত বেনিফিট ছিল, রাজার মেজাজে সিগারেট খেতে খেতে সিনেমা দেখা। অন্যদিকে সেই একই সময় গ্লোব, লাইট হাউজ, যমুনা এই সব হলে ফ্রন্ট স্টল ছিল চার টাকা। এরপর খেতাম নিজামের বিফ রোল বা লাইট হাউজ থেকে গ্লোব যেতে গেলে রাস্তাটা টার্ন নিলে যে চানা বাটুরার দোকান আছে সেটায়। যমুনার সামনেও একটা দোকানে ভাল বিফ রোল বানাত।

প্রেম করাও বেশ খরচাপাতির ব্যাপার ছিল, তাই ওই পথে ভুলেও পা বাড়াইনি। তবে আমার মত পাগল-ছাগলের সাথে কেই বা ওই সব করবে।

যাই হোক এই ভাবেই প্রবল আর্থিক কষ্টে চার বছর কাটিয়ে, বি ই কলেজ লাইফ শেষ হয়েছিল।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আরেকটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল, সেটা অবশ্য বন্ধুদের পরামর্শে। সেই কঠোর জীবনের প্রবল আর্থিক কষ্টের চাপ নিতে না পেরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই অনেকগুলো দিন পরম শান্তিতে কেটে গেল।

লক ডাউনে পল্টুবাবু

পল্টুবাবুরা চার পুরুষের মাতাল। চার পুরুষটা ঠিক নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, তার বেশীও হতে পারে কিন্তু কম নয়। তবে পল্টুবাবুর প্রপিতামহ দারুকেশ্বরবাবু বরিশালের জমিদারি বিক্রি করে সেই টাকায় উৎকৃষ্ট আইরিশ জেমসন হুইস্কি ও শ্যাম্পেন কিনে সেলারে ভরেছিলেন। বঙ্গদেশে প্রথম সেলার উনিই বানিয়েছিলেন। এসব ঐতিহাসিক তথ্য অবশ্য আপনি ইতিহাসে পাবেন না। আরো অনেক প্রবাদপ্রতিম বাঙালির মত দারুকেশ্বরবাবুর নামও আত্মবিস্মৃত বাঙালি ভুলে গেছে।

গেছে কী! না, যায়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভায়, খোদ দারুকেশ্বরবাবুর গলায় গান বসিয়েছেন...

"কতকাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।"
বা
"দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।"

দারুবাবু (বার বার দারুকেশ্বর লিখে লিখে আঙুলে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। তাই এবার থেকে দারুবাবুই লিখব) মাতাল হলেও বেশ হিসেবি ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। শোনা যায়,'জাতে মাতাল,তালে ঠিক' প্রবাদ বাক্যটি ওঁকে নিয়েই বানানো। তা উনি অনেক মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বিবেচনা করে হিসেব করে দেখেছিলেন, যা মদের স্টক আছে তাতে ওঁনার তিন পুরুষ হেসে খেলে খেতে পারবেন।

তবে এ ক্ষেত্রে ওঁনার হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। দারুবাবুর ছেলে সোমকান্তি-বাবুর পান করার ক্ষমতা সম্বন্ধে ওঁনার কোনও ধারণাই ছিল না। তাই মাত্র দুই পুরুষেই সেই সেলার খালি হয়ে গেল। ফলস্বরূপ সোমকান্তিবাবুর ছেলে, জনিকুমারবাবুকে বাড়ির বাইরে অভিজাত বারে গিয়েই মদ খেতে হত। সকালে পাড়ার বন্ধুদের সাথে ওলি পাব আর সন্ধ্যেবেলা স্কুলের বন্ধুদের সাথে ট্রিনকাস। শোনা যায় কেজরিওয়াল দিল্লিতে যে অড-ইভেন ফর্মুলা লাগিয়েছিলেন, তার বেসিক আইডিয়াটা উনি জনিকুমারবাবুর থেকেই পান। আরও একটা ট্রিভিয়া এখানে দিয়ে দিই, অমিতাভ বচ্চনের শরাবি গল্পের স্ক্রিপ্ট নাকি প্রকাশ মেহরা জনিবাবুর থেকেই পান, মানে বেসিক আইডিয়াটা আর কী।

যাই হোক, এ হেন গ্লোরিয়াস উত্তরধিকার পল্টুবাবুও বেশ কিছুটা ধরে রেখেছেন। তবে পূর্বপুরুষদের মত, আইরিশ, স্কচ বা বার্বন হুইস্কি উনি এফোর্ড করতে পারেন না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনি রোজ সন্ধেবেলা (বা কখনো কখনো দিনের বেলা) গড়িয়ার এক প্রায়ান্ধকার বারে বসে ব্লেন্ডার্স প্রাইড খান।

তা একদিন এই পল্টুবাবুর কিডনিতে স্টোন ধরা পড়ল।

ডাক্তারবাবু সব দেখে অভিমত দিলেন, "পালং শাক একদম বন্ধ। আর প্রত্যেক দু ঘণ্টা পরপর এক গ্লাস জল খাবেন।"

পল্টুবাবু অবাক। "জল খাবো!! জল খাবো আমি!! আপনি জানেন আমি কে? আমার চার পুরুষে কেউ জল খায় নি। শুধু জল খেলে আমার পূর্বপুরুষরা আমায় ক্ষমা করবেন ভেবেছেন! ডাক্তারবাবু আপনি, জলটা চেঞ্জ করে বিয়ার করে দিন আর আইস কিউব করে দিন। আর প্রেসক্রিপশনেও লিখে দিন। লক ডাউনের মার্কেটে বাড়িতে বসেই মাল খেতে হচ্ছে, বউ বহুত হজ্জুত করছে স্যার। এবার থেকে দিনের বেলা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিয়ার আর সন্ধ্যে বেলা আইস কিউব দিয়ে ব্লেন্ডার্স প্রাইড। মাইরি বলছি, বউ যদি কিছু বলে, তাহলে আপনার প্রেসক্রিপশনটাই দেখিয়ে দেবো।"

বোরোলিনের সংসার

অনেক অনেক দিন আগে রিগলি সাহেব তো শিকাগোয় এক কাপড় কাচার সাবানের দোকান খুলে বসলেন। তা সে সাবান আর বিক্রি হয় না। তা উনি ঠিক করলেন সাবান কিনলে, বেকিং সোডা ফ্রি। কিন্তু দেখা গেল বেকিং সোডার ডিম্যান্ডটাই বেশী। তখন সাবানের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে উনি শুরু করলেন, বেকিং সোডার ব্যবসা।

কিছুদিন পরে আবার ব্যবসায় মন্দা এলে উনি বেকিং সোডার সাথে চিউইং গাম ফ্রি দিতে শুরু করলেন। ব্যাস!! সেই চিউইং গাম একদম সুপার হিট। বাকিটা যাকে বলে ইতিহাস।

তা বাংলায় কি কেউ কোনদিন কিছু ফ্রিতে দেয় নি? গৌরমোহন দত্ত, জি ডি ফার্মার প্রতিষ্ঠাতা, চ্যাম্পিয়ন শুটার সোমা দত্তের দাদু, শোনা যায় ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার খুশিতে এক লক্ষ বোরোলিনের টিউব ফ্রিতে বিলিয়ে দেন। বাকিটা ইতিহাস। এত ভালো মার্কেটিং স্ট্রাটেজি বাংলায় বিরল।

বোরোলিন বাংলা বিজ্ঞাপনের জগতে যাকে বলে কিংবদন্তি। সে শ্রাবন্তী মজুমদারের বোরোলিনের সংসার বা অতীব ক্যাচি jingle... 'সুরভিত এন্টিসেপটিক ক্রিম বোরোলিন' থেকে শুরু করে ঋতুপর্ণের 'বঙ্গ জীবনের অঙ্গ' বা 'জীবনের ওঠা পড়া যেন গায়ে না লাগে'... একের পর এক ইতিহাস তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু বেসিক ব্যাপার হল, এটি অতি জঘন্য, দুর্গন্ধময় প্রোডাক্ট। কিন্তু দারুণ মার্কেটিং-এর জোরেই উৎরে গেল।

সত্যি বলতে কি, ছোটবেলায় ওই জোড়া-হাতির লোগোওয়ালা ক্যাটক্যাটে সবুজ টিউবটার উপর আমার হেভি রাগ ছিল। শীতকালে খেলতে যাওয়ার আগে মা, প্রায় দুই মিলিমিটার পুরু, চ্যাটচ্যাটে বোরোলিন মাখিয়ে পাঠাতেন। আর খেলতে গিয়ে মাঠের যত ধুলো ওই বোরোলিনে চিপকে গিয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। বাড়ি ফিরে মুখ ধুয়ে আবার এক প্রস্থ চটচটে বোরোলিন।

তবে বোরোলিনের বিভিন্ন অন্যরকম ব্যবহারও ছিল। ডাক্ট টেপ নাকি এত বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে দুই সাহেব সাত ভলিউম বই লিখেছেন। তার মধ্যে একটা হলো Apollo 13 মিশনে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড কনভার্টার বলে একটা যন্ত্র খারাপ হয়ে যায়, তখন নাকি ডাক্ট টেপ দিয়েই ম্যানেজ করা হয়, আর তিন মহাকাশচারী বেঁচে বর্তে বাড়ি ফেরেন। তা এই বোরোলিন হচ্ছে বাংলার ডাক্ট টেপ।

আমি দু-চারটে দেখেছি ... মেয়েদের কপালের টিপের আঠা কমে গেলে একটু বোরোলিন লাগিয়ে টুক করে পরে নাও, সাইকেলে ছোট পাংচার হলে একটু বোরোলিন লাগিয়ে শুকিয়ে নাও, দু একদিন দিব্যি চলে যাবে, সাইকেলের চেন লুব্রিকেশন নেই বলে ঘরঘর শব্দ করছে? একটু বোরোলিন লাগিয়ে, প্যাডেল হালকা হালকা ঘোরাও, ফুটবল জলে ভিজে তারপর রোদে শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছে? একটু বোরোলিন মাখিয়ে নাও, বলের চামড়া একদম মাখনের মত নরম হয়ে যাবে। সেদিন প্ল্যান্টে একটা গিয়ার বক্স জ্যাম হয়ে গেছে। মেক্যানিকালের ছোকরা তেল টেল দিয়ে অনেক ট্রাই করছে... কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমি বললাম, একটু বোরোলিন দিয়ে দেখ, ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেটা পাশের দোকান থেকে সত্যি সত্যি দু-তিনটে টিউব কিনে গিয়ার বক্সে লাগালো...

... বাকিটা ইতিহাস।

স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কার ও কুমার গন্ধর্ব

কুমার গন্ধর্বের নাম তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু কুমার গন্ধর্বের কিংবদন্তি হয়ে পিছনে যাদের নাম স্মরণ করতে হয় তাদের মধ্যে একজন আলবার্ট স্কাটজ নামের এক আমেরিকান চাষীর ছেলে।

আলবার্ট ইসরায়েল স্কাটজ 1942 সালে Rutgers University থেকে সয়েল সাইন্স নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাস করে ওখানেই স্বনামধন্য প্রফেসর সেলম্যান ওয়াকসম্যানের অধীনে পিএইচডি শুরু করলেন।

এর কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ল। আলবার্ট যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু পিঠের ব্যাথায় কাবু হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন। এসেই আবার গবেষণায় যোগ দিলেন। সেই সময় মার্ক কোম্পানি বিশ্ববিদ্যালয়কে অফার দিল, টিবির জন্য এন্টিবায়োটিক বের করতে হবে। যে সময়ের কথা হচ্ছে, সেই সময় টি বি একটা মারণ রোগ ... প্রতি বছর, সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। এর ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে কাজ করাও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। প্রফেসর সেলম্যান ওয়াকসম্যান মার্ক কোম্পানির প্রস্তাব পত্রপাঠ না করে দিলেন। কিন্তু আলবার্ট স্কাটজ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও রাজি হয়ে গেলেন।

সেই সময় এলিজাবেথ বুগি নামের আর এক ছাত্রী সেই রিসার্চে যোগ দিয়েছিলেন। সাফল্য এলো বছর খানেকের মধ্যে। স্ট্রেপটোমাইসিন অবিষ্কার হল আর যক্ষা ও প্লেগের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিল। কিন্ত পেটেন্ট নেওয়ার সময় বুগির নাম বাদ পড়ল। তাকে বলা হল, "বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করো, পেটেন্ট নিয়ে কী করবে?"

প্রফেসর সেলম্যান ওয়াকসম্যান তখন আলবার্টকে বোঝালেন, "চলো ভাই পেটেন্টটা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করি। আমিও দিয়েছি।" কিন্তু আলবার্ট রাজি নয়। প্রফেসর ওয়াকসম্যান ভয় দেখালেন যে ভবিষ্যতে চাকরি বাকরি হবে না। নিমরাজি হয়ে শেষ পর্যন্ত আলবার্ট রাজি হলেন।

পরে জানা গেল, সেলম্যান 20 পার্সেন্ট রয়ালটি নিজের জন্য রেখেছেন। পরে অনেক মামলা মকদ্দমা হওয়ার পরে আলবার্ট স্কাটজ 2 পার্সেন্ট ও এলিজাবেথ বুগি 0.2 পার্সেন্ট রয়্যালটি পান। কিন্তু বছর দশেক পরে স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পেলেন সেলম্যান ওয়াকসম্যান। আলবার্ট স্কাটজ ও এলিজাবেথ বুগি বাদ। এদিকে ততদিনে ট্রাবল মেকার হিসেবে আলবার্টের প্রচুর বদনাম হয়ে গেছে। সারা জীবন সে রকম ভাল কিছুই করতে পারেন নি। যাই হোক,আবিষ্কারের ইতিহাস এরকম হাজার হাজার বঞ্চনার ইতিহাসে ভরা।

এদিকে দেখি ভারতে তখন কি হচ্ছে !

শিভাপুত্রা সিদ্ধারামাইয়া কমকালিনাথ কর্ণাটকের বেলগাঁওয়ের কাছে ১৯২৪

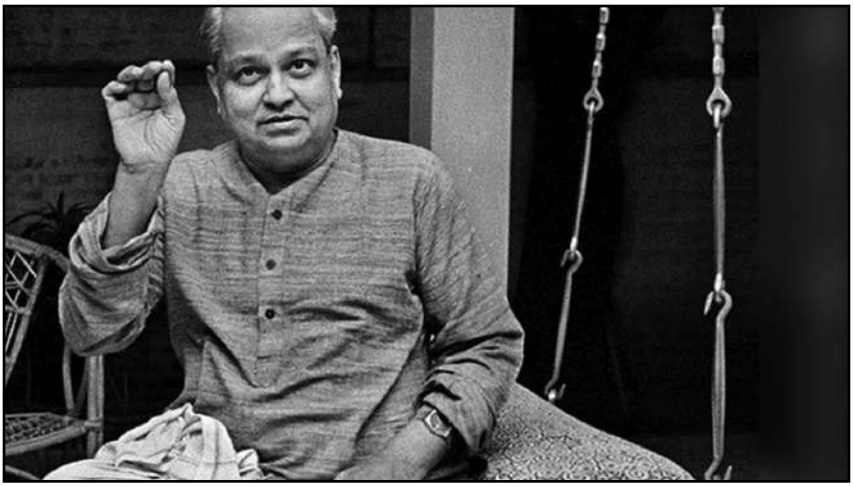

সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন মারাঠি নাট্য-সঙ্গীতের প্রাণপুরুষ বাল গন্ধর্বের খুব বড় ফ্যান। পাঁচ বছর বয়সের আগেই বোঝা গেল, শিভাপুত্রা একজন মিউজিক প্রডিজি। বছর দশেক বয়সে উনি স্টেজে গান গাওয়া শুরু করলেন। নাম নিলেন কুমার গন্ধর্ব। বাবা পাঠিয়ে দিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত মিউজিক টিচার বি আর দেওধরের কাছে। কুড়ি বছর বয়স হওয়ার আগেই উনি রীতিমত স্টার, এমনকি দেওধরের স্কুলে ক্লাসও নিচ্ছেন।

বছর কুড়ি পরে, যখন তিনি খ্যাতির মধ্য গগনে, কুমারের যক্ষা ধরা পড়ল। চলে গেলেন অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গা মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস-এ। গান গাওয়া একদম বারণ আর বাঁচার আশাও প্রায় নেই। কুমার গন্ধর্ব বিছানায় শুয়ে স্তব্ধতার গান শোনেন ... ঝরা পাতার শব্দ,পাখির গান, ভ্রাম্যমান গায়ক ভিখারির গান শোনেন। নিজে গুনগুন করে গান করেন কিন্ত সেটা মাথার মধ্যেই থাকে।

বছর ছয়েক পরে যক্ষা রোগের প্রথম ঠিকঠাক ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন ভারতে আসে। স্ত্রী ভানুমতীর সেবা শুশ্রূষায় ও স্ট্রেপটোমাইসিনের গুণে কুমার গন্ধর্ব ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। যদিও একটা লাংস পুরো অকেজো, কিন্তু আবার গান গাওয়া শুরু করলেন। গানের ধরণও বদল হয়ে যায় ... লোকগীতির প্রভাব পরে গানের স্টাইলে।

শুরু হল কুমার গন্ধর্বের সেকেন্ড ইনিংস, যা প্রথম ইনিংস এর থেকে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক, তাঁর অনবদ্য স্টাইলের জন্য।

কুমার গন্ধর্ব নামটি তাঁকে প্রদান করা একটি উপাধি। হিন্দু পুরাণে গন্ধর্ব মানে একটি সঙ্গীতের চেতনা।

ফুটকি রাণী ও মুনু'বাবু

©অসীম দেব, ১৯৭৭ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

রাজস্থানে ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছেন মুনুবাবু। এখানে এই প্রথমবার। কোল ইন্ডিয়ার উচ্চপদে থেকে রিটায়ার করে হাতে এখন অফুরন্ত সময়। বারান্দায় বাগান করেন, সাহিত্য, সোসাইটির রিপাবলিক ডে, টিভিতে স্পোর্টস দেখা, ঘুরে বেড়ানো, পাড়ার অন্য রিটায়ার্ড লোকেদের সাথে আড্ডা মারা, এসব কাজেই উনার নিজের সময় কেটে যায়। এখন সস্ত্রীক ছেলে বৌমার কাছে বেড়াতে এসেছেন। ছেলেও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, এখানের মাইনস-এ কাজ করে। অন্যদিকে কোল ইন্ডিয়ায় কাজের সূত্রে এখানের বেশ কয়েকজনের সাথেও মুনুবাবুর পূর্ব পরিচয়ও আছে। সেই কারণেও মুনুবাবুর এখানে আসার একটা আকর্ষণ তো ছিলই।

মাইনস-এর লাগোয়া কলোনি। এখানে বেড়াতে এসে মুনুবাবু নিজের মতনই আছেন। মর্নিং ওয়াক করেন। টিভি দেখেন, ক্লাবে গিয়ে বই নিয়ে আসেন, পরিচিতদের সাথে আড্ডা মারেন। বারান্দায় বাগান শুরু করেছেন। আর বাজার সরকারের দায়িত্ব ছেলের থেকে কেড়ে নিয়ে এখানে নিজেই করেন। সে আলু বেগুন হোক, বা টুথপেস্ট সাবানই হোক, বা ধোপার বাড়ির কাপড় হোক।

আজ রবিবার। চা খেয়ে সকালে বাজারে এসেছেন। খুব একটা কিছু কিনতে হবে না, তবুও অভ্যাস মতন এসেছেন, এদিক ওদিকে ঘুরে দেখছেন। যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে কিনেও নেবেন। দোকানের গিয়ে জিনিষপত্র দেখছেন। ঠিক তখনই এক মহিলা দোকানের কেনাকাটা শেষ করে পয়সা মিটিয়ে ঘুরেই সামনে মুনুবাবুকে দেখে, "ও মা গো, আপনি এখানেও?" বলেই চোখ উল্টে মূর্ছা গেলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলেই হতভম্ব। সব থেকে করুণ অবস্থা মুনুবাবুর। মুনুবাবুর বদ্ধমূল ধারণা যে উনি মুনুবাবুকেই নিজের সামনে দেখে আতঙ্কে চমকে উঠে বলেছেন, "ও মা গো, আপনি এখানেও?" ছোট জায়গায় মোটামুটি সকলেই একে অন্যের পরিচিত। তারাই ধরাধরি করে ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গেল, বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আর মুনুবাবু হঠাৎই নিষ্প্রভ, যাকে বলে ফিউজড হয়ে গেলেন। "ও মা গো, আপনি এখানেও?" এই কথাটার সাথে মুনুবাবুর অনেক পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

বাড়ি ফিরে মুনুবাবু ব্যাপারটা চেপে গেলেন, কাউকে কিছু বললেন না, তবে নিজের মনের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

মুনুবাবু ব্যাপারটা চেপে গেলেও কেসটা চাপা থাকল না। সোমবার সকালে মুনুবাবুর ছেলে নন্দন অফিসে এসেই তাঁদের জিএম মিসেস ফুটকি রাণীর থেকে জরুরী তলব পেল, এখনই এসে দেখা করে যাও।

"এসো, কাম ইন। আচ্ছা নন্দন, তোমার বাবা মিস্টার গুহ যে এসেছেন, তুমি তো আমাকে জানাওনি।"

নন্দনের মনে পড়ে গেল, মিসেস ফুটকি রাণী বলেছিলেন, যে বাবা এলে আগে থেকেই যেন জানিয়ে রাখি। সেকথা মনে ছিল না, কিন্তু ভাবল এত সিরিয়াস কি এমন ব্যাপার আছে যে বাবা এলে আগে থেকেই জানিয়ে রাখতে হবে? আর উনি জানলেনই বা কীভাবে যে বাবা এখানে এসেছেন?

"কি? ভুলে গেছো তো?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম, সরি, ভুলে গিয়েছিলাম, আমি আজকেই বাবাকে গিয়ে বলব। আপনি কবে আমাদের কোয়ার্টারে আসবেন বলুন?"

"আরে না না না না, এখন এসব একদম নয়। পরে হবে, পরে হবে।"

এতগুলো "না" "না" এক সঙ্গে শুনে নন্দন ঘাবড়ে গেল।

"আগে বলো, তোমার বাবা এখানে কতদিন থাকবেন?"

"বাবা তো বলছে, একমাস থাকবে। আমরা বলছি এতদিন বাদে এসেছ, অন্তত দু'মাস তো থাকা উচিৎ।"

"না না না, একদম আটকাবে না, জোর করবে না। জোর করে কাউকে আটকে রাখতে নেই।"

ম্যাডামের কথাগুলো নন্দনের অদ্ভুত লাগল। বাবা কতদিন ছেলের কাছে থাকবে, সে ব্যাপারে উনি কেন বলবেন? কিন্তু সে আর কথা বাড়ালো না।

"ঠিক আছে ম্যাডাম, আর আপনি কবে আমাদের বাড়ি আসবেন বলুন?"

"না না। সে পরে হবে, আগে তুমি আমাকে জানাও মিস্টার গুহ এখানে কতদিন আছেন। ঠিক আছে? বুঝেছ?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি আপনাকে বাবার প্ল্যান জানিয়ে দেবো।"

"কালকে সকালের মধ্যেই আমাকে জানাবে। এবার আর যেন ভুলে যেও না।"

ম্যাডামের কথায় যেন একটা আদেশ ছিল। নন্দন কেবিনের বাইরে এসে ভাবতে শুরু করল, কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। বাড়ি ফিরে বাবাকে মিসেস ফুটকি রাণীর কথা বলতেই বাবাও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। এবার বলা নেই কওয়া নেই, "শোন নন্দু, বাগানের গাছের ঠিকমতন যত্ন হচ্ছে না, আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।"

"মানে? তুমিই তো বাগানের কাজ করছ। কিসের অযত্ন?"

"আরে, তোর এই রাজস্থানের বাগানের নয়, আমি কলকাতায় নিজের বারান্দার

বাগানের কথা বলছি। ভাবছি আগেই ফিরে যাবো।"

"মানে?"

"এক মাসের রিটার্ন টিকিট আছে, সেটাকে পনেরো দিনের করে নেব।"

নন্দন এবার নিঃসন্দেহ যে কিছু একটা গোলমাল আছে।

"মিসেস রাণীকে বাড়িতে কবে ডাকবো?"

"এখন নয়, কিছুদিন পরে।"

"কেন? এখন ডাকলে কী হবে?"

"না, বলছি তো, এখন নয়। কয়েকদিন পরে ডাকিস।"

বাবাকেও কেমন যেন অসহিষ্ণু মনে হল।

পরদিন সকালে নন্দন আর ভুল করল না। ফুটকি রাণীর তলব আসার আগেই সে গিয়ে দেখা করল। "ম্যাডাম, বাবা বলছেন দিন পনেরো পরেই ফিরে যেতে চান।"

ম্যাডামকে যেন খুশী মনে হল। "পনেরো দিন? আর ইউ সিওর?"

"হ্যাঁ, তাই তো বলছেন।"

"টিকিট হয়ে গেছে?"

"না, সেটা একমাস পরের।"

এবার মিসেস ফুটকি রাণী রেগে গেলেন। "তুমি কি আমার কথা বোঝো না? ফাজলামি করছ? বলছো পনেরো দিন, কিন্তু টিকিট কাটা একমাস পরের। কাল বলেছো দু'মাস ধরে রাখতে চাও? কোনটা ঠিক?"

নন্দন জানেই না কি জবাব দেবে। আরও একটু হোম ওয়ার্ক করে আসা উচিৎ ছিলো। মিসেস রাণীও কী যেন ভাবছেন।

"ওয়েল, সো ইট ক্যান বি এনিথিং বিটুইন ফিফটিন ডেজ, মে বি স্ট্রেচড টু ট্যু মান্থস। রাইট?"

"ইয়েস ম্যাডাম।"

"দু'মাসের বেশি হবে না তো?"

"না না, তার বেশি বাবা এখানে থাকবেই না।"

"সো, ম্যাক্সিমাম ট্যু মান্থস ইজ সেফ, ট্যু কনসিডার হিজ স্টে?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, তার বেশি হবে বলে মনে হয় না।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।"

"আর ম্যাডাম, আপনি কবে আমাদের বাড়ি আসছেন?"

"নট নাও, নট নাও, তবে জানিয়ে দেবো।"

নন্দন চলে এল। কিছু রহস্য নিশ্চয়ই আছে। ব্যোমকেশ বা ফেলুদাকে ডাকতেই হবে। তবে সবার আগে বাবার পেট থেকে কায়দা করে আসল কথাটাও বার করতে হবে। নন্দন দুপুরে লাঞ্চে কোনদিন বাড়ি আসে না, সেদিন বাড়িতে এল।

"বাবা, তুমি কী ঠিক করলে?"

"না রে, গাছের প্রচণ্ড অযত্ন হচ্ছে। অনলাইনে টিকিট কিনে ফেললাম। এইবার পনেরো দিনের বেশি থাকা হবে না। পরের বার গাছের ভালো ব্যবস্থা করে এসে অনেকদিন থাকব।"

"টিকিট করে ফেলেছ? আমাদের সাথে কথা না বলেই?"

নন্দন কী আর করে। মা'র অভিযোগ, "হঠাৎ কী যে মাথায় চাপলো? কাল সকাল থেকেই বলছে গাছের অযত্ন আর গাছের অযত্ন।"

নন্দন লাঞ্চের পরে মিসেস রাণীকে খবরটা দিতে গেল, নইলে উনি নিজেই হয়তো তলব করে বসবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে বোঝা গেল রহস্য আরও গভীরে। মিসেস ফুটকি রাণী পার্সোনাল এমার্জেন্সি কারণে আড়াই মাসের ছুটিতে চলে গিয়েছেন। প্রয়োজনে এক্সটেন্ডও হতে পারে। বাড়ি ফিরে বাবাকে খবরটা দিতেই মুনুবাবু যেন জেগে উঠলেন। "শোন নন্দু, আমারও খারাপ লাগছে, যে এতদূর থেকে এসে এইভাবে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবো? ভাবছি টিকিট রিশিডিউল করে আরও কিছুদিন থেকেই যাই।"

ব্যাস, আর বলতে হবে না, বিরাট কিছু রহস্য আছেই আছে। এবার তাহলে ব্যোমকেশ বা ফেলুদা'কে ডাকতেই হবে।

ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গেলেন মুনুবাবু।

মুনু তখনও "বাবু" হয়নি। বছর তিনেক আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ধানবাদের কাছে ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এনসিডিসি মাইনস এ চাকরি করছে। কখনও মাইনসে, কখনও ডিজাইন অফিসে। সেই সময় ফুটকি রাণী নামের একটি মেয়ে এসে মুনু'র ডিপার্টমেন্টেই জয়েন করে, এবং প্রথম দিনেই ফুটকিকে দেখে মুনু'র ভালো লেগে যায়। ফুটকি স্মার্ট সপ্রতিভ মেয়ে, খুব ভালো বাংলা বলে, কিন্তু মুনু তাঁর সাথে আলাপচারিতার সুযোগ পায় না।

মুনু খবর পেয়েছে ক্লাবের রবীন্দ্র জয়ন্তী ফাংশানে ফুটকি রক্তকরবী নাটকের একটা ছোট্ট রোলে অভিনয় করবে। খবর পেয়েই মুনু নাটকের নির্দেশক কেষ্ট দাশগুপ্তকে গিয়ে ধরেছে, কেষ্টাদা, প্লিজ একটা রোল দাও। মিনিট খানেক হলেই চলবে, শুধু এই ফুটকির সাথে স্টেজে একান্তে কয়েক মিনিট চাই। কেষ্টাদা বোঝালেন, এইভাবে হয় না, রবিঠাকুরের নাটক, যখন তখন ডায়লগ বা দৃশ্য ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। আর তাছাড়া ফুটকিও শুধু একটা সীনে ঘুরে বেড়াবে, কোন ডায়লগ নেই। "চলবে, চলবে কেষ্টা'দা। আমি ডায়লগ চাই না, শুধু স্টেজে কিছুক্ষণের জন্য একান্তে ফুটকিকে চাই।"

রোজ অফিসের পরে কেষ্টাদাকে চা, শিঙ্গারা, ডিমের চপ খাইয়ে মুনু অবশেষে কেষ্টাদাকে রাজি করিয়েছে। কেষ্টাদা ভাবছে, যদি ডায়লগই না থাকে, ক্ষতি কি? মুনুকে একজন শ্রমিকের রোলে পার্ট দেওয়াই যায়। "তাহলে তোকে শুধু মিনিট

দু'য়েক দনাদ্দন গাঁইতি চালাতে হবে, আর একটাও ডায়লগ নেই, মনে রাখবি। পারবি তো?"

"পারবো, পারবো। তখন ফুটকি কোথায় থাকবে?"

"আমি ম্যানেজ করে ওঁকে স্টেজে ঢুকিয়ে দেবো। তবে হ্যাঁ, তুই খনির শ্রমিক, মুখে গায়ে কিন্তু কালিঝুলি মাখতে হবে। পারবি?"

"পারবো, পারবো। আর রিহার্সাল?"

"শুধু মিনিট দুয়েক দুমদাম গাঁইতি চালাবি, রিহার্সালের কী আছে?"

নাটকের দিনে মুখে গায়ে নিকষ কালো রঙ লাগিয়ে মুনু তৈরি, কেষ্টাদাকে ধরে তিন-চারটে সীনে সে শুধুই গাঁইতি চালাবে। সবকটায় এক মিনিটের মতন। আর একটাই মাত্র অন্ধকারের সীনে ফুটকি স্টেজে থাকবে।

নাটক হয়ে গেল। মুনু প্রতিটা সীনে মন-প্রাণ ঢেলে দনাদ্দন গাঁইতি চালিয়েছে। আর অন্ধকারের সীনে ফুটকি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার নাটকের শেষে মুনু ফুটকিকে খুঁজছে। কেষ্টাদা বলল, "ও তো হস্টেলে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি যা, রাস্তায় হয়তো পেয়ে যাবি।"

"এখনই? এই মুখে কালি ঝুলি মেখে?"

"তাহলে এক কাজ কর, এই চাদরে মুখ ঢেকে দৌড় লাগা। রাস্তায় পেয়ে যাবি।"

বাইরে এসে মুনু মেয়েদের হস্টেলের দিকে দৌড় লাগাল। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। কলোনির রাস্তায় লোকজন কম। কেউ মুনুকে দেখছে না। দূর থেকেই মুনু ফুটকিকে দেখতে পেয়েছে। আজকে মুনুর অনেক সাহস, মনে বল পেয়েছে। কোন জড়তা নেই। ডাকলো, ফুটকি, ফুটকিইইইইইইই ...

নিজের নামে ডাক শুনতে পেয়ে ফুটকি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে দূর থেকে অন্ধকারে চাদর মুড়ি দিয়ে একটা লোক আসছে। ভয়ে সে হাঁটার স্পীড বাড়িয়ে দিলো। ওদিকে মুনুর মনে আজ আর কোন ভয়ডর নেই। সে দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ফুটকির সামনে দাঁড়াতেই ফুটকি সেই অন্ধকারে সাদা চাদরের ভেতর নিকষ কালো একটা মুখ দেখে ভয়ে, বাবাগো, মাগো বলে সেখানেই অজ্ঞান।

আর মুনু? প্রেমের অভিযানে এরকম ক্লাইম্যাক্স যে হবে সে ভাবেনি। যদিও কলোনির ভেতরেই, চোর ডাকাতের ভয় নেই, তবু এই নির্জন অন্ধকারে ফুটকিকে তো এভাবে একা ফেলে পালিয়ে আসা যায় না। হয় তাঁকে হস্টেলে বা নইলে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। ফুটকিকে সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে হাসপাতালেই গেল। খানিক জলের ঝাপটা দিতেই ফুটকি জ্ঞান ফিরে চোখ খুলে মুনুকে দেখেই "ওরে বাবাগো, এখানেও?" বলে আবার অজ্ঞান।

পরদিন মুনুর ডাক পড়ল, অফিসের এইচ আর ডিপার্টমেন্টে। রুমে পাঁচজন আছেন, দু'জন এইচ আর, একজন মুনুর ডিপার্টমেন্টের আর অন্য দুজন অচেনা।

মুনু ওঁদের চেনে না, উনারাও মুনুকে চেনেন না, মানে নিউট্রাল লোক।

"Mister Guha, is it true that last night you chased Miss Futki in the dark?"

"Yes Sir, that's fact but" ...

প্যানেল থামিয়ে দিলো

"Why?"

"Sir, I just wanted to talk."

"Okay, but why at that late night? Why was it so urgent? And with such make-up? You wanted to frighten her?"

মুনু বুঝলো যে কেসটা অন্যদিকে চলে গেছে। অনেক অনুনয় বিনয় করে গোটা ব্যাপারটা বলল, ফুটকির প্রতি নিজের দুর্বলতাও। প্যানেল ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিল যে মুনু আর কোনোদিন এভাবে অফিস কলিগ বা কলোনির ভেতরে কোন মেয়েকে তাড়া করবে না।

কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্যরকম। যদিও ফুটকি জেনে গেছে যে সেই রাতের কালি মাখা লোকটা ওরই ডিপার্টমেন্টের মুনু, তবু পরদিন আবার অফিসে সামনা সামনি দেখা হতেই ফুটকির কী যে হল। "ও মা গো, আবার আপনি" এই বলে ফুটকি অজ্ঞান।

ম্যানেজমেন্টকে বলে ফুটকি রাতারাতি আসানসোলে ট্রান্সফার নিয়ে চলে এল। এবার সে নিশ্চিন্ত যে মুনুর সাথে আর মুখোমুখি দেখা হবে না।

বছর চারেক বাদে, মুনুর বিয়ে হয়ে গেছে, সকালের ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে সস্ত্রীক ফিরছে। ফুটকিরও বিয়ে হয়ে গেছে, নিজের অফিসেরই কলিগের সাথে। ট্রেনে এক্কেবারে মুনুর সামনের সীটে, মুখোমুখি। "বাবাগো, কোথায় যাবো? এখানেও..." ফুটকি অজ্ঞান।

বছর দশেক বাদে, কলকাতায় এক সেমিনারে একই দৃশ্য, "এখানেও আপনি..." অজ্ঞান।

এরপর ফুটকি দূর রাজস্থানে চলে এসেছে, আবার যদি দেখা হয় সেই ভয়ে। কিন্তু এখানে এসেও...

মুনুবাবুর স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ সব শুনল। স্ত্রী বললেন, "তাহলে ইনিই তোমার সেই ফুটকি?"

আর বৌমাও মুখ খুলল, "বাবা, আপনি তো রাস্তায় যাওয়ার সময় সাদা চাদরে মুখের কালিঝুলি মুছে নিতে পারতেন।"

"হ্যাঁ, পারতাম, কিন্তু তবে পরে অনেক ভেবেছি। মুখের কালি পরিস্কার করে গেলে তোমার শাশুড়ি, মানে আমার এখনের এই বৌকে আর কি পেতাম?"

সুধীন বাঁড়ুজ্যের কৌতূহল

©নীলাদ্রি রায়, ১৯৮৩ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

সুধীন বাঁড়ুজ্যের কৌতূহল রোগটার শুরু ছেলেবেলা থেকেই।

বালক বয়সে - যখন গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে পড়তেন - তখন মুরগির ঘরে উঁকি দিতে গিয়ে নাকে মোরগের ঠোকর খেয়েছেন। প্রদীপের শিখার ভেতরে কী আছে জানতে গিয়ে আঙ্গুল পুড়িয়েছেন। একবার তো গাছে ভিমরুলের চাক হয়েছে শুনে, রুল বস্তুটি কী এবং কেন যে তা ভীমতুল্য, সে বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে... সে কথা না হয় থাক!

তবে এসবে সুধীনবাবুর শিক্ষা হয়নি। হবার প্রবৃত্তিও ছিল না। প্রাইমারি শেষ করে গঞ্জের হাই স্কুলে পড়ার সময় হেড-স্যার ইংরিজি পিরিয়ডে পড়িয়েছিলেন, "কিউরিওসিটি কিলড দি ক্যাট।" সুধীনবাবু তা শুনে পরম সন্তোষে নিজের মনে ভেবেছিলেন – 'তাতে আমার কি? আমি তো আর বেড়াল নই!' মোদ্দা কথা, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল কমে তো নি-ই; অনুসন্ধিৎতা বরং বেড়েই চলেছে। রাস্তা চলতেও নিজের চরকায় তেল দিয়ে সোজাসুজি চলতে পারেন না। যেখানে-সেখানে এতটুকু ভিড় দেখলেই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে, কনুই ঠেলে, অন্য লোকের পা মাড়িয়ে, নিজের গলাটি বাড়িয়ে, নাকখানা গলিয়ে দেন। কী হচ্ছে সেটা না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই।

এহেন কৌতূহলী মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার যথাসম্ভব পরিপূর্ণ থাকবে এটাই আশা করা যায়। সুধীনবাবুর মায়েরও তাই আশা ছিল। জ্ঞানের ভাণ্ডারও ভরাই ছিল – অগাধ বই পড়তেন; দরকারি-অদরকারি নানান হাবিজাবি তথ্য গিজগিজ করত মাথার ভেতর। কিন্তু মায়ের আশায় ছাই দিয়ে সুধীনবাবু কর্মজগতে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। কলকাতায় চলে আসার পরেও, ছোট-খাটো চাকরি যদি বা জোটে, কোনোটাই বেশিদিন টেঁকে না। কেন, তা সুধীনবাবু জানেন না। নিন্দুকেরা বলে এর জন্য ওঁর অতি-কৌতূহলই দায়ী। সুধীনবাবুর তা মনে হয় না। এই তো সেদিন – এই আগের চাকরিটায় বড় সায়েব পি জি বিশ্বাসের টেবিলে রাখা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানটা পড়ে নিয়েছিলেন বলেই না ফ্র্যাঙ্ক-রশে হজমের ওষুধ কেনবার সময়ে সায়েবকে ঢুকতে দেখে তরিঘরি গলা চড়িয়ে ঝন্টুকে হাঁক দিয়েছিলেন, "ওরে! স্যারের প্রিপ্যারেশান-এইচ মলমটা আগে পেড়ে দে!" পাজি বিশ্বাস তবুও যে কেন সুধীনবাবুর চাকরিটা খেলেন, তা ভগবানই জানেন! মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

শেষ-মেষ সুধীনবাবু ওঁর দূর সম্পর্কের এক উকিল-পিসেমশাইয়ের তদবিরে,

আলিপুর কোর্টে পেয়াদার চাকরি পেলেন। কাজ গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে লোকজনকে আদালতের শমন ধরিয়ে দেওয়া। মহকুমা আদালতে 'সুবিচার' না মিললে আজকাল গ্রামের লোকেও কলকাতায় মামলা ঠুকে দেয় বইকি। তবে সে মামলার প্রতিবাদী যদি দূর গাঁয়ের অধিবাসী হয়, তাকে শমন ধরাতে কেউ বড়-একটা যেতে চায় না। সুধীনবাবু পেটের দায়ে যান; তাই চাকরিটা তাঁর বজায় আছে।

তবে চাকরিটা সম্বন্ধে সুধীনবাবুর কোনো অভিযোগ নেই। শমন ধরাবার কোনো কোটা নেই; ধরাবার কোনো নির্ধারিত সময়সীমাও নেই। শমন ধরাবার নিয়ম হল যে, যার জন্য শমন, তার হাতেই ধরাতে হবে। বাড়ির দাওয়ায় ফেলে আসা বা অন্য কারো হাতে দেওয়া চলবে না। সুধীনবাবু যদি বলেন যে প্রতিবাদী বাড়ি ছিল না, সেকথা সত্যি না মিথ্যে তা দেখবারও কেউ নেই। সময়ের যখন হিসেবে নেই, তখন কৌতূহলী মানুষের তো পোয়া বারো! সুধীনবাবু নিজের হিসেব মতো কাজ করেন – পথে যা-ই তাঁর কৌতূহলী মনকে হাতছানি দেয়, উনি তার ডাকেই সাড়া দেন। কাজ যে করেন না তা নয়, তবে কৌতূহলকে বঞ্চিত করে নয়।

এমনি করেই দিব্বি দিন চলছিল। তারপর, হঠাৎ একদিন নিশ্চিন্দপুর পেরিয়ে ঠগীরতলা গায়েঁ শমন পৌঁছে দেবার কাজ পড়ল। বর্ধমান স্টেশনে নেমে আরো মাইল বিশেক বাসে গিয়ে নিশ্চিন্দপুর, তারপর ঝাড়া পাঁচ মাইলের হাঁটা পথ ঠগীরতলা। গায়েঁর নাম শুনে বহুদিনের পুরানো ঝানু পেয়াদা, পশ্চিমা রামভরোসে বলল, "থোড়া সামহালকে যাইবেন বাবু! হামি শুনিয়েছে, বড়ে বদমাশ ঠগী লোগোঁকে গাঁও আছে ওহ। ঠগী চিনেন তো? মুসাফির কো মার কর সামান লুট লেতে হ্যায় – সামান নহি রহনসে ভি কভি-কভি সির্ফ মজে লেনেকে বাস্তে মার দেতে হ্যায়! সাঁঝকে বাদ কভি না রহনা উখানে।"

শুনে সুধীনবাবুর ভেতরকার জ্ঞান-ভাণ্ডারটা একটু যেন নড়েচড়ে উঠল। সুধীনবাবু ঠগী সম্বন্ধে অবশ্যই জানেন। এও জানেন যে শ্লীম্যান সাহেব ১৮৩৯ সালেই বাংলা থেকে ঠগী একেবারে নির্মূল করে ছেড়েছিলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'রামভরোসেটা কী অজ্ঞান লোক রে বাবা! তবে সাবধানের মার নেই, আমি বরং সকাল সকাল কাজ সেরে ফিরে আসবো।'

করলেনও তাই। হাওড়া থেকে ভোর ছটায় ট্রেন ধরে বর্ধমান। সেখান থেকে মেঠো রাস্তায় পৌনে ঘণ্টা ঝরঝরে বাসে চড়ে, তারপর তিন ঘণ্টা ধরে আলের রাস্তা ধরে হেঁটে, সাড়ে বারোটার মধ্যেই পৌঁছে গেলেন ঠগীরতলা। প্রতিবাদী বেজন মল্লিকের বাড়ি খুঁজতে বিশেষ বেগ পেতেও হল না। তবে শমন হাতে পেয়ে বেজন মল্লিকের মুখের ভাব দেখে আর দাঁড়াতে সাহস করেননি। কোনো মতে শমন হাতে গুঁজে দিয়েই উল্টোমুখো হলেন।

নিশ্চিন্দপুর থেকে বর্ধমানের বাস সন্ধে ছটায়। তিন ঘণ্টার ফিরতি হাঁটা পথের জন্য

প্রায় ডবল সময় হাতে। তবুও পা চালিয়েই চললেন সুধীনবাবু। না, ঠগীর ভয়ে নয় – বেজন মল্লিক যদি তাড়া করে সেই ভয়ে। এই সমস্ত তেপান্তরের পারের জায়গায় আদালতের পেয়াদার অন্য রকমের ভয় আছে বটে; খুন করে পুঁতে ফেললে প্রতিবাদী আর শমনকে ডরায় কেন? 'কোন পেয়াদা? কিসের শমন? আমি তো কিছুই পাইনি!'

ঘণ্টাখানেক হনহন করে হাঁটার পর সুধীনবাবু খানিকটা আস্বস্ত বোধ করলেন। বেজন মল্লিক পিছু নেয়নি; আশঙ্কা অমূলক। স্বস্তির নিঃশাস ফেলে তাঁর বরং রামভরোসের ওপর রাগ হতে লাগল, অহেতুক ঠগী-ভয় দেখানোর জন্য। তবে রাগ করতে গিয়ে নিজেই নিজের ওপর হেসে ফেললেন – তিনিও তো এই একবিংশ শতাব্দীতে ঠগীর ভয়ে সেই কোন কাক-ভোরে বাড়ি ছেড়ে বার হয়েছেন!

আল বরাবর পাঁচ মাইল পথে একটি মাত্র স্থান, যেখানে দুই ক্ষেতের মাঝে প্রায় আধ মাইল লম্বা একটি জলা। ক্ষেত নেই, তাই আলও নেই। জলার ধার দিয়ে সরু রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে সুধীনবাবু হঠাৎই অনুভব করলেন যে চারিদিক যেন ভীষণ গা-ছমছম নীরব হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে গেল যে ঠগীরতলা যাবার সময়ও এই জায়গাটিতে ঠিক এই রকমটাই মনে হয়েছিল। তখন তাড়া ছিল, তাই বিশেষ ভাববার সময় পাননি। ভাবলে তখনই খেয়াল করতে পারতেন যে বাকি পথে সর্বক্ষণ গাছের পাতার ভেতর দিয়ে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে, হালকা হাওয়া বইবার যে একটা আবছা, অস্পষ্ট মর্মরধ্বনি শোনা যায়, এখানে তা একেবারেই অনুপস্থিত। ভর দুপুরেও সুধীনবাবুর গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। সকালে, যাবার পথে, বড়জোর দু-তিনটি লোকের দেখা পেয়েছিলেন। হঠাৎই অনুধাবন করলেন যে ঠগীরতলা ছাড়ার পর থেকে একটি জনমনিষ্যিও চোখে পড়েনি। সুধীনবাবুর হৃদস্পন্দন ধাপে ধাপে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। মাথার ভেতর কে যেন বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে লাগল, "ঠিক দুপ্পুর বেলা – ভূতে মারে ঢেলা!"

আর বেশিক্ষণ এভাবে চললে কী হত তা বলা মুশকিল, কিন্তু আর দু-পা এগোতেই সুধীনবাবু যেন ধরে প্রাণ পেলেন। ঐ তো, জলার ধারে একটি লোক! চেনা বা অচেনা, কাউকে দেখে সুধীনবাবু কোনোদিন এতো খুশি হয়েছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। খুশির সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর আবার রাগও হলো একটু – কেন মিথ্যে অমন ভয় পাচ্ছিলেন! পরক্ষণেই অবশ্য সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল রামভরোসের উপর। হতভাগা খোট্টাটা খামোকা ভয় ধরিয়ে না দিয়ে থাকলে এমনটা কখনো হয়!

অন্য প্রয়োজন না থাকলেও, কেবল হৃদস্পন্দনটিকে কায়েদা করার অভিপ্রায়ে গলা খাঁকারি দিয়ে লোকটিকে আওয়াজ দিলেন সুধীনবাবু, "ও ভাই, শুনছেন?"

উত্তর পাওয়া গেল না। মায়, লোকটি যে ডাকটা শুনতে পেয়েছে, এমন কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না। 'কালা নাকি রে বাবা!' আরেকটু এগিয়ে গেলেন সুধীনবাবু।

কী আশ্চর্য্য – এ যে গভীর মনোযোগ দিয়ে আপনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে! কী বলছে বুঝতে পারা না গেলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লোকটি যা বলছে তা এতোই নিবিষ্ট মনে বলছে, যে বেশ বাজখাঁই গরু-খোঁজা ধরণের ডাক না দিলে সাড়া পাওয়া অসম্ভব! সুধীনবাবু এবার গলাটা কয়েক পর্দা চড়িয়ে হাঁক দিলেন,

- "ও মশাই, শুনছেন!"

- "বিড়বিড়, বিড়বিড়, বিড়বিড় ..."

সুধীনবাবু এবার অপমানিত বোধ করতে শুরু করলেন। এতো জোরে ডাকলে শুনতে না পাওয়ার কথা নয়। তারপর, তাঁর মনে হল, আচ্ছা, শুনতে না পাওয়াটা হয়তো শুধু তাঁকে অবজ্ঞা করার ব্যাপার নয় – 'লোকটা যদি সত্যিই কালা হয়?' কিন্তু সুধীনবাবু পড়েছেন, যে যারা জন্ম-কালা, তারা নাকি বোবাও হয়, কারণ, যে ভাষা তারা শুনতে পারে না, সে তারা বলতে শিখবে কী করে! 'তাহলে লোকটা কথা বলছে কী করে? আর ব্যাটা বলছেটাই বা কী?' সুধীনবাবু কৌতুহলী হলেন। এগিয়ে গেলেন আরো দু পা।

বিড়বিড়ানি এবার একটু স্পষ্ট হল। সুধীনবাবু অবাক হয়ে শুনলেন যে লোকটি একাগ্রচিত্তে জলার জলের পানে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে, "একুশ, একুশ, একুশ, একুশ, একুশ..."

'পাগল নাকি রে বাবা?' লম্বা, সিড়িঙে চেহারা, পরণে একটা শতছিন্ন খাটো মলিন ধুতি, একমুখ দাড়ি – আর চুলে যে কতদিন তেল-জল পড়েনি তার হিসাব নেই। বয়স পঞ্চাশ, না দুশো বছর, বোঝা দায়! 'আর জলের দিকে তাকিয়ে একুশ-একুশ করে গুনছেটাই বা কী?' সুধীনবাবু আরেকবার চেষ্টা করলেন। লোকটার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন,

- "ও মশাই, একুশ একুশ করে কী গুনছেন – মাছ?"

- "একুশ, একুশ, একুশ, একুশ, একুশ..."

সুধীন বাঁড়ুজ্যের কৌতূহল আর বাঁধ মানলো না। লোকটির বিড়বিড়ানি অগ্রাহ্য করে নিজেই ঝুঁকে পড়লেন জলের কিনারায়।

বাতাসে ঝটিতি একটা তড়িৎগতি আন্দোলন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন চোখের সামনে একহাত সাদা কাপড় বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠল। পরমুহূর্তেই অনুভব করলেন গলায় এঁটে বসেছে এক বজ্রফাঁস। পিছন থেকে, কোমরে হাঁটু গেড়ে দিয়ে কে যেন আসুরিক শক্তিতে টেনে ধরেছে গলায় পেঁচানো রুমালখানি।

মট্ করে একটা শব্দ। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ঝপাস!

জলার ধারের লোকটি তখন জলের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে বিড়বিড় করে বলে চলেছে, "বাইশ, বাইশ, বাইশ, বাইশ, বাইশ..."

কলেজ কেটে বাবাজীর কাছে আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য

©বিপুল চক্রবর্তী ১৯৮৬ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়ে হোস্টেল (সেনগুপ্ত) ঢুকতে প্রায় রাত ৮-৩০ হয়ে গেল। বিকেল ৪টে নাগাদ বেরিয়েছি, কাঁকুরগাছিতে একটা টিউশনি করে এই হোস্টেলে ঢুকছি। মাসে ২০০ টাকা করে পাই, গোবর্ধনদার ক্যান্টিন আর হাতখরচ (মানে ওই একটু আধটু নেশা) হয়ে যায়, মা ২০০ টাকা দেয়, তাতে মেস ডিউস হয়ে যায়, মাসের শেষ, পকেটে মাত্র ১০ টাকা পড়ে আছে। পাশের ঘরে দেখলাম গেজেল গেজেল মানে অভিজিত বোস, থার্ড ইয়ার সিভিল, এসে গেছে। লোকে আমাদের মানিকজোড় বলে। কলেজের প্রথম দিন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব, আমি থাকতাম ১০ নম্বর হস্টেলে, গেজেল ৮ নম্বরে। ফার্স্ট ইয়ারে টেস্ট এর সময় আমি হোস্টেল চেঞ্জ করে ৮এ চলে এলাম, প্রোক্টর জিজ্ঞাসা করলে বললাম, 'স্যর, ওখানে মাসতুতো দাদা থাকে, তাই প্রপার গাইডেন্স এর জন্য ওখানে যেতে চাই', দাদার নাম কি? বললাম গৌতম মিত্র (৮৪ সিভিল), থার্ড ইয়ার সিভিল, ব্যস এপ্রুভড। হোস্টেল ৮এ চলে এলাম। প্রোক্টর নিশ্চয়ই এত আদর্শবান ছেলে দেখে খুশী হয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার গেজেল আর আমার যে বেসিক চরিত্র, সেটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মানে লম্বা ছেলের বেটে বউয়ের মত। তবু আমরা সবসময় একসাথেই থাকতাম।

নাথু মানে অমিত নাথ (৮৫ সিভিল) আর অশেষদা (৮৫ সিভিল) এসে হাজির, গেজেল ও পাশের ঘর থেকে এল, অশেষদা বলল, তোরা রেডী হয়ে নে, আমাদের একটু বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হছে। জানতে চাইলাম, কোথায়? নাথু বলল, দেখাই যাক না, স্টেশনে যে ট্রেন পাব তাতেই উঠে পড়ব, তোরা রেডি হয়ে নে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, কোথায় যাবো ঠিক নেই, একটা ট্রেন পেলেই হল? আর তাছাড়া হাতে মাত্র ১০ টাকা আছে। গেজেল জানালো ওর কাছে ১২ টাকা হবে, আরও সব মিলিয়ে ৪৫ টাকা হল। একবার যখন পুরকি উঠেছে, যেতেই হবে। ডাইনিং রুমে সবাই খেতে গেলাম। অমিত নাথ ৪র্থ ইয়ার সিভিল, সাউথ পয়েন্ট স্কুল-এর ছেলে, স্মার্ট এবং ডেয়ারিং, ভাল গীটার বাজায়, ধুমকি করতে ভালবাসে, যদিও আমার থেকে এক বছর সিনিয়র, আমরা নাম ধরেই ডাকি। অশেষ ঘটক বর্ধমানের ছেলে, বুদ্ধি করে চলে, একটু ভাটানো বা বোর করার স্বভাব আছে, খোরাকি চরিত্র। অশেষদার গল্প করলে কয়েকটা ছোট গল্প হয়ে যাবে। সেটা না হয় অন্যদিন করা যাবে।

হাওড়া পৌছালাম প্রায় রাত সাড়ে ১০টায়। প্লাটফর্মে একটা মেল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, গ্রিন সিগনাল হয়ে গেছে, গার্ড সবুজ পতাকা নাড়ছে। কোন ট্রেন জানি না, আমরা দৌড়ে গিয়ে জেনারেল ডাব্বায় উঠলাম, ট্রেন ছেড়ে দিল। বসার জায়গা নেই, বাথরুমের সামনেই বসে পড়লাম। গেজেল পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে, সেখান থেকে দুটো হ্যাশ আমাকে দিয়ে ও সিগারেট খালি করতে লাগল, আমি হ্যাশ দুটোকে একটু পুড়িয়ে ওকে দিলাম, পোড়ানো হ্যাশ দুটো তামাকের সাথে মিক্স করে আবার সিগারেটে ঢুকাতে লাগলো। সিগারেট দুটো ধরান হল। ধুমকি করে মাথাটা একটু ছাড়ল। খোঁজ নিয়ে জানলাম এটা দুন এক্সপ্রেস। আরও জানলাম, সকালে হাজারীবাগ স্টেশনে দাঁড়াবে, তাহলে ওখানেই আমরা নামবো। সারা রাত তাস খেলে আর ধুমকি করে কেটে গেল, টিকিট এর ব্যাপারই নেই, ভোর ৫টা নাগাদ হাজারীবাগ স্টেশনে আমরা নামলাম।

স্টেশন ফাঁকা, জনা কয়েক লোক নামল। সকালে বেশ ঠাণ্ডা, ছোট ছিমছাম স্টেশন, বেশ ভাল লাগছে, কয়েকটা কুলি প্লাটফর্মে বসে কল্কে ধরাচ্ছে। অশেষদা বলল, ভাইসাব বাবা কা প্রসাদ থোরা মিলেগা? ওদের একজন বলল কিউ নেহি? বৈঠিয়ে। একটু সম্ভ্রম করেই বসাল, গাঁজা খাওয়ার এটা অদ্ভুত নিয়ম, যেহেতু শিবের প্রসাদ তাই কেউ কখনও না করে না। আমরা প্লাটফর্মে বাবু হয়ে বসে যোগদান করলাম, হঠাৎ দেখি দুটো পুলিস এদিকেই আসছে, দেখলাম আমাদের পাশেই বসে গেল, আর আমার পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাঁহাসে আয়ে বাবু? বললাম কলকাত্তা সে। বহুত আচ্ছা, বলে সে কল্কেটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল, আমি কল্কেটা পুলিসকে পাস করে দিলাম, সে মনের সুখে টান লাগাল, আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আরও দু রাউন্ড হল, বেশ ফুরফুরে লাগছে, কুলিদের সাথে বেশ দোস্তি হয়ে গেছে, আমরা কোথায় থাকি, কী করি, ওদের অনেকেই কলকাতা গেছে, বড়িয়া শহর, এইসব আলোচনা চলছিল। নাথু জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কাছে বেশী পয়সা নেই, এখানে বিনা পয়সায় কোথায় খাবার পাওয়া যেতে পারে? ওরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে জানাল, স্টেশন থেকে দু ক্রোশ দূরে হনুমানজির মন্দির আছে, ওখানে রোজ ভোগ লাগে, কোনো পয়সা লাগবে না।

কুলি ও পুলিস ভাইদের টাটা করে আমরা মন্দিরের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে হাঁটছি, যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আউর থোড়াসা জানে কা বাদ মিলেগা, কিন্তু সেই থোড়াসা, আর আসে না। এক গাছতলায় বসে একটু বিশ্রাম নিলাম, নিজেদের একটু রিচারজ করে আবার হাঁটা শুরু করে ৪০ মিনিট পরে হনুমানজির মন্দিরে পৌঁছলাম। ভিতরে ঢুকে আমরা অবাক। বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে সেই মন্দির। পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, মাঝখানে লাল মাটির

রাস্তা, রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছ, খানিক গিয়ে একটা গোল আইলান্ড, যেখানে বিভিন্ন ধরনের রঙ বেরঙের ফুল, ডান দিকে সাড় দিয়ে খড়ের চালের কুটির আর বাঁদিকে মন্দির। পিছনে আনেকটা জায়গা নিয়ে বিভিন্ন সবজির ফলন হয়েছে, যেন তপোবন। একজন জিজ্ঞাসা করল আপনারা কাকে খুঁজছেন? নাথু বলল, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ি, প্রসাদ কি পাওয়া যাবে? উনি জানালেন যে বাবাজি এখন পূজা করছেন, শেষ হলেই আমরা প্রসাদ পাবো। আরও বললেন, পাশেই নদী একটু ঘুরে আসুন।

মন্দিরের সীমানার বাইরে একটু গিয়েই দেখলাম খরস্রোতা নদী 'বর্ষাতি' বয়ে চলেছে। ওপারে সবুজ গাছপালা, বড় বড় পাথর নদীর পাড়ে, অপূর্ব দৃশ্য, দুচোখ ভরে সৌন্দর্য উপভোগ করছি। পিছুটান, বন্ধন সব কিছুর থেকে মুক্ত, যেন মুক্ত বিহঙ্গ, এত কষ্ট করে আসা সার্থক লাগছে। নদীর ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুলাম, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করলাম, পাথরের গায়ে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে রেস্ট নিচ্ছি, চোখ বুজে আসছে, একটু তন্দ্রা মত এসে গেছে। কিন্তু পেটে খিদেয় আগুন জ্বলছে, তাই আবার সকলে মন্দিরে চলে এলাম।

মন্দিরের সামনে বাবাজির চেলারা বসে আছে, একজন খুব যত্ন করে গাঁজা বানাচ্ছে, চন্দন কাঠের গুঁড়ো আতর ইত্যাদি মেশাচ্ছে। অবশেষে বাবাজি এলেন।

বয়স দেখে বোঝা যাচ্ছে না, ৭০-৮০ হবে, পরনে একটা পাতলা নেংটী, মাথায় জটা, মুখ সৌম্য, শান্ত, এক তপস্বী ভাব, চোখের দৃষ্টিতে একটা গভীরতা, বেশীক্ষণ

তাকানো যায় না। সবাই উঠে নমস্কার করল, বাবাজিও আশীর্বাদ ভঙ্গিতে সবাইকে দেখে বসলেন। কল্কেতে আগুন জ্বালিয়ে মোক্ষম দুটো টান মেরে চেলাদের হাতে কল্কে দিয়ে দিলেন প্রসাদ স্বরূপ। আমাদের টার্ন এল, আমরাও খিদে ভুলে মোক্ষম টান লাগালাম বাবাজীর প্রসাদ।, খুব স্মুথ, টানতে কোন অসুবিধা হল না, বাবাজি চলে গেলেন, এক চেলা এসে আমাদের কচুপাতায় করে কিছু ফল, মিস্টি, ছাতু, ও চা দিয়ে গেল, আমরা গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। জীবনে অনেক সুস্বাদু খাবার খেয়েছি কিন্তু এত তৃপ্তি বোধহয় কোনো খাবার খেয়ে হয়নি। কুয়ো থেকে তুলে জল খেলাম। অশেষদার সবসময়ই একটা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব, বলল, আমরা দুপুরে এখানেই খাব, চল বাবাজীর সাথে একটু ভাটিয়ে আসি, কী বলে একটু শুনি। এক চেলা যাচ্ছিল, নাথু বলল বাবাজির সাথে একটু দেখা করার ইচ্ছে। সে বলল আচ্ছা দেখছি, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। সে ঘুরে এসে আমাদের একটা ঘর দেখিয়ে দিলো। আমরা সবাই বাবাজির ঘরে ঢুকলাম, বাবাজি আসনে বসে আছেন। ঘরের কোনে এক খাটিয়া। আমাদের পায়ের শব্দে চোখ খুললেন। আমরা হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। বাবাজী হিন্দিতে বললেন, কলেজের ছাত্র, অ্যাডভেঞ্চার করতে বেড়িয়েছিস?

আমরা মাথা নাড়লাম। বাবাজী বললেন দুপুরে ভোগ খেয়ে যাস। আমরা সকলেই যেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাবাজী কি অন্তর্যামী?

অশেষ'দা সেই পরিচিত স্বরে বলল, বাবাজী আমাদের কিছু জ্ঞানের কথা বলুন। বাবাজী বললেন, যদিও তোদের কানে এখন এসব ঢুকবে না, জানি তোরা শুধু আমাকে খুশী করতে চাইছিস, তাই তো? তবু বলছি শোন। বাবাজী বেশ কিছুক্ষণ অনেক কথা বললেন, যেটা মনে আছে তাই বলছি।

প্রথমত বললেন, আমাদের শরীর এবং আত্মা দুটো পৃথক সত্তা, শরীর হল ভৌতিক সত্তা, যা শেষে একমুঠো ছাইয়ে পরিণত হবে, আর আত্মা হল শক্তি বা এনার্জি, যার কোনও ক্ষয় বা লয় নেই, জন্ম নেই মৃত্যু নেই, এটা সাইন্সও বলে, বলে তো?

আমরা মাথা নাড়লাম।

"এর মধ্যে তুই কোনটা? আমরা কী বলি? আমার শরীর না আমি শরীর? তাহলে আমি যদি শরীর না হই তবে আমি কে? (অকাট্য যুক্তি, আমরা সবসময় বলি, আমার হাত, আমার পা, আমার মাথা, কিন্তু আমি মাথা বলি না, বা আমি শরীর বলি না, তাহলে আমিটা কে?) আমি হচ্ছে শক্তি, বা আত্মা, নিজেকে আত্মা ভাববি শরীর নয়, তাহলে মৃত্যু ভয় থাকবে না। জীবনে সব ভয় জয় করতে পারবি। কোনো দুঃখ থাকবে না। দ্বিতীয়ত- আমরা সবাই পরম পিতার সন্তান, তার ইচ্ছেয় এই জগৎ সংসার চলছে, রোজ অন্তত একবার করে তাকে স্মরণ করবি, তিনিই সমস্ত বিপদ

থেকে রক্ষা করবেন। তৃতীয়ত- তোরা চিন্তায় যে বীজ পুতবি ভাল বা মন্দ, সেই ফল পাবি, যদি সুখ, শান্তি, আনন্দ পেতে চাস তাহলে স্মৃতিতে বা মনে এই চিন্তাই রাখিস, তবেই সবাইকে সুখ, শান্তি, আনন্দ দিতে পারবি এবং রিটার্নে তাই পাবি, আর কাউকে দুঃখ, রাগ বা ঘৃণা দিলে সেটাই ফেরত পাবি, নিউটনের ৩য় সুত্র জানিস তো?

সত্যি অবাক হলাম, গোটা ব্যাপারটা এমন সহজ যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দিয়ে বোঝালেন, বেশ ভাল লাগলো।

এরপর বললেন যা রেস্ট নে। দুপুরে ভোগ খেয়ে যাস, চেলাকে ডেকে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে বললেন, আমরা আমাদের জন্য রাখা কটেজ-এ এলাম। মাটিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুম ভাঙল ডাকাডাকিতে, খাবার রেডী হচ্ছে, স্নান করে আসতে হবে। খিচুড়ি আর একটা তরকারি ছিল। খিচুড়ি তো নয় যেন অমৃত, শেষপাতে একটু পায়েসও ছিল।

খাবার পর সবাই আবার কটেজে এলাম, আমার খুব ইচ্ছে করছিল বাবাজীর সাথে আরও একবার দেখা করি, এক অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি অনুভব করছিলাম

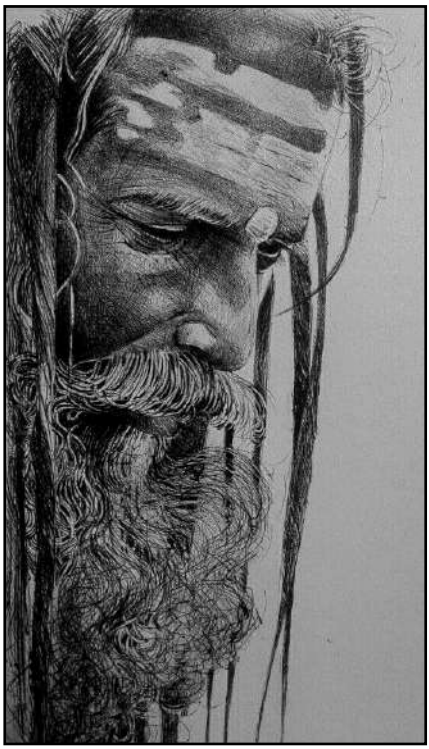

যেন আমাকে টানছে, সোজা ওনার ঘরে চলে এলাম। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলাম। বাবা বললেন, আমি জানতাম তুই আসবি, তোর সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হবে, ভাল চাকরী, গাড়ী, বাড়ী সব হবে। এবার সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম, বাবাজী কি করে জানলো আমি কী চাইছি? আমার চোখে জল এসে গেল। আমার পকেটের ১০ টাকা বাবার পায়ে রেখে নমস্কার করলাম। আরও বিস্মিত হলাম বাবাজী যখন বললেন, আমি খুশী হয়েছি, তুই পকেট খালি করে আমাকে দক্ষিণা দিলি। এই বলে ১০ টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

এবার বাবাজীকে আমি মোক্ষম প্রশ্ন করলাম, আপানার সন্ন্যাস জীবনের আগের কথা যদি বলেন। বাবা বললেন, ও আমার মনে নেই। আমি বাবার পা দুটো ধরে বললাম, প্লিজ বাবা বলুন আমার খুব

জানতে ইচ্ছে করছে, নাহলে পা ছাড়ব না। বাবা বললেন, আচ্ছা পা ছাড়।

বাবা শুরু করলেন— উত্তরপ্রদেশে এক গ্রামে গরিব ঘরে আমার জন্ম, বাবা ছিলেন চাষি, কিন্তু মা আমাকে নিয়ে খুব স্বপ্ন দেখতেন, তিনি চাইতেন আমি পড়াশোনা করি। সেই মত আমি সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করে মুম্বাইতে চাকরি পাই, কিছুদিন বাদে বিয়েও হয়, কিন্তু মুম্বাইতে থাকার জায়গার অভাবে বউকে গ্রামে রাখতাম, ছমাস অন্তর আসতাম, বউকে খুব ভালবাসতাম। এর মধ্যে বাবা ও মা দুজনেই মারা গেলেন, এই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আমি এমন খবর পেলাম যে আমি শোকে দুঃখে দিশাহারা হয়ে গেলাম, শুনলাম আমার বউ আর আমারই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি পাগলের মত সব কিছু ছেড়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম, নাওয়া নেই, যখন যা পেয়েছি খেয়েছি, খালি পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। এরকম বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে কখন কোথায় গেছি এখন মনেও নেই, শুধু হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে আমি বসে ছিলাম, এটা মনে আছে। তারপর যখন জ্ঞান এল দেখলাম আমি এক আশ্রমে শুয়ে আছি, এক সাধু আমার সেবা শুশ্রূষা করছেন। সুস্থ হলে তিনি আমাকে দীক্ষা দেন, তিনি আমাকে যা ভালবাসা দিয়েছেন তা দুর্লভ, মা বাবাও বোধহয় এতো ভালবাসা দিতে পারে না। আমার সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা উনি লাঘব করে দিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ ২০ বছর গুরুজির সেবা ও তপস্যা করেছি। ওনার শরীর ছাড়ার পর আমি সারা ভারত ভ্রমণে করে শেষে এখানে এসে আশ্রম বানাই।

এবার আরও একটা প্রশ্ন করলাম, নিজেকে আত্মা কীভাবে visualize করব? বাবাজি প্রশ্নটা শুনে খুশী হলেন, বললেন, দুই ভ্রু এর মাঝখানে একটা জ্যোতিরবিন্দু বা তারা কল্পনা করবি।

বাবাজীকে প্রণাম করে আমি কটেজে ফিরে এলাম। অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা, আনন্দ ও বিস্ময় আমার মন তোলপাড় করছিল। অবশেষে যাবার সময় এসে গেল, এত সুন্দর মনোরম, শান্ত পরিবেশ ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। তাছাড়া আশ্রমের সবাই আমাদের সাথে এমন আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছে বিশেষ করে বাবাজী, মনে হচ্ছে আর কটা দিন থেকে গেলে ভাল হত।

সন্ধ্যেবেলা হাওড়াগামী ট্রেনে উঠে বাবাজীর সৌম্য, শান্ত মুখটা চোখের সামনে ভাসছিল, খালি মনে হতে লাগল আমি শরীর নই, আমি দুই ভ্রু এর মাঝখানে এক জ্যোতিরবিন্দু, অক্ষয়, অমর। এক অন্যরকমের ভালো লাগার এক নিরন্তর ফল্গুধারা আমার মধ্যে বইতে লাগল।

People

©Shruti Goswami, 2004 Architecture and Planning

He lied.
Day after day
Year after year.
To save me from disappointment.
I am not sure, but I do think,
I would rather be disappointed with honesty than be hurt with lies.
Nobody deserves it.

People change. Nature also, changes.
People don't go back to being
What they were.
Nature comes back.
Every season, every summer and winter.
It's different, every minute, second, month and year,
Yet, it feels oddly familiar, comforting.,
Like a warm hug.
The rains touch me in the same way
It has done, for centuries before I was born
And will continue, long after I am no more.

Life, is never familiar
Death, is never a pain
It's sure, certain, more than life itself.

Lies and hurt are like people.
They never come back the same way again.

A Soldier's Kiss – (যুদ্ধ নয় শান্তি চাই)

©অনুবাদ- সোহম দাশগুপ্ত, ১৯৭৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

যুদ্ধের আসল চেহারা না দেখলেও এই দৃশ্যগুলোর ভয়াবহতা কিছুটা হয়তো আন্দাজ করা যায়। যুদ্ধের থীমে Alfred Lord Tennyson এর একটি কবিতার (Home They Brought Her Warrior Dead) উপর আমার অনুবাদ মনে পড়ে গেল।

She nor swooned, nor uttered cry:
All her maidens, watching, said,
'She must weep or she will die.'
Then they praised him, soft and low,
Called him worthy to be loved,
Truest friend and noblest foe;
Yet she neither spoke nor moved.
Stole a maiden from her place,
Lightly to the warrior stepped,
Took the face-cloth from the face;
Yet she neither moved nor wept.
Rose a nurse of ninety years,
Set his child upon her knee—
Like summer tempest came her tears—
'Sweet my child, I live for thee.'

অনুবাদ –
তার যোদ্ধার নিষ্প্রাণ দেহ ওরা নিয়ে এলো ঘরে;
মূর্ছা গেল না সে, কেঁদেও দিল না সাড়া,
সঙ্গিনী ছিল যারা, সবাই উতলা স্বরে –
বলে, "কাঁদতেই হবে ওকে, নয় শোকেই যাবে ও মারা।"
তারপর নীচু স্বরে তারা প্রয়াতের নানা প্রশস্তি করে,
বলে, মানুষটা বড় প্রিয় ছিল সকলেরই,

বন্ধুও ছিল খাঁটি মতে বা মতান্তরে;
তবু, রইলো সে নির্বাক, নিথর মুরতি ধরি।
মৃদু পায়ে ভিড় ঠেলে, তারই এক সঙ্গিনী
নীরবে দাঁড়ালো এসে যোদ্ধার দেহপাশে,
সন্তর্পণে সরালো চাদর, খুলে দিল মুখখানি;
তবুও পাষানী নিথর, আজ কান্না ভুলেছে সে।
অবশেষে এক নব্বই পার ধাইমা এগিয়ে গিয়ে
শিশুটিকে তার নিয়ে, দিতেই মায়ের কোলে,
কালবৈশাখী ধারা নামলো দুচোখ বেয়ে –
"বাঁচি আজ তোরই তরে, ওরে আমার প্রাণের ছেলে।"

Fear
By Khalil Gibran

It is said that before entering the sea
A river trembles with fear.

She looks back at the path she has travelled,
From the peaks of the mountains,
the long winding road crossing forests and villages.

And in front of her,
She sees an ocean so vast,
That to enter
There seems nothing more than to disappear forever.

But there is no other way.
The river can not go back.
Nobody can go back.
To go back is impossible in existence.

The river needs to take the risk
Of entering the ocean
Because only then will fear disappear,
Because that's where the river will know
It's not about disappearing into the ocean,
But of becoming the ocean.

ভয়

©অনুবাদ- সোহম দাশগুপ্ত

মোহনায় এসে নদী নাকি কেঁপে ওঠে ভয়ে।
পিছু ফিরে চায় প্রবাহিনী,
যে পথে শৈল শিখর হতে অরণ্য পার-
গ্রাম, লোকালয় ছুঁয়ে আঁকাবাঁকা পথে এসেছে বয়ে।

আজ সমুখেই তার প্রতীক্ষারত-
দিগন্ত বিস্তৃত সাগর অপার,
অবশেষে চিরতরে লীন-
হবার সে দিন, আজ বুঝি সমাগত।

বিকল্প নেই আর তার।
ফিরবার পথ জানেনা তো নদী।
ফিরতে পারেনি কেউ আজ অবধি।
অস্তিত্বই নেই সেই রাস্তার।

সমুদ্রে প্রবেশের ঝুঁকি নদীকে নিতেই হবে আজ
ঠিক তখনি তো কেটে যাবে ভয়,
তখনই তো জানবে নদী- সাগরের বুকে সে তো নিঃশেষ নয়।
এ যাত্রা সমুদ্রে নয় হারাবার,
এ মিলন নদী থেকে সাগর হবার।

Charlotte Dod – The Superstar of Women's Sports

©Kuntala Bhattacharya, 1999 Electronics &
Tele Communication Engineering

An incredible skater, a superstar in the world of women's sports, five times winner of Wimbledon singles championship; yes, it's none other than Charlotte Dod. An iconic character, often known as "Lottie," had defied all odds to dominate the so-called "not a lady-like game" and emerge victorious elegantly.

> *"As a rule, ladies are too lazy at tennis. They should learn to run and run their hardest, too, not merely stride. They would find, if they tried, that many a ball, seemingly out of reach, could be returned with ease; but instead of running hard they go a few steps and exclaim, Oh, I can't and stop." – That were the words from Charlotte, and she hit no excuses to stride ahead in achieving her feats in the world of tennis.*

Born on 24th September 1871 at Bebington in Cheshire (North England) to Joseph and Margaret Dod, she was the youngest of the four children. Her siblings excelled in sports and she herself was an excellent tennis player, ice skater, golfer, and a billiards player. Being a privileged member of an affluent family, she could pursue tennis from a tender age of nine in the tennis courts built near the family estate. Several Wimbledon champions frequented the parties organized by Dod family, an opportunity for Charlotte to mingle with tennis stalwarts and instill a fascination for the game.

Her international tennis career began 1883 when she participated in the Northern Championships in Manchester at the age of eleven. From then on, she continued participating in tournaments. Her brilliant performances, both for the doubles and singles events earned her the nickname of "Little Wonder". With significant number of wins, and

her ingenious master strokes gaining accolades, Charlotte played her first Wimbledon championship in 1887. After a bye in the first round, she sailed smoothly throughout the entire championship to defeat Blanche Bingley, the defending champion. She was only 15 and half years old then, but she was indomitable. Charlotte went on dominating the tournament for seven years, winning the doubles championship at Wimbledon from 1886 to 1888 and the mixed doubles in 1889 and 1892.

Women playing tennis during her times had to undergo so many challenges in adhering to the rigid customary attire. The corsets, long sleeves, and long skirts were handicap in their movements, but Charlotte was granted freedom, approval to wear her striking uniform which resembled a school dress. Her unconfined uniform was truly one of the trump cards against her opponents. Her movements around the tennis court were rapid, and reciprocations were swifter compared to others. Many tend to argue whether the cue to her victory was her unfettered outfit. But the arguments were fruitless when matched with her aggressive playing style. Being 5'6" tall, she super specialized in 'smash' hits. In fact, she was the first women to play such hard forehand strokes, hence an unbeatable opponent to play with. Her ground strokes were praised by many, in comparison to her contemporaries.

"Dod always spoke up in favor of the right of women to dress in a manner that did not impede their tennis." Tennis historian Elizabeth Wilson had said this in her interview with The Canberra Times

Charlotte Dod retired from active tennis tournaments at the age of 21. She then focused on other sports in which she excelled too. Her zeal was to inculcate the love for sports within the women folks. She started playing field hockey in 1897 and continued till 1900; but sciatica attacks restricted her mobility and participation in the game. Charlotte also played golf, and played many championships, and won the British national golf championship in 1904.

In 1905, Charlotte shifted to Newbury at Berkshire along with her brothers. It was at this place, Dod manifested her love for archery. She

participated in the British Olympics and the Grand National, winning the silver medal in archery in 1908.

Dod was also an outstanding figure skater. In 1895, she cleared the Ladies Skating test at St. Moritz, a winter sports resort quite prominent among English travelers. The event at St. Moritz was the most esteemed championship for women with Dod being the second women to clear it with honor. She was invited as a judge in many international figure skating competitions. Besides skating, she also went for toboggan rides and curling, two other winter sports, with her brother Tony. The duo ascended many mountains in England and Norway.

Though Charlotte concluded her career in active sports approximately after 1911, yet her zeal to remain active was unstoppable. During the first World War, she was the member of the British Red Cross and was involved in serving the nation. She was awarded a Service medal for her dedicated service as a nurse.

Such was her passion and deep affection for sports especially tennis, that she never missed attending any of the Wimbledon championships. Her name has been recorded in the Guinness Book of Records along with fellow golf player and athlete Babe Zaharias, recognizing her as the most versatile female athlete of her times.

She moved to London and Devon along with her brother Willy and continued to reside there until her brother died in 1954. She continued serving as a nurse throughout her life. During her death at the age of 88, she was at the Birchy Hill Nursing home in Hampshire listening to the radio broadcasts of Wimbledon. A legend she was who upheld her craze for tennis till the end of her life, not to part even during her final journey to heaven. A messiah for the women sport's fraternity, Charlotte Don will always be remembered and revered by all in high regard.

In 1983, Dod's name was added to the International Tennis Hall of Fame to honor her stupendous contribution to the sport of tennis.

ওরা থাকে ওধারে

©মনোজ কর, ১৯৮০ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

গঞ্জের স্টেশন থেকে আরও পাঁচটা ছোট স্টেশন ছাড়িয়ে ছ'নম্বর স্টেশনটা তালডাঙ্গা। বাঁদিকে আরও মাইল পাঁচেক গেলে মৌবনি গ্রাম। গত কয়েক বছরে রেললাইনের ডানদিক বরাবর অনেক নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি, বাজার দোকান তৈরি হয়েছে। তামার খনিতে কাজ করে এখানকার বেশিরভাগ লোক। সেই থেকেই গড়ে উঠেছে গঞ্জের অর্থনীতি। আর বাঁদিকটা রয়ে গেছে আগের মতই। সরকারের নজর নেই এদিকে, তাই রাস্তাও ভালো নয়। রাস্তা জুড়ে লাফাতে লাফাতে চলে ভ্যানরিক্সা।

এই মৌবনিরই এক ছোট্ট মাটির বাড়িতে বড়সড় সংসার লছমির। পোশাকি নাম লছমিরানি ডোম। এই মৌবনিতেই জন্ম। এ অঞ্চলে শ্মশান বলতে একটাই। ওর বাবা শিবু ছিল তালডাঙ্গা শ্মশানের ডোম। দাহকার্যই ছিল বংশানুক্রমিক পেশা। গরিবগুর্বোরা গ্রামের সীমান্তে খোলা মাঠেই মৃতদেহ দাহ করে আর সেই দাহকার্যতেও ডাক পড়ত শিবু ডোমের মানে লছমির বাবার। শিবুর তিন মেয়ে, কোনও ছেলে ছিল না। বড় দু'জনের শিবু বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, মৌবনি থেকে বেশ দূরেই। অন্যদিকে তালডাঙ্গা হাসপাতালের সুইপার বিষ্টু দাস ছিল শিবুর বন্ধু। বিষ্টুর ছেলে নারানের সঙ্গে লছমির প্রেম ভালোবাসা ছিল। বন্ধুর ছেলে বলে শিবু ব্যাপারটাকে প্রশ্রয়ও দিত। লছমির মায়েরও খুব একটা আপত্তি ছিল না। দু'মেয়ে দূরে থাকে। ছোটটার যদি কাছেপিঠে বিয়ে হয় মন্দ কি? বিয়ে দেবার কথা ভাবলেও নারানের সঙ্গে লছমির বিয়েটা দেখে যেতে পারেনি শিবু। পনের দিন লিভারের অসুখে ভুগে মরে গিয়েছিল শিবু। লছমি পরে ওর মায়ের কাছে জেনেছে অসুখটা অনেকদিন থেকেই বাসা বেঁধেছিল শিবুর শরীরে। কিন্তু কাউকে কিছু বলেনি। এখন বোঝে লছমি কেন শিবু মারা যাওয়ার মাস দুয়েক আগে ডেকে তাকে বলেছিল, 'লছমি, আমার পেশাবিদ্যে কাউকে দিয়ে যেতে পারলুম না। বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে দাহকার্যের বিদ্যে পেয়েছি আমি। আমার আক্ষেপ এই বিদ্যে আমি আমার বংশের কাউকে দিয়ে যেতে পারলুম না। আমাদের পেশাবিদ্যেয় মেয়েদের কোনও অধিকার নেই। তাই এ বিদ্যে কোনও মেয়েকে কেউ দেয়নি আজ পর্যন্ত। আমি অনেক ভেবে ঠিক করেছি তোকেই দিয়ে যাব এই বিদ্যে।'

লছমি বলেছিল, 'আমার কোনও ডর নেই তাতে। কিন্তু কী লাভ হবে এই বিদ্যে শিখে? মেয়েদের কি এই কাজে কেউ ডাকবে? বাপের কাছে শেখা বিদ্যে ঘরে পচে নষ্ট হবে।'

শিবু বলেছিল, 'তোকে পয়সা রোজগার করতে হবে না এই বিদ্যে দিয়ে। এই বিদ্যে বাঁচিয়ে রাখবি নিজের বুকের মধ্যে। তোর ছেলে যখন বড় হবে তাকে দিয়ে দিবি এই বিদ্যে। পরম্পরা বাঁচিয়ে না রাখলে জাতধর্ম রক্ষে হবে কী করে?'

চুপ করেছিল লছমি। মুখরা লছমি মুখে মুখে সেদিন আর তর্ক করতে পারেনি। লছমিকে চুপ করে থাকতে দেখে শিবু হাসতে হাসতে বলেছিল, 'মেয়ে বলে দুঃখ করিসনি লছমি। আমি মরলে আমার মুখে আগুন দিয়ে, লাশ চিতেয় তুলে দাহ করবি তুই। বাপের শেখানো বিদ্যে দিয়ে বাপের অন্তিম কাজ তুইই করবি।'

কেঁদে ছুটে পালিয়েছিল লছমি। গ্রামের প্রান্তে যে মাঠে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেখানে কতক্ষণ বসেছিল কে জানে। বিকেলবেলায় শিবু এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, রাগ ভাঙ্গিয়ে লছমিকে ঘরে নিয়ে যায়। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও চোখ জলে ভেসে যায় লছমির। দাহকর্মের পদ্ধতি শিখতে শিখতে শিবুর কাছে সে এও শিখেছে এ বিদ্যে শুধুমাত্র লাশ পোড়ানোর বিদ্যে নয়। শোকতপ্ত সন্তান সন্ততি প্রিয়জনেরা তাদের পিতা, মাতা, পরমাত্মীয়ের অন্তিম সৎকারের দায়িত্ব তুলে দেয় তাদের হাতে। শ্রদ্ধায়, সম্মানে তাঁর অন্তিমযাত্রা নিশ্চিত করাই তাদের দায়িত্ব। পরম ভালোবাসায়, যত্নে, একাগ্রচিত্তে সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখতে হয় কোনও জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যথা তাঁর অন্তিম যাত্রায় তাঁকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। তাঁর আশীর্বাদ যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। সে আশীর্বাদে চিত্ত প্রশান্ত হয়। মন পবিত্র হয়। তাই এ বিদ্যে নিজের সন্তান সন্ততি যাদের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাদের ছাড়া আর কাউকে শেখানো যায় না। শিবু মারা যাবার পর তার ইচ্ছের অমর্যাদা করেনি লছমি। মুখাগ্নি করে বাপের শরীর চিতেয় উঠিয়েছিল সে। পরম শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, যত্নে শিবুর অন্তিম সৎকার করেছিল সে। গ্রামের মানুষ কেউ কোনও কথা বলেনি। সেই রাত্রে ধূম জ্বর এসেছিল লছমির। প্রায় সাতদিন বেহুঁশ ছিল সে। এ গল্প আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে মৌবনিতে।

আজ তিন তিনটে ছেলে লছমির। ভরা সংসার। নারানের বাপ নেই, মা আছে। তিন পিঠোপিঠি ছেলের দেখাশুনা করে লছমির শাশুড়ি। নারানের একার রোজগারে সংসার চলে না। লছমি কাজ করে গঞ্জে কোম্পানির কোয়ার্টারে বাবুদের বাড়ি। সকালবেলা মৌবনি থেকে লছমি আর আরও অনেকেই গঞ্জে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে যায়। সাবিত্রী, রঞ্জা, মনসা, হেমা এমনি আরও অনেকে। ওরা সবাই মিলে ভ্যানরিক্সায় তালডাঙ্গা এসে সকালের ট্রেন ধরে। সারাটা রাস্তা সুখ দুঃখের গল্প

করে গঞ্জের স্টেশনে নেমে যে যার কাজে চলে যায়। আবার একসঙ্গে ফেরে সন্ধ্যের ট্রেনে। তারপর ভ্যানরিক্সায়।

এঁদের মধ্যে সাবিত্রী খুব ভাল বন্ধু লছমির। দিনের শেষে নিজেদের প্রাণের কথা উজাড় করে না দিলে দুই সখীর রাত্তিরে ঘুম হয় না। মৌবনিতেই দুজনেরই বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়িও। সাবিত্রীর বর রতনও এই গ্রামের লোক। তাঁর সবই ভাল, দোষের মধ্যে বড্ডবেশি মদ গেলে। সন্ধ্যের পর আর হুঁশ থাকে না। প্রায়দিনই মদ গিলে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে। কখনও কখনও গাঁয়ের লোকেরা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। অথচ মুখঝামটা শুনতে হয় সাবিত্রীকে। ঝিয়ে সুঝিয়ে, মাদুলি তাবিজ পরিয়ে, পুজো-আচ্চা করে মদ ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করে সাবিত্রী এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। রোজগারের অর্ধেক টাকা মদের পিছনে চলে যায়। ছেলেমেয়ে, রতনের মা, নিজের মা আর নিজেরা দুজন মিলে ছ'টা পেট সংসারে। খরচ যে হারে বেড়েছে আরও দু'বাড়ি কাজ নিয়েছে সাবিত্রী। মাঝে মাঝে তাই ফিরতে দেরি হয় সাবিত্রীর। লছমি ওর জন্যে গঞ্জের স্টেশনে অপেক্ষা করে। অন্যেরা চলে গেলেও তাঁরা একসাথেই ফেরে।

নারানও যে একটু আধটু গেলে না তা নয়। তবে লছমিকে ভয় পায় খুব। লছমি এমনিতে ভালমানুষ, কিন্তু মাথা গরম হয়ে গেলে ওকে সামলানো দায়। মুখে যা আসে বলে দেয়, হাত-পাও চালিয়ে দেয় মাঝেমাঝে। তাই গ্রামের কেউ লছমিকে ঘাঁটাতে সাহস করে না।

পরপর তিন তিনটে ছেলের জন্ম দেওয়ার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। একদিন গাজনের মেলা দেখতে গিয়েছিল লছমি আর নারান। বাচ্চাগুলো ফেরার পথে নারান বলে, 'লছমি, একটা কথা বলব? রাগারাগি করবি না বল?'

মেলা দেখে মেজাজ ফুরফুরে ছিল লছমির। বলল, 'ন্যাকামি না করে কী বলবি বল।'

নারান বলল, 'তোকে আগে বলিনি আমার বড় সাধ ছিল আমাদের এক মেয়ে হবে। তিন তিনবারই ছেলে হল। মেয়ের সাধ আমার মিটল না।'

লছমি অবাক হয়ে গিয়েছিল নারানের কথা শুনে। যে গাঁয়ে মেয়ে হলে কান্নার রোল ওঠে, অলক্ষী বৌকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয় লোকে সেই গাঁয়ের ছেলে হয়ে নারান তিন তিনটে ছেলের পরেও মেয়ের বাপ হতে চায়। নিজের কথা মনে পড়ে লছমির। তিনটে মেয়ের জন্ম দিয়েছিল বলে তাঁর মা'কে কী না কী শুনতে হত। ওর বাপ, শিবু বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল নিজের বৌ আর তিন মেয়েকে। মাকে বলেছিল, 'তুই কিছু কানে নিস না। মেয়েরা আমার লক্ষী। ওদের কেউ কিছু বললে জ্যান্ত পুঁতে দেব শ্মশানের মাঠে।'

নারানের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লছমি। যেন নিজের বাবাকেই দেখতে

পায় শিবুর মাঝে। মনে মনে বলে, আমার ভালোবাসার মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। এমন সোয়ামী পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। তবে মুখে বলে, 'মেয়ে হলে খাওয়াবি কী? আমার মত কাজ করতে পাঠাবি লোকের বাড়ি? জন্ম দিয়ে কেন কষ্ট দিতে চাস বাকি জীবন মেয়েটাকে?'

নারান বলে, 'কথা দিচ্ছি, বুক দিয়ে আগলাবো মেয়েকে, লেখাপড়া শিখিয়ে ওকে অনেক বড় করব আমি। মেয়ে না হলে ঘর আলো হয় না। তুই রাজি হয়ে যা লছমি।' আলো-আঁধারির সেই সন্ধ্যার নির্জন রাস্তায় নারানের বুকে মাথা রাখে লছমি। চোখ বুজে আসে, গড়িয়ে আসে আনন্দাশ্রু।

আবার গর্ভবতী হয় লছমি। তালডাঙ্গার ডাক্তারদিদি তাকে নিয়মিত দেখে। বড়ো ভালো ডাক্তারদিদি। বেশিদিন আসেনি এখানে। ডাক্তারি পাস করে এক বছর হল তালডাঙ্গার ছোট হাসপাতালে পোস্টিং হয়েছে। কোয়ার্টারে থাকে। রাত বিরেতে গাঁয়ের লোকেদের বিপদ আপদ হলে হাসিমুখে তাদের পাশে দাঁড়ায়। এ এক নিশ্চিন্ত ভরসার জায়গা লছমির। তিন ছেলে আছে শুনে প্রথমবার দেখাবার সময় খুব বকাবকি করেছিল। পরে লছমির মুখে সব গল্প শুনে রাগ জল হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারদিদির। খুব ভালোবাসে ওদের দু'জনকে এখন। রোজ খবর নেয় নারানের কাছে। খাওয়া দাওয়া ওষুধপত্রের কোনও ত্রুটি হলে ফোন করে বকাবকি করে। দিনে-রাতে যে কোনও সময় ডাক্তারদিদিকে ফোন করতে পারে লছমি। ডাক্তারদিদি নিজেই বলেছে তাকে। খুব সাবধানে থাকার সময় এটা। ওঠাবসা, হাঁটাচলা যেটুকু দরকার তার বেশি একটুও করা বারণ। যতটা সম্ভব শুয়ে বসে থাকতে হবে। ডাক্তারদিদির কড়া নির্দেশ। যে কোনও দিনই কিছু হতে পারে এখন। সেই অপেক্ষায় দিন কাটে লছমি, নারান আর ডাক্তারদিদির।

আজ অমাবস্যার রাত। গরমের সন্ধ্যে। দক্ষিণের ফুরফুরে হাওয়ায় চৌকিতে আধশোয়া হয়ে বসে আছে লছমি। আজকাল রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না নারানের মা। ছেলে তিনটে দাওয়ায় বসে নিজেদের মত খেলা করছে। এমন সময় ঘরে ঢুকল নারান। আজকাল একটু বেশি টেনশনে থাকে নারান। সেই টেনশনে মদ গেলাটাও একটু বেড়েছে। সবই বুঝতে পারে লছমি কিন্তু চেঁচামেচি করতে আর শরীর দেয় না তার। অনেকবার বলেছে, 'মদ গেলাটা একটু কমা। রাতবিরেতে কখন কী হবে, দৌড়তে হবে তখন।' পাড়ার একটা ভ্যান রিক্সাওলার থেকে ভ্যানটা চেয়ে নিয়ে এসে রাত্রে নিজের কাছে রাখে নারান। রাত্রে কিছু হলে নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাবে। ভ্যানওয়ালারা সারাদিন ভ্যান টেনে মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয় রাত্রে। ওদের ডেকে তোলা শিবের অসাধ্যি। তার চেয়ে নিজে টেনে নিয়ে যাওয়া অনেক সুবিধে, সময়ও বাঁচবে। লছমি বলে, 'আবার গুচ্ছের গিলেছিস? তাহলে রিক্সা রেখেছিস কেন? ঘুমই তো ভাঙ্গবে না তোর? তোর নেশার মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব আমি।'

নারান বলে, 'ভরসা রাখ আমার ওপর। সর্বক্ষণ ভয় হয়। তাই ভয় কাটাতে খেয়েচি। ঠ্যালা দিবি, ঠিক উঠে পড়ব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নারান। তারপর বলে, 'আচ্ছা তুই লিচ্চয় করে কী করে বলছিস মেয়ে হবে? ডাক্তারদিদি ছবি তুলে দেখে তোকে বলেছে?'

এবার রেগে ওঠে লছমি, 'ভগবান যাকে পাঠিয়েছে সেই আসবে আমার কোলে। সে ছেলে না মেয়ে তুই আমি ঠিক করার কে? ডাক্তারদিদি যদি জেনেও থাকে বলবে কেন আমাকে? অনেক নিয়ম কানুন আছে এসব ব্যাপারে।'

নারানের মুখটা ছোট হয়ে যায়। বলে, 'তবে তুই যে বললি...' লছমি বলে, 'বলেছি না এবার মেয়ে হবে আমার। আমি জানি।'

নারান বলে, 'কী করে জানলি তুই?'

লছমি বলে, 'তবে শোন। আমার বাপ আমায় মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলার বিদ্যে শিখিয়েছে। মরা মানুষের চোখ মুখ কপালের দিকে তাকিয়ে তার পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের সবকথা জেনে নেওয়ার অদ্ভুত বিদ্যে জানা ছিল আমার বাপের। আর তার মেয়ে হয়ে পেটের ভেতরের একটা জ্যান্ত বাচ্চার শরীলের স্পশ্য, লড়াচড়া, পাশ ফেরা চোখ বুঝে সর্বক্ষণ দেখে বুঝতে আমি পারবুনি ওটা ছেলে না মেয়ে? যা, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। তোর মেয়েই বাড়ছে আমার পেটের ভেতর।'

নারানের মাথা ভোঁভোঁ করতে থাকে। পাগল হল নাকি লছমি? ওর কথার কোনও মাথামুণ্ডুই বুঝতে পারে না নারান।

একদিন, রাত তখন আড়াইটে হবে। বেজে উঠল লছমির ফোন। ওপাশ থেকে গোঙানির আওয়াজ। গলার আওয়াজ সাবিত্রীর মনে হচ্ছে না?

'কী হয়েছে সাবিত্রী?' চিৎকার করে ওঠে লছমি।

'ওপাশে শুধুই কান্না। কী হল, চুপ করে আছিস কেন? কথা বল।' লছমির গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি আমি।' কাঁদতে কাঁদতে বলে সাবিত্রী।

'কেন কী হয়েছে? বল আমায়।'

'কুকুরে কামড়েছে আমায়।'

ব্যস্ত হয়ে ওঠে লছমি। গোঙাতে গোঙাতে যা বলল সাবিত্রী তা হল আজ সন্ধেবেলা কাজ থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল সাবিত্রীর। ফিরে এসে দেখে রতন কাজের থেকে বাড়ি ফেরেনি। রাত অবধি অপেক্ষা করে দশটা নাগাদ সাবিত্রী ওকে খুঁজতে বেরোয় আর অন্ধকার রাস্তায় শুয়ে থাকা কুকুরের গায়ে পা তুলে দেয় সাবিত্রী। ভয় পেয়ে কুকুরটা প্রাণপণে কামড়ে ধরে সাবিত্রীর পা। তিন চারটে জায়গায় দাঁত বসিয়ে দেয়। রক্ত বেরিয়েছে অনেকটা। কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধায় রক্ত বন্ধ হয়েছে কিন্তু ক্ষতস্থানে অস্বাভাবিক জ্বালা করছে। রাত্তির বারোটা নাগাদ দুটো লোক

মদে বেহুঁশ রতনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। সে এখন মড়ার মত বেহুঁশ। কাল সকালের আগে তার হুঁশ ফিরবে বলে মনে হয় না। রোজ রোজ এই একই জ্বালা। তখন থেকে জ্বালা যন্ত্রণা চেপে অপেক্ষা করছিল সাবিত্রী। ভেবেছিল সকাল হলে যাবে হাসপাতালে। কিন্তু আর সহ্য করতে পারছে না সাবিত্রী। মনে হচ্ছে মরে যাবে এক্ষুণি। আর কথা বলতে পারে না সাবিত্রী। গোঙাতে গোঙাতে ফোনের অপরপ্রান্তে চুপ করে যায় সাবিত্রী।

ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে লছমি। চিৎকার করে ডাকতে থাকে নারানকে। ঘুম ভেঙ্গে যায় সবার। শুধু ঘুম ভাঙ্গে না দরজার বাইরে দাওয়ায় ঘুমিয়ে থাকা নারানের। নারানের মা ভাবে ব্যথা উঠেছে লছমির। উঠে এসে বলে, 'তুই বস এখানে। আমি দেখছি।'

ঝাঁঝিয়ে ওঠে লছমি, 'তুই পারবি ওকে তুলতে? মদ গিলে শুয়েছে কাল।' চিৎকার করে ওঠে লছমি, 'মরে গেলি নাকিরে নারান? কী করে ঘুমোচ্ছিস এখনও?' নারানের মা বলে, 'কী সব অলক্ষুণে কথা বলছিস লছমি? কতদিন তোকে বলেছি নারানকে নাম ধরবি না তুই।'

'তুই চুপ কর বুড়ী! নাম ধরে ডাকব না তো কী হারামি বলে ডাকব?' চেঁচিয়ে ওঠে লছমি। নারানের মা সরে যায়। বিড়বিড় করে বলে, 'কে যে তোর নাম লছমি রেখেছিল কে জানে? কে বলবে কথা তোর সঙ্গে? যা প্রাণ চায় কর।'

চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে নারানের। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। 'কী হয়েছে? এত চিল্লামেল্লি কিসের?'

লছমি বলে, 'ভ্যানরিক্সা বের কর। হাসপাতালে যেতে হবে এক্ষুণি।'

'কেন? তুই তো ঠিকই আছিস দেখে ঠাহর হচ্ছে। তাইলে এতরাত্তিরে হাসপাতাল যাবি কেন?' মাথা চুলকোয় নারান।

'সাবিত্রীকে কুকুরে কামড়েছে। রাবিশের বিষ মাথায় ওঠার আগে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ওকে।'

'কেন রতন ঘরে নেই? এ অবস্থায় তুই কী করে যাবি? তোকে না লরতে চরতে বারণ করেছে ডাক্তারদিদি?'

'ডাক্তারদিদিকে ফোন করে সব বলেছি আমি। এখনই না নিয়ে গেলে বাঁচানো মুস্কিল হবে সাবিত্রীকে। রতন মদ খেয়ে বেহুঁশ। দেরি না করে চল তাড়াতাড়ি। সাবিত্রীকে নিয়ে তারপর হাসপাতাল। অনেক পথ।'

'যেতে পারবুনি আমি। রাস্তা খারাপ, এবড়ো খেবড়ো। তোর যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যায়। পেটের মেয়েটা...'

'তা বলে চোখের সামনে মরে যাবে সাবিত্রী। আমি বেঁচে থাকতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে মরতে দেখব। তুই মরদ না রাক্ষস, নারান?'

‘ঠিক আছে। তুই থাক বাড়িতে। আমি একাই যাচ্ছি।’

‘তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে, নারান? একটা মেয়েমানুষকে রাতবিরেতে একা নিয়ে যাবি কী করে, সামলাতে পারবি? মান ইজ্জতেরও দিকটা ভাববিনি একবার। তাইকি কখনো হয়? যেতে আমাকে হবেই।’

‘তোকে নিয়েই চিন্তা আমার। আরও বেশি চিন্তা যে আসছে তাকে নিয়ে। তোদের কিছু হয়ে গেলে সব্বনাশ হয়ে যাবে। আমার মাথা কাজ করছেনে। হাত-পা চলছেনে।’

‘অত সহজে আমাদের মেয়ের কিচ্ছু হবে না রে নারান। পুণ্যবান শিবু ডোমের মেয়ে আমি। কোনও পাপ করিনি এ জীবনে। ভরসা রাখ, নারান। উঠে দাঁড়া। তোর মেয়ের দিব্যি! সাবিত্রীকে বাঁচাতেই হবে। হাসপাতাল পৌঁছে গেলে আর কিসের চিন্তা? ডাক্তারদিদিকে বলা আছে সব। সেরকম কিছু হলে ডাক্তারদিদি আছে তো।’

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ায় নারান। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে লছমির দিকে। হাসিমুখে নিজের আর গর্ভস্থ কন্যার জীবন তুচ্ছ করে বান্ধবীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞায় স্থির তার দুই চোখ, কঠিন তার চোয়াল। লছমির এমন রূপ সে আগে দেখেনি। সেই রূপের সামনে মাথা তুলে কথা বলার সাহস নেই নারানের। মাথা নিচু করে ভ্যানরিক্সা টেনে বের করে নারান। নারান অনুভব করতে পারে লছমির তেজ তাঁর শরীরেও ক্রমশ সংক্রমিত হচ্ছে। পেশীগুলো ফুলে উঠছে যেন। সহস্র মানুষের শক্তি ভর করছে তাকে। অপেক্ষমান মৃত্যুর হাত থেকে তিন তিনটে জীবনকে রক্ষা করার ভার এখন তার ওপর।

লছমি উঠে বসে ভ্যানরিক্সায়। নারানের মার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, ’ছেলেগুলানকে লক্ষ্য রাখিস। আর তোর ভগমানের কাছে বল ঘুমিয়ে না থেকে আমাদের দিকে একটু দেখতে।’

অমাবস্যার অন্ধকার চিরে এগিয়ে চলে জীবনরথ। সে রথের সারথি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। সেই রথের সিংহাসনে আসীনা এক নারী যার অনুভূতি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার গর্ভস্থ সন্ততির পৃথিবীর আলো দেখার অস্থির ব্যাকুলতায় যা তাঁর শরীরকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে অপার্থিব যন্ত্রণায়। পথিমধ্যে এই জীবনরথের পথ চেয়ে অপেক্ষা করে আছে অন্য একাকিনী মৃত্যুপথযাত্রী রমণী। গন্তব্যে জীবনের বরণডালা সাজিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসে আছেন জীবধাত্রী।

তোমাদের দেখি সকল রুদ্ধ অন্ধকারের ওপার থেকে। যারা নিজেদেরকে সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছে, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সেই অন্ধকারের ওপার থেকে তোমাদের দেখি। নিখিল মানব সেই অন্ধকার থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রবাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত

আচার। যেখানে ওরা কান বন্ধ করতে বলে যাতে মন্ত্র তোমার কানে যায়, সরে বসতে বলে পাছে তোমার স্পর্শ ওদের কলুষিত করে, দরজা বন্ধ রাখে পাছে তোমার অশুভ দৃষ্টি ওদের অমঙ্গল ডেকে আনে সেখানে বিরাজ করে অনন্ত অমানিশা। সেই অতলান্ত তমসার পরপার থেকে তোমাদের দেখছি।

সেই অমাবস্যার রাত্রিশেষে শুক্লপক্ষের প্রথম প্রভাতে লছমি জন্ম দিয়েছিল এক শিশুকন্যার। বিপদমুক্ত হয়ে রতনের হাত ধরে বাড়ি ফিরেছিল সাবিত্রী। ডাক্তারদিদির কথামতো পরের ভ্যাকসিনগুলো রতনের সঙ্গে গিয়ে গঞ্জের হাসপাতাল থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছিল সাবিত্রী। সেদিন সকালে ডাক্তারদিদির সামনে মদ ছেড়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিল রতন আর নারান। এই দিব্যধামে কেবলই জীবনের জয়গান।

প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানালো যে একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোট ছোট প্রদীপ নেভাও। রেললাইনের ওপারের লোকেরা তোমরাও শোন, তোমরাও জাগ্রত হও। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে।

২১শে জানুয়ারি, ২০২২

*এই গল্পে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

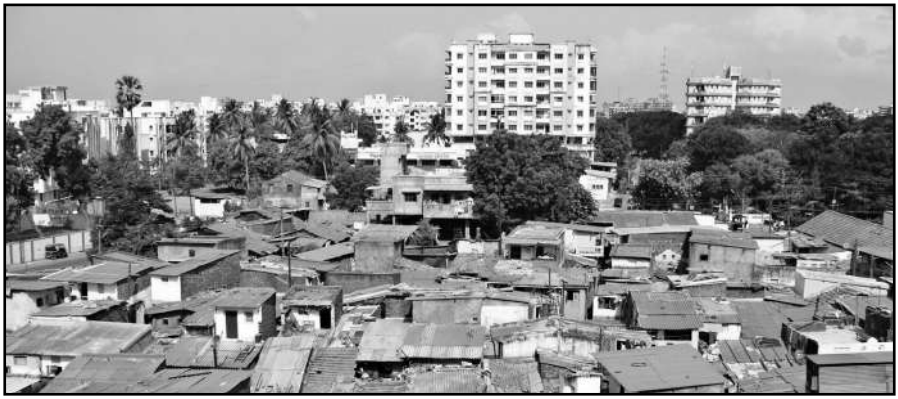

Helen, the Queen of Nautch Girls

©Pradip Bhaumik, 1974 Mechanical Engineering

Congratulations on a 5th century score! Hazel-Eyed-Chic-Sleek-gorgeously glamorous twinkle-toed charmer of the silver screen incidentally has finished the 500th film of her career in Dil Daulat Duniya. Perhaps it is a record all over the world for any film artist.

This is the caption that precipitates Helen, dancer superstar of Indian cinema, bursting onto the screen in a cacophony of jangles and spangles. Helen, Queen of the Nautch Girls, a half-hour documentary, sketches a portrait of the public and private personae of the all-singing, all-dancing deity of the most prolific film industry in the world.

I read a fascinating fairy tale in my childhood – Helen of Troy, the most beautiful woman in Greek Mythology. Queen Helen was abducted, resulting a historic war between the Greeks & Trojan armies, aiming to rescue their Greek queen, captivated by the Trojan king. It was a mesmerizing story to read which had loose resemblance with our Indian epic, Ramayana.

In the Indian silver screen, there is another Helen who is notable, though for a different reason, but for her to struggle to excel. Finally, she proved herself to be a legend in a men's dominated industry. It was her own but epic battle remain in industry actively for almost seven decades. There is the caption that precipitates Helen, dancer superstar of Indian cinema, bursting onto the screen in a cacophony of jangles and spangles.

In my pre-adolescent age, I could watch a Hindi movie 'Howrah Bridge' with my uncle. I could remember the dancing queen Helen for the first time though I could not understand the story of the movie at that tender age. My uncle sowed the seed of interest of movie in me. So, I continued. In the middle of 60's, I remember, watched a hindi movie 'Teesri Manzil' bunking off my school. It was a mesmerizing

experience to see Helen dancing with the song – 'O Haseena Zulfon Wali…', pairing with Shammi Kapoor. By then Helen's name became synonymous with cabaret dances of Hindi movies. I could get another chance to watch an old black & white movie 'Howrah Bridge'. And this time, saw Helen's dance to Geeta Dutt's song 'Mera naam Chin Chin Chu'. Slowly, in the '60s & '70s decades, our Hindi movie adopted the added attraction where Helen in a key role of dancing, and in acting too.

With my growing age and a bit of maturity, I could slowly realise the struggles of movie actors to remain in the industry, like all other professions. Guru Dutt's hindi movie 'Kaagaz Ke Phool' describes how dark is the film life, day-to-day challenges to remain floating in the industry. A series of flops can ruin the career of even an established film star. But still, Helen's film career spanned incredibly almost for seven decades.

Coming to the point of Bollywood nautch queen, Helen Ann Richardson Khan (née Richardson, known mononymously as Helen); was born on 21 November 1938), in Rangoon, Burma. Her father was an Anglo-Indian, named George Desimier who died during the 2nd World War. When the Japanese captured Burma, Helen was only 5 years old. They had to flee to India after the Japanese invaded Burma. Her Burmese mother, Marlene and brother and sister left Burma for an uncertain future, trekked to Dibrugarh, Assam along with many other Indian families, with no money, no belonging. During the difficult long journey through forest & hill, her mother miscarried along the way. Occasionally they received help from the British army in transportation, found refuge & treated blistering feet. Finally, they reached Dibrugarh, like a skeleton due to under nourishment and hardship for such a long strenuous journey. Many children, women & men in this group died on the way due to starvation, diseases, and wound injuries, and the number of fellow group members was reduced to half. They were admitted to hospital and stayed two months to recover their health.

From Dibrugarh they reached Kolkata. Her mother earned a living by working as a nurse. With her meagre salary it was difficult to run a

family of four. Helen quitted school and joined as a dancer in group dance in the movie. She had no formal training in dancing. However, a family friend, Cuckoo Moray who was an established dancer and actor in the film industry, found her job as group dancer. In her teenhood she used to work staggering two shifts in a day, year after year to make a living for her family (mother, sister and brother). She left school midway to earn a living. Helen doesn't dwell on her childhood but gives you the impression what a difficult time it was for the family and was probably the defining experience that made her such a tireless, hard-working performer (she often worked in two long daily shifts when making pictures with only a brief break for lunch between morning and evening).

At the age of 12 she used to be part of a group dancing in a movie. In 1951 she got a good break as one of the group dancers in the film Awara. In 1958 at the age of 19, she got another break in Shakti Samanta's movie 'Howrah Bridge'. The dance with Geeta Dutt's song 'Mera naam Chin Chin Chu…' became iconic popular. The movie was a smashing hit. After that she was famously called Chin Chin girl and never looked back.

Over the next few years in 'Gumnaam' she was nominated as best supporting actress for the filmfare award where she danced fascinatedly with Asha Bhosle's song 'Is duniya me jeena hai to…'. With Shammi Kapoor she had performed many hit dances like 'Suku Suku…' in 'Janglee', 'Yammi Yammi' in 'China Town', 'O Haseena Zulfonwali' in 'Teesri Manzil' , Muqabla Humse Na Karo in 'Prince', etc. Probably her western look did not match the look of Bollywood's traditional Indian look to be a heroine in a movie. She rarely got roles as the lead heroine in movies. So, Helen opted dancing which proved to be her fortune throughout '60s, '70s to '80s. However, given opportunities, she could prove her acting skill in supporting roles in a good number of films and her acting was appreciated by the audience. And by this time new generation dancing girls moved in like Aruna Irani, Bindu, Padma Khanna, etc. but Helen proved herself to be undisputed queen of dance for a stretch of few decades.

In many films she performed dances, and also sensitive supporting roles, but according to the cinema plot she had to be ultimately killed to make way for a good natured conventional looking heroine at the hand of a handsome hero. She acted as heroine in a hindi movie 'Cha Cha Cha' (1964) but that was not a commercial success. She acted in South Indian, Punjabi and Marathi movies also. In 1983 she formally retired from the roles of dancing girls from movies. Later, she continued to act in character roles in 'Khamoshi, the Musical' (1996), 'Mohabbatein' (2000), 'Hum Dil Deke Chuke Sanam' (1999), 'Humko Deewana Kar Gaye' (2006). She acted as the mother of hero, Salman Khan in Hindi film 'Hum Dil De Chuke Sanam' (In real life she is the stepmother of Salman Khan).

In Bombay Talkie (1970), it is more of a tribute to her by the Merchant Ivory filmmaking team as an iconic and enduring presence in Bollywood films. Helen, accompanied by numerous chorus girls, performs a dance on the keyboards of a giant typewriter while flirting and singing a duet with her co-star, Shashi Kapoor. While that musical number, which is being shot for the film-within-a film storyline of Bombay Talkie, marks her only appearance in the movie,

She was nominated for best supporting actress in films: Gumnaam (1966), Shikaar (1969), Elaan (1972), Lahoo Ke Do Rang (1980), Khamoshi, The Musical (1997). She received a filmfare award for best supporting actress role in Lahoo Ke Do Rang movie.

She was also honoured with Filmfare Lifetime Achievement Award (1999), Padma Shri (2009), and Raj Kapoor Award (2022).

Looking back to 70 years of her film career, it epitomises her struggle, tenacity, resolve, determination, professionalism in a male dominated industry. It is not an easy task for a woman to remain in the patriarchal film business for seven decades. She featured in more than 700 films which I am afraid any other actor can match. She was also known for wearing revealing and sensual costumes in her films as well as various wigs and coloured contacts. This made her easily standout and combined with her beauty and talent. It was easy for Helen to steal

any scene she appears in even though she was never a huge Bollywood star in the traditional sense.

In 1973, James Ivory and his team made a 31-minute documentary film Helen, the Queen of Nautch girls as a homage to the Indian movie dancer who may possibly hold the title of the most famous and beloved of all Bollywood film legends. It is more of a tribute to her by the Merchant Ivory filmmaking team as an iconic and enduring presence in Bollywood films. During this time Hazel-Eyed-Chic-Sleek-gorgeously glamorous twinkle-toed charmer of the silver screen incidentally had the 500th film of her career in Dil Daulat Duniya. Perhaps it is a record all over the world for any film artist. This half an hour documentary sketches a portrait of the public & private personae of all-singing, all dancing deities of the most prolific film industry of the world. The strict ethical code in Indian culture with kissing scenes & even affectionate touching expressly forbidden by the censors, her dance assumes a surrogate sensuality that the characters themselves cannot consummate. In spite of conservative Indian social sentiments, Helen's projected vulgarity, there is an overriding awe of her grace and sensuality that deems her worthy of Merchant Ivory's timeless tribute.

In 1999, Canadian filmmaker Eisha Marjara made an experimental film entitled Desperately Seeking Helen that was a highly personal account of her search in India for the famous superstar among other things. The film's first screening was held in India during International Film Festival Mumbai. It was ranked as the "Theater Critic's Choice" in the Chicago Reader, year 1999. It also earned special mention from Planet Television at the Internationales Dokumentarfilmfestival München, 2000, at the 1999 Locarno Film Festival, and also won the prestigious SRG SSR Award and the Silver Pardino – Leopards of Tomorrow award.

Coming to her personal life, she is now about 86 years old, happy in life with extended family of step sons, husband Salim Khan, and his first wife Salma.

গঙ্গাধর মণ্ডল ও আমার জীবনের এক বিরাট পরীক্ষা

©অমিতাভ দত্ত, ১৯৭৪ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাস, মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলীর কাছে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ সীমানা মধ্যবর্তী জায়গায় ছোট এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চল 'আনপাড়া'। খনিজ সম্পদে উন্নত এই অঞ্চলের বেশিরভাগ কয়লা খাদানই জমির ওপর, আর সেই কয়লা পরিবহনের জন্য পূর্ব রেল দপ্তর নতুন রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প নিয়েছিল (Karaila-Bina-Jayant (KBJ Project). আমি তখন B.B.J. Construction Co.-র হয়ে এই ব্রিজ প্রকল্পে কর্মজীবনের প্রথম রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়র পদে নিযুক্ত ছিলাম। এই প্রকল্পে ছোট বড়ো মিলিয়ে চারটে স্টীল ব্রিজ তৈরীর দায়িত্ব ছিল। ব্রিজ নং ৩০ ছিল লম্বায় ও উচ্চতায় সবচেয়ে বেশী, এর আরও বিশেষত্ব হল ব্রীজটা চার থেকে ছয় ডিগ্রী Curve-এ ছিলো। আমাদের সাইটের Main Camp আর Stores ছিলো এখানেই। এই ক্যাম্পে Labour Hutments, Store, Office, সবই ছিল দুই স্তরের চাটাইয়ের দেওয়াল ও টিনের চালা। আমাদের মতন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, মানে মাটির দেওয়াল, টিনের চালা আর চাটাইয়ের False Ceiling. ওই অঞ্চলে বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিন সন্ধা ৬টা থেকে ৮টা অবধি Generator এর আলোর ব্যবস্থা ছিল। ওই সময়েই সকলে রাত্রের খাওয়া সেরে নিতো।

আমাদের দুজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র ছাড়াও ছিলো ইরেক্সন দল, খালাসি, রিভেটর, Mechanical Team, প্রশাসনিক ও অফিস কর্মচারী, সব মিলিয়ে প্রায় ১৪০ জন কর্মী। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে কাজ শুরু করে ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে চারটে ব্রীজের কাজ বেশ এগিয়ে গেলেও ৩০ নং ব্রিজে কার্ভ গার্ডার ও উচ্চতা ১২০ ফুট থাকায় কাজ আশানুরূপ গতিতে এগোচ্ছিল না, সময় তুলনামূলক বেশি লাগছিল, ব্যস্ততাও ছিলো খুবই।

সেইরকমই কোনো এক ব্যস্ততম দিনে, দুপুরের ঠিক পরেই অফিস ম্যানেজার স্বপন খবর দিল Scaffolding Gang এর গঙ্গাধর মণ্ডল দুপুরের খাওয়ার পরে হজমের গণ্ডোগোল হয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাদের সাইট জনবসতি থেকে বহু দূরে হওয়ায় কাছাকাছি কোনো হসপিটাল ও নার্সিংহোম তো ছিলই না, কোনো গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বা কোনো ডাক্তারও ছিল না। প্রায় ৩ কি.মি. দূরে হিন্ডালকো-টাউনশিপ (রেনুসাগর) যাদের প্লান্ট ছিলো রেনুকুটে প্রায় ৩৫ কি.মি.

দূরে। এই জাতীয় সাইটের সরকারী প্রকল্পে স্বাস্থ্যবিষয়ক আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য নিকটবর্তী কোনো বেসরকারী হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করে রাখা হত। আমাদেরও সেইমতো ব্যবস্থা করা ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওই সময় সাইটের দুজন গাড়ী চালকের মধ্যে একজন ছুটিতে ছিল, আর একজন ২-৩ দিন ধরে ধুম জ্বরে শয্যাশায়ী। স্বপনকে বললাম Scaffolding গ্যাঙের মানিকদের বলো জীপ-পিকাপের পিছনের সীটে গঙ্গাধরকে শুইয়ে দিয়ে দুজনকে আমার সঙ্গে আসতে, হিন্ডালকো হসপিটালে যাবার জন্য। তখন বেলা ৩-৪ টে, হবে শীতের বেলা বেশ ঠাণ্ডা। সাড়ে তিন কিমি. রাস্তা, বেশী সময় লাগল না। হাসপাতালের সামনেই গাড়ি রেখেই দৌড় দিলাম ড. সাগর সিং [RMO Hindalco (Renusagar) Township Hospital] এর কাছে, সব শুনেই উনি রুগীকে ভিতরে আনতে বললেন। মানিক ও তার লোকেরা গঙ্গাধরকে স্ট্রেচারে করে ভিতরে নিয়ে গেল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ড. সাগর সিং বেশ কিছু সময় ধরে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন। ওনার মুখের অভিব্যক্তিতে আমি কিছু বিপদের সংকেত পেলাম। তারপরেই বেশ হতাশ ভাবে বললেন, 'কাকে নিয়ে এসেছেন আমার কাছে! এখন বলুন রুগীর ঠিক কী কী সমস্যা হয়েছিল।' সব শোনার পর তিনি বললেন, 'আসলে ওটা অম্বলের সমস্যা ছিল না ওটা ছিল একটা বড় রকমের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ গঙ্গাধর আসার পথেই মনে হয় মারা গেছে।'

আমার যেন মাথায় বাজ পড়ল। মাথা কাজই করছিল না। অসহায়ের মতো ওনার দুটো হাত ধরে বলে ছিলাম, 'ডাক্তারবাবু, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।' আমার অবস্থা বুঝতে পেরে উনি বলেছিলেন, 'ইয়ং ম্যান বি স্ট্রং নাউ।' দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করুন, আমি ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দেবো। এরপরই মনে হয় মন্ত্রশক্তির মতো কিছু ভর করলো আমাকে, বসে বসে কত কিছু যে ভাবলাম সে আর মনে নেই, কিন্তু সব কিছুই দেখলাম যন্ত্রের মতন করে চলেছি। ড. সিং এর থেকে জেনেছিলাম হাসপাতালে সেই সময় কোনো মর্গ ছিল না বলে মৃতদেহ রাখার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। উপরন্তু দাহ সৎকারের কোনো শ্মশানও কাছাকাছি নেই, বেনারস ছাড়া। আরও জানলাম ব্যবস্থার অভাবে এখানে অনেকেই মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়ে দেয়। ভারাক্রান্ত মনে সকলে মিলে গঙ্গাধরের দেহ আবার গাড়িতে তুললাম। শরীর খারাপ ভেবে যাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলাম তারই মৃতদেহ গাড়ি চালিয়ে সাইটে ফিরলাম। পকেটে আমার গঙ্গাধরের ডেথ সার্টিফিকেট।

সাড়ে তিন কিমি. পথ যেতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই, শুধু ভাবছিলাম কেনই বা Resident Engineer হতে রাজী হয়েছিলাম... আরও কতকিছু। যাই হোক রাতে আমরা সাইট ক্যাম্পে ফিরে এলাম। খালাসি, রিভেটার ও অন্যান্যরাও এসে হাজির। সকলের ইচ্ছানুযায়ী মৃতদেহ আমার ঘরের সামনে খাটিয়াতে রাখা হল।

মেক্যানিক্যাল টিমের দিলীপ গেল ব্রিজ নং ৫৪ সাইটে সেখানকার সারেঙ হরি সিংকে খবর দেবার জন্যে, যাতে সে তার দলের সকলকে নিয়ে পরের দিন সকালে আসতে পারে। এই সাইটটা ব্রিজ নং ৩০ অর্থাৎ আমাদের ক্যাম্প থেকে ২/৩ কি.মি.র মধ্যে। সব শুনে হরি সিং রাতেই এসে হাজির। আমাদের ফোরম্যান বানাভাই প্যাটেল, দুই সারেং হরি সিং ও বলবীর সিং, মেক্যানিক্যালের হেড অমিয় দাস বাবু ও স্বপনকে নিয়ে আলোচনা করে ঠিক হল যে পরের দিন রিহান্ড ড্যাম রির্জাভারের কাছে আমরা সৎকার করব। Scaffolding Gang যেটা মণ্ডল গ্যাঙ নামে পরিচিত তাদের সবাই মণ্ডল এবং মালদার এক গ্রাম থেকে আসে। তারা ঠিক করল গঙ্গাধরকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। রাস্তা প্রায় ৫/৬ কি.মি. যাইহোক ব্যাপারটা খুবই সংবেদনশীল তাই সকলেই রাজি হলাম। খালাসিরা (সকলেই পাঞ্জাবী) জঙ্গলে গেল 'লকরি কাটনে কে লিয়ে'। সে কী কাজে লাগবে তা তারাই জানত। আমরা ঠিক করলাম জীপে (Pick-up) গোটা ২০ রেলের পুরোনো স্লিপার ও ২০০ লিটার ডিজেলের একটা ব্যারেল নিয়ে যাবো। এ ব্যাপারে মেকানিক্যালের দাসবাবুর ভূমিকা ছিলো বিরাট। একবার মনে হয়েছিল ওর বোধহয় এই ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে – পরে জেনেছিলাম – না। এই সময় এটাও ঠিক করা হল যে আমরা সবাই (১৪০-১) মানে ১৩৯ জন বিস্তারিত বিবরণ সহ একটা চিঠি লিখবো মালদা-র সেই ব্লকের বিডিও'কে যেখানে গঙ্গাধরের বাড়ি এবং বলা হবে অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের সকলের উপস্থিতিতেই শবদেহ দাহ সৎকার করা হয়েছে। এই চিঠির একটি করে কপি (Carbon Copy) পূর্ব-রেলওয়ে দপ্তরে ও বি বি জে হেড অফিসেও পাঠানো হয়। এর পরে আমি স্বপনকে নিয়ে "Labour Contract Regulation Abolition Act" নিয়ে বসলাম। সাধারণতঃ এই ধরনের প্রজেক্ট সাইটে এরা সবাই 'কনট্র্যাক্ট লেবার' হিসাবে কাজ করত এবং এখনও করে, আর এই এ্যাক্ট-এ লেবারদের সমস্ত ব্যাপারে পরিস্কার সব বলা থাকে আমাদেরও এই Act মেনে চলতে হত। এই Act এর বিশেষ একটি ধারা আমাকে প্রথম পড়ে বুঝতে হল। কোনো কনট্র্যাক্ট লেবার-এর মৃত্যু হলে তার প্রাপ্য টাকা ও এককালীন দান ইত্যাদি মৃতের স্ত্রী পাবে। যে অঞ্চলে তার বাড়ি সেখানকার বিডিও-র তত্বাবধানে মৃতের স্ত্রী-র হাতে টাকা তুলে দিতে হবে ও শেষে বিডিও একটা সার্টিফিকেট দেবেন যেটা পরে Regional Labour Officeএ জমা দিতে হবে। টাকা পাঠানোর সময় ডাক্তারের Death Certificate-টাও পাঠাতে হবে।

সেই রাতে মিটিং-এ সবাই ঠিক করে প্রত্যেকে তাদের বেতনের একদিনের টাকা গঙ্গাধরের পরিবারকে দেবে। গঙ্গাধরের বকেয়া বেতন, এককালীন অনুদান এবং ১৩৯ জন সাইট স্টাফের একদিনের বেতন সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা বেশ বড় হওয়াতে একটা চিন্তা মাথায় এল যে এই টাকা নিয়ে বিডিও অফিসে যে যাবে

যদি মাঝপথে তার কোনো রকম প্রতারণা করার ইচ্ছা হয় ও সে টাকা ও Death Certificate B.D.O. অফিসে না পৌঁছে দেয় তাহলে কী হবে। বিশেষ করে Death Certificate-টা নিয়েই চিন্তা ছিলো আরও বেশী। কারণ তার তো কোন কপিই নেই।

মনে রাখতে হবে, যে সময়ের কথা বলছি তখন ফটোকপি বা জেরক্সের যুগ নয় আর মুঠোফোন তো বহুদূর। তাঁর উপর ঘটনাটি ঘটেছে এক অত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলে। পরের দিন খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে সোজা গেলাম ডঃ সাগর সিং-এর কোয়ার্টারে, তাকে সমস্যার কথা বুঝিয়ে বলাতে প্রথমে তিনি আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে এক কাপ গরম কফি খাওয়ালেন এবং ডেথ-সার্টিফিকেটের দ্বিতীয় কপি লিখে দিলেন। আরও বললেন এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব রকম সহোযোগিতা ভবিষ্যতেও উনি করবেন। সেই সময় ডঃ সিং-কে আমার ভগবান মনে হয়েছিল। ক্যাম্পে ফিরে গঙ্গাধরকে নিয়ে সৎকার যাত্রা শুরু হল। আমি, স্বপন ও অমিয় দাসবাবু গাড়িতে আগেই পৌঁছলাম, বাকিরা গঙ্গাধরকে কাঁধে করে হাঁটা পথে গ্রামের রাস্তা দিয়ে কিছু দেরীতে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল। দাসবাবুর ব্যবস্থাপনায় রেলের স্লিপার দিয়ে চিতা সাজিয়ে ডিজেল দিয়ে দাহ-কাজ শুরু হল। শেষ হতে বেশ সময় লাগল। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা সবাই ভারাক্রান্ত মনে ক্যাম্পে ফিরলাম। ঠিক হল গঙ্গাধরের জামাইবাবু মানিক মণ্ডলকে (আমাদের সাইটেই কাজ করত) রেনুকুট স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হলো রাতের ট্রেনে (Shaktipunj Express) রওনা দেওয়ার জন্য।

পরের দিন থেকেই সাইটের কাজ যথারীতি শুরু হল। কিন্তু বিবিজে–হেড অফিস ও পূর্ব-রেল সদর দপ্তরে খবর পাঠানো তখনও সম্ভব হয়নি, মনের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা ও ভয় কাজ করছিল। 'কনট্রাক্ট লেবার Act. এর নিয়মানুযায়ী' গঙ্গাধরের মৃত্যু-সংবাদ বিবিজে অফিসে এবং পূর্ব রেলের আঞ্চলিক দপ্তরে দেওয়া দরকার ছিল কিন্তু সেই কাজটা ছিল খুবই সময়সাপেক্ষ ও জটিল। ১৯৮০-৮১ সালে সেই দুর্গম জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলই না বলা চলে। যে কোনো যোগাযোগের জন্য সিংরৌলীতে পূর্ব-রেল দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসে গিয়ে ওয়ারলেস-কমিউনিকেশন সিষ্টেমের সাহায্যে যোগাযোগ করতে হত। আমরা প্রথমে সিংরৌলির রেল অফিসে গিয়ে কলকাতার পূর্বরেলের কয়লাঘাট অফিসে খবর দিলাম যে তারা যেন পরের দিন বিকেল ৩-৪ টের মধ্যে বিবিজে আফিসে আমাদের DGM(E) Mr. A.B. Deb-কে আসতে আনুরোধ করেন। সেই মত পরের দিন মি. অমিয় ভূষণ দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে গঙ্গাধরের আকস্মিক মৃত্যু, ড. সিং-এর থেকে ডেথ-সার্টিফিকেট ও কপি সংগ্রহ করা, কন্ট্রাক্ট লেবার নিয়মানুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্য টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গঙ্গাধরের গ্রামের বিডিও-মারফত স্ত্রী-কে পাঠানোর ব্যবস্থা করার কথা জানালাম।

এখন নিশ্চয় বোঝা গেল কেন তিন দিন সময় লেগেছিল অফিসে খবর দিতে!! সমস্তটা শুনে শেষে মি. দেব বলেছিলেন, 'ইউ হ্যাভ ডান এ্যান এক্সেলেন্ট জব মাই বয়, আই এ্যাম প্রাউড অফ ইউ।' (তখন ট্রান্সমিশনে যোগাযোগের ধরণটা ছিল – অমিতাভ বলছি ... ওভার, ... দেব বলছি ওভার ... এইরকম)।

আগেই বলেছি ব্রিজ নং ৩০ যেহেতু অনেকটা Curve-এ ছিল ও উচ্চতায় ছিল ১২০ ফুট তাই নির্মাণ-কাজটাও জটিল ছিল। কংক্রিট ডেক ঢালাই করে ব্যালাস্ট লে করে রেল-ট্রাক পাতা হয়েছিল। (ঢালাইয়ের কাজে বিবিজে অফলোড করেছিল ওবের কন্সট্রাক্সন কোম্পানীকে যারা তখন শক্তিনগরে এন. টি. পি. সি.-র Township এর কাজ করছিল। আমার সতীর্থ আলোক ভট্টাচার্য্য প্রজেক্ট-ইন-চার্জ ছিল। ওরা Deck Casting এর কাজটা করেছিল)। কাজটা ছিল জটিল ও সময়সাপেক্ষ। গঙ্গাধর মারা যাবার পরে দিন থেকেই সাইটে যথারীতি কাজ শুরু হয় ও আট (৮) মাসের মধ্যে প্রজেক্ট শেষ হয় এবং রেল কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তরও করা হয়।

এই প্রসঙ্গে বলি অমিয় দাস (যে দাসবাবু নামেই বেশি পরিচিত) তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মাঞ্চেরিয়ালের গোদাবরী-ব্রিজ-সাইটে। ওখানে ওনার এক মারাত্মক দুর্ঘটনা হয় ও পায়ে আঘাত লাগে, প্রায় ৮-৯ মাস হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া জেনেরাল হসপিটালে চিকিৎসা হয়। দীর্ঘ দিন পরে সুস্থ হন। আমি নিয়মিত হসপিটালে যাতায়াত করে ওনার দেখাশোনা করি সেই জন্য আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন আর সেই সুসম্পর্ক থেকেই গঙ্গাধরের মৃত্যুর সময় দাসবাবু আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা বলি – E-Railway-র তরফ থেকে এই Project এর Dy. Chief Engineer (Const.) ছিলেন শ্রী অশোক গাঙ্গুলি। পরবর্তীতে উনি কোলকাতা মেট্রো রেলের Chief Engineer হয়েছিলেন। ওনার বাবা, Sri B.C. Ganguly, স্বনামধন্য Railway Engineer এবং একদা Railway Board-এর Chairman. গাঙ্গুলি সাহেব ছেলের কাছে বেড়াতে এসে আমাদের সাইটে একবার এসেছিলেন এবং সেদিন আমরা সকলে একসাথে লাঞ্চ করেছিলাম। ওই বয়েসে ওনার মতো একজন Stalward ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসাটাও আমার এক বিশেষ পাওয়া।

যতই এই Project Site এর কথা মনে আসে ততই আমার মনে হয় কত কিছুই না সেই তিন বছরে ঘটে গেছে আমার জীবনে। এতকিছুর মধ্যে ১৯৮০-র ফেব্রুয়ারী মাসে ১৫ দিনের ছুটি তে কলকাতায় আসি আর শুক্লাও আমার বিয়ের দিনটা ছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

গঙ্গাধরের মৃত্যু অনেকের কাছেই দুর্ঘটনাজনিত এক মৃত্যু। কিন্তু আমার জন্য সেই দুর্গম অঞ্চলের এই মৃত্যু আমাকে অনেক সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে

দিয়েছিল। আমার বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল যার পাঠ স্কুল কলেজের পুঁথি পড়ে হয় না। সেই পরীক্ষা আমার আত্মবিশ্বাস আকাশ সমান করে দিয়েছিল। তারপর চাকরী জীবনে অনেক সমস্যা এসেছে, মোকাবিলাও করেছি কিন্তু প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে গঙ্গাধরের মৃত্যুর থেকে বড় আর কোনো পরীক্ষা বা সমস্যা হতেই পারে না, আর সেই ভরসাতেই কোনো বাধাকেই আর বাধা বলে মনে হয়নি। জীবনে বহু সফল ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করেছি – বা আজ আমি যা সেটা হতে পেরেছি, তার মধ্যে গঙ্গাধরকেও আমি একজন মনে করি।

গঙ্গাধর মণ্ডল—যেখানেই থাকো ভালো থাকো।

জিম করবেট সফর

©সুকান্ত রায়, ১৯৭৭ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
সংযোজন – হিমাংশু নাথ, ১৯৭৭ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

লেখার শুরুতেই জানাই, বাঘমামার জঙ্গলে মানুষ চিড়িয়াখানার বিপরীতে অবস্থান করে। এখানে মামা-মামীদের ইচ্ছে হলে তবেই নিজের অজান্তে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে আমাদের দর্শন দেবেন। এখানে উনারা নাচান তেমতি আমাদের মতন অর্বাচীন নরেদের।

আমাদের বাঘের থেকেও জঙ্গল দেখতে ও অনুভব করতে বেশি ভালো লাগে। তাই কোন expectation ছাড়াই বারবার জঙ্গলের দিকে ছুটি। জঙ্গলের নিঃস্তব্ধতা, ভোরের কুয়াশা, অজানা পাখীর ডাক, কিছু ডানার ঝটপটানি, হরিণ বা অন্য জন্তুর দৌড়ে যাবার শব্দ, ঘন গাছের পাতায় রোদের লুকোচুরি, মাটির সোঁদা গন্ধ, সব মিলিয়ে এক মায়াময় পরিবেশ যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, আর ক্যামেরায় তোলাও তাই। চোখ, নাক, কান ও আরো কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে হয়। যে কখনো ঘন জঙ্গলে বৃষ্টিতে ভিজেছে, একমাত্র সেই জানবে বৃষ্টিতে জঙ্গলকে কিরকম সদ্যস্নাতা নারীর মতো লাগে। মিশে যেতে ইচ্ছে করে...

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে করবেট পার্কে যখন এতো লোকসমাগম বা তারা মার্কা হোটেল কিছুই ছিল না। তখনও মামাবাড়িতে কিন্তু মামা এবং তার পরিবারদের দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। করবেট সাহেবের লেখায় পড়েছিলাম ওখানকার বাঘেরা নাকি খুব ধুরন্ধর হয় এবং দূর থেকে মানুষদের চোখে চোখে রাখে, ধরা দেয় না। করবেট জঙ্গলে একটি মাত্র ফরেস্ট রেস্ট হাউস ছিল, সেটা ধানগড়িতে। রামনগরে বোধহয় খুব বেশি হলে শ'খানেক লোকের বসবাস ছিল, কেউ ওদিক দিয়ে যেত না। জঙ্গলের মধ্যে ফরেস্ট রেস্টহাউসের কম্পাউন্ডের চারপাশে একফুট উঁচু বেড়া ছিল আর তার গায়ে লেখা ছিল "You are in a different zoo. Animals are free here."

আমাদের বিয়ে হয়েছে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে, আর করবেট পার্কের ট্যুর প্ল্যান করেছিলাম ১৯৮৩ এর জানুয়ারিতে, মানে বিয়ের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই। অনেকেই টিপ্পনী কেটেছিল, আমরা মধুচন্দ্রিমা করতে মামার বাড়ি যাচ্ছি। যথাসময়ে আমি আমার নতুন বৌ অঞ্জনা বাঘমামার বাড়ি পৌছালাম। (* প্রসঙ্গত বলে রাখি, অঞ্জনা কলেজে ছিলো আমারই সহপাঠিনী, বর্তমানে বৌ)। কম্পাউন্ডে ছিলো একটা

দোতলা বাড়ি আর কিছু সুইস টেন্ট। অতি উৎসাহী বিদেশি পর্যটকেরা স্যুইস টেন্টেই থাকতেন, কিন্তু আমাদের অত সাহস ছিল না, তাই দোতলায় একটা ঘরেই রইলাম। আরও একটা কারণ এই যে স্যুইস টেন্টে একটাই কমন বাথরুম, প্রতি রুমের মতন আলাদা লাগোয়া বাথরুম ছিল না।

একটিমাত্র সরকারি বাস সকালে নৈনিতাল থেকে ছেড়ে করবেটের গা ঘেঁষে রাতে রামনগর পৌঁছাত। দুগ্গা দুগ্গা বলে সেই বাসে চেপে সন্ধেবেলা ধানগড়ির গেটের ভিতর ঢুকে আরও মাইল পাঁচেক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ফরেস্ট রেস্ট হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে ডিনার চাইলে সেদিন দুপুরেই বলে রাখতে হয়। তাই সেই রাতে জল আর বিস্কুট দিয়েই ডিনার সেরে ঘরে ঢুকে পড়লাম। তখন আমরা হনিমুনে। কাজেই খাওয়া দাওয়াটা মুখ্য নয়, যাকগে সে কথা। ঘরটা আমাদের বিই কলেজের হস্টেলের ঘরের মতোই, তবে আকারে বড়, লাগোয়া বাথরুম, তাতে একটি কল আছে। শাওয়ারের কোন বালাই নেই, গরম জল তো দূরের কথা আর সময়টা জানুয়ারি মাস। তাই হাতমুখ ধোয়ার জন্য বেশি সময় নষ্ট না করে সারাদিনের ক্লান্তিতে সোজা গিয়ে বিছানায় লেপের তলায় ঢুকে গেলাম।

মাঝরাতে গিন্নি ঠেলা মেরে বললেন যে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। আমার তখন ডাকাত পড়লেও ঘুম না ভাঙার অবস্থা। পাশ ফিরে শুয়ে বললাম "পাগল হয়েছ? এখানে বাঘ? সে তো জঙ্গলে। কাল সকালে দেখতে যাবো। ও কিছু না, বাথরুমের কলটা লিক আছে, সেখান থেকে বালতিতে টপ টপ করে জল পড়ছে।" কী করে যে বালতির কথাটা মাথায় এল, এখনও বুঝতে পারি না। গিন্নিও আর কথা না বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন (এরপর সকলে যা ভাবছে, তা নয়, সারাদিন ঝড়ঝড়ে স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে জার্নি করে গায়ে তখন প্রচুর ব্যথা।)

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য নীচে ডাইনিং হলে নেমে দেখি বেশ উত্তেজনা। কয়েকজন সুইডিশ ও জার্মান পাবলিক হাতমুখ নেড়ে চোখ বড়বড় করে দূর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলে যাচ্ছে। আমরা খানসামাকে জিজ্ঞেস করলাম "কী হয়েছে?" কারণ মনে ভয়, ওখানেই আমাদের আগামী চারদিনের বুকিং আছে। রাঁধুনিটি একগাল হেসে বললে "কুছ নহী সাব, কাল রাত ইধার শের আয়া থা। আপ নিশ্চিন্ত রহিয়ে। হামারে ইধর গার্ড হ্যায়। আপকো কুছ নহী হোগা।" বলতে বলতে ভগ্নদূতের মতো গার্ড সাহেবের প্রবেশ, তার হাতে একটি লাঠি। সেই লাঠি ও গার্ডের চেহারা দেখে অত সুস্বাদু আলুর পরোটাটাও গলায় লেগে বিষম খেলাম।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই ফরেস্ট অফিসারের আগমন। জাঙ্গাল সাফারিগুলো বুক করতে করতে জানলাম যে কাল রাতে এক সুইডিশ ভদ্রমহিলা বাথরুমে যাবার জন্য টেন্ট থেকে বেরিয়েই সামনেই দেখেন বাবা দক্ষিণরায়। সেই যে দাঁতকপাটি লেগে পতন ও মূর্চ্ছা তা দেখে নাকি মামাও গুটি পায়ে হাঁটা দেন। দু' একবার শুঁকেছিলেন

কিনা জানিনা। এসব শুনে গিন্নি আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন আর আমিও নিবিষ্ট চিত্তে ঘাড় নেড়ে পরোটায় অখণ্ড মনোনিবেশ করলাম।

ব্রেকফাস্টের পর বাইরে ঘাসের জঙ্গল দর্শনে বেরোলাম। রেস্টহাউসটা একটা টিলার ওপর, নীচে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা নদী। একদিকে ঘন ঘাসের জঙ্গল। নদীকে ডানহাতে রেখে আমরা ঘাসবনে ঢুকলাম। ইচ্ছে ছিল ঘাসবনের মধ্য দিয়ে কিছুদূর গিয়ে টিলা থেকে নেমে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে আবার ওপরে উঠে আসব। কাজ তো কিছুই নেই আবার গপ্পো করার মতো কোন বাঙালী বা নিদেনপক্ষে ভারতীয়ও নেই, তাই শুধুই একটু সময় কাটানো। ঘাসবনের ঘাসগুলো উচ্চতায় প্রায় অঞ্জনার মতোই, আর রঙ হলুদ। তাই বললাম "চলো হাত ধরেই চলি। এই ঘন ঘাসবনে হারিয়ে গেলে তোমাকে আর কোনদিনই খুঁজে পাবো না।" এইভাবে মাইল খানেক হাঁটার পর রেস্ট হাউসের আর দেখা পাই না, আমরা নীচে নদীটার দিকে নামতে লাগলাম। পাহাড়ি নদী যেমন হয়, নদীর ধারে অনেক পাথর। চলার পথে সেই পাথরের ওপর দেখলাম এক অল্পবয়সী পাইথন রোদ পোয়াচ্ছেন। কাছে যেতেই গিন্নি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কাল রাতের কথা ভেবে আর এগোতে সাহস করলাম না।

ঘন্টা তিনেক পর রেস্টহাউসে ফিরে দেখি তুলকালাম অবস্থা। একটা সার্চ পার্টি তৈরি হচ্ছে আমাদের খোঁজার জন্য। আমাদের দেখেই ফরেস্ট অফিসার বললেন "ব্যাগগুলো প্যাক করে নিন। আমরা জীপে করে এখনই আপনাদের রামনগর ছেড়ে দিচ্ছি, তারপর যেন এই ক্যাম্পাসের চৌহদ্দিতে আর না দেখি।" কী ব্যাপার? অনেক হাতে পায়ে ধরে জানলাম যেখানে আমরা নিজেদের বাগান মনে করে হাঁটাচলা করছিলাম, সেটা নাকি ঘাসবন নয়, প্রোটেক্টেড এরিয়া মানে সংক্ষেপে মামাবাড়ি। কোন সাইনবোর্ড নেই, দিগন্ত বিস্তৃত ঘাস ছাড়া আর কোনো গাছও নেই। আরে? আমরা শহুরে লোক। এখানের হালচাল বুঝবো কী করে!!

সংযোজন
হিমাংশু নাথ, ১৯৭৭ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

সুকান্ত অঞ্জনাকে নিয়ে গিয়েছিল ১৯৮৩ সালে, আর আমরা যাচ্ছি ২০২২ সালে। ছিলাম চারজন, মানে আমি প্লাস বিই কলেজের দুই বন্ধু গজা আর পিজে। আর আছে অন্য আরেক বন্ধু, সে বিই কলেজের নয়। এই চল্লিশ বছরে প্রগতির হাওয়ায় জঙ্গলের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘরে বসে অনলাইন বুকিং করি, মোবাইলে প্রশ্নোত্তরে সব জানা যায়। থাকার জন্য পঞ্চনক্ষত্র হোটেল। দিশি বিদিশি ফুড মেনু, চাইলে চাইনিজ, থাই, ফ্রেঞ্চ সব পাবো। ঘরে ঘরে ওয়াই ফাই, চ্যানেল টিভি।

ইচ্ছে হলে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটো। আমাদের অবশ্য শুধুই বিশেষ একটি নন-নিগোশিয়েবল ডিম্যান্ড ছিল। রুমে এটাচড কমোড টয়লেট উইথ ফ্লাস থাকতেই হবে। আমরা এসে উঠলাম, হোটেলে।

আজ করবেট সাফারি। গতকালের birdwatch সফর অনেকটাই পুরোনো দিনের ভোজের শুরুতে লুচি-বেগুনভাজার মতোই। খেতে ভালোই লাগতো কিন্তু নজর থাকতো কখন 'আসল' মানে – মাছ মাংস ইত্যাদি আসবে। আজ সেই 'আসল' মেনুর সন্ধানে দু'বার সাফারির ব্যাবস্থা রেখেছি। মর্নিং শো, ম্যাটিনি শো। আশা করেছিলাম আমাদের টানে বাঘ না হলেও বাঘিনী নির্ঘাত দেখা দেবেন। বন্ধু গজা সেই দেখা হবার মুহূর্ত স্মরণ করে রং মেলানো হলুদ রঙের প্যান্ট পড়েছে। (সম্ভবতঃ ডায়াপার সহ!) বেশকিছু ছোটোবড়ো জন্তু দেখা গেলেও, মামা কিন্তু এসে ভাগ্নেদেরকে দর্শন দিলেন না। হয়তো অফিসের কাজের চাপে ছুটি পাননি। তবে আগের রাতের টাটকা পদচিহ্ন রেখে গেছেন, ভাগ্নেদের জন্য। তাতেই প্রণাম করে আমাদের জঙ্গল সাফারির সমাপ্তি।

এতো পরিকল্পিত সফরেও আমরা মামাবাড়ির কোন সদস্যের দেখা পেলাম না, কিন্তু করবেটই আমার দেখা শ্রেষ্ঠ জঙ্গলগুলোর মধ্যে একটা। দুঃখ তো হবেই, তবে বাঘের খোঁজে জঙ্গলের আনাচে কানাচে ঘুরে, রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করার উত্তেজনাও অন্য এক পাওয়া। আমার অন্যান্য বন্ধুরা বাঘের খোঁজে এসে ময়ূরের নাচ, হরিণশিশুর দুধ খাওয়া, এসবের ভিডিও তুলে নিয়ে গেছে। এগুলোও এক ধরনের প্রাপ্তি। আরেকটা কথা বলি, যদি প্রথমবারে মামামামীর দর্শন না হয়, সেজন্য একই দিনের দুটো টিকিট কেটেছি। তবুই ওনাদের দেখা পাই নি, যদিও দু'বারই আমাদেরকে বাঘ দেখানোর জন্য ড্রাইভার আর গাইডের যে অপরিসীম চেষ্টা দেখেছি সেটাও আরেক তৃপ্তির ব্যাপার। সুতরাং, আমরা নিশ্চিত, বাঘের দেখা না পেলেও তেনারা যে আমাদের খুব দূরে ছিলেন না। সে আরেক উত্তেজনা, তাই দর্শন না পেলেও যা পেয়েছি সেটাও খুব কম নয়!

করবেট পার্কের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ব্রিটিশ প্রকৃতিপ্রেমিক Edward James Corbett এর হাত ধরেই ভারতবর্ষে Wildlife tourism এর শুরু। তিনি শিকারী হিসেবে যত না পরিচিত, পশুপ্রেমিক হিসেবে তার থেকে অনেক বেশি, এবং নিজের জীবনের এক প্রধান অংশ উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল কুমায়ুন অঞ্চলে ছিলেন। আমার ICSE /CBSE বন্ধুদের উঁচু ক্লাসের Rapid Reader ছিল করবেট সাহেবের Man Eaters of Kumaon. ছিল অসাধারণ বর্ণনা। শুধু শিকারেরই নয়, পারিপার্শ্বিক গ্রাম্য সহজ লোকেদের কথা, যারা চিতাবাঘের আক্রমণে অসহায়। এঁদের বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য

সাহেবের অবদান সেই লেখায় পাওয়া যায়। সেকালের রাজারা তো ঢোল নাকাড়া বাজিয়ে শিকার করতেন, ক'জন মনে রেখেছে? করবেট সাহেবের সমস্ত শিকারই সরকারের অনুরোধে, মানুষের বাঁচার স্বার্থে, বাহাদুরী প্রদর্শনীর জন্য নয়। এরজন্যই পেয়েছেন সম্মান, স্বীকৃতি আর বিভিন্ন খেতাব।

এই অভয়ারণ্যের আগের নাম ছিলো Hailey National Park. ভদ্রলোকের (Malcolm Hailey) সঙ্গে প্রকৃতির কোনো যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু Governor ছিলেন, তাই নামকরণ। পরে করবেট সাহেবের নামে এই ন্যাশনাল পার্ক। পার্কের অনেকগুলি প্রবেশদ্বার। মূল প্রবেশ তোরণ ধানগড়ি। আমদণ্ডা, বিজরাণী, ধিকালাতে আছে রিসর্ট। ধিকালাতে অনেক আয়োজন, সবই প্রায় তারা মার্কা আস্তানা। আর এত হোটেল যে সংখ্যা গোণাও অসম্ভব। আমাদের আস্তানাও ছিল কলেজের ভাষায়, ঝিনচ্যাক্।

সুকান্তর করবেট ভ্রমণের পর এখনের সময়ে জিম করবেট ভারতের একটি গ্ল্যামারাস রিসার্ভ ফরেস্ট। বাঘ-চিতা-হাতী-কুমির একসাথে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। টুরিজম আর তার টুকিটাকি প্রয়োজনকে ঘিরে অজস্র ব্যবসা ছাড়া রামনগর শহরে আর অন্য তেমন কিছুই চোখে পড়ে না! বাঘ নামের এক প্রাণীর জন্য এত আয়োজন, এত অজস্র মানুষের অন্নসংস্থান আমাদের কল্পনাতীত ছিল! জঙ্গলের ভিতরে গাছপালার বিভিন্ন বিন্যাস, কখনও ভীষণ ঘন, কখনও একেবারেই হাল্কা। আর নানান রকমের পাখী ও জঙ্গলের বৈচিত্র্য তো আছেই।

ঝাঁটা

©সুদীপ রায়, ১৯৭০ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং

শুক্রবার সকাল আটটা। সেন'বাড়িতে সকাল থেকেই আজ সাজ সাজ রব। সপরিবারে দুদিনের জন্য বাড়ির সকলে মিলে দীঘা যাওয়া হচ্ছে। সবাই নিচে খাবার ঘরে এসে তৈরী। এখন শুধু ব্রেকফাস্ট করাই যা বাকি। ব্রেকফাস্ট করেই গাড়িতে করে দীঘা রওয়ানা হবে। খালি গিন্নীমা অঞ্জলি এখনো কাজের মেয়েটিকে তাড়া দিয়ে চলেছেন।

'এই জবা তাড়াতাড়ি কর। কাল পই পই করে বললাম আজ সকালে বেরুতে হবে, একটু তাড়াতাড়ি আসিস, তা সে'কথা কানে গেল না। কী হচ্ছে কী... তাড়াতাড়ি বেরুব বলে তুই কীভাবে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিস বল তো? পায়ের তলায় ধুলো তো কিচকিচ করছে। ভালো করে ঝাঁট দে।'

'ও কাকীমা, কদিন ধরে বলছি পুরনো ফুলঝাড়ুটা দিয়ে আর চলছে না। ও ঝাঁটা দিয়ে এর চেয়ে ভালো ঝাঁট আর হবে না।'

অঞ্জলি এবারে খাবারের ঘরে বসা স্বামী অমিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শুনছো ... দুদিন ধরে অফিস যাওয়ার সময়ে বলছি একটা ফুলঝাড়ু এনে দিতে। তা দরকারি কথা তো তোমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এভাবে নোংরা ঘরে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে? তোমার যত বয়েস বাড়ছে ততই ভুলোমন হচ্ছে। তোমার আর কী ? ল্যাংটার নাই কাপড়ের চিন্তা। ঘরদোর পরিষ্কার হল কী নোংরা রইল তাতে তোমার কীই বা আসে যায়? আমারই হয়েছে মরণ দশা।'

তা সত্যিই তো! দুদিন ধরেই অমিতকে অফিস যাওয়ার সময়ে একটা ফুলঝাড়ু আনার কথা বলা হচ্ছে। দুদিনই অমিত ভুলে গেছে। সত্য বচন, সুতরাং অমিত চুপ করেই অঞ্জলির কটুকথাগুলো হজম করল।

বড় ছেলে শুভ্র বলল 'মা চিন্তা কোরো না। সোমবার অফিস ফেরতা আমি তোমার ঝাঁটা নিয়ে আসব। তুমি তাড়াতাড়ি স্যুটকেস প্যাক করো। গাড়ি রেডি। বারোটার মধ্যে রিসর্টে পৌঁছুতে হবে।'

অঞ্জলি যেন মুখিয়ে ছিল, বলল 'তুই আনবি ? তাহলেই হয়েছে। তুই তো বাপের ওপরেও এককাঠি। কোনো কাজ হয় তোকে দিয়ে? দিন রাত্তির শুধু অফিস আর ফোন। এসব কাজের জন্য শোভনই ঠিক ছিল। ভীষণ রেস্পন্সেবল ছেলে। কিন্তু সে তো ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে বসে আছে।'

শোভনের দাদা শুভ্র উইপ্রোতে কাজ করে। বাড়ি ফিরে এসেও রাতে আমেরিকান ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য অন কল-এ থাকতে হয়। তখন বাড়ির সবার মুখে কুলুপ এঁটে রাখাই নিয়ম। আমেরিকান একসেন্টে এখনো সড়গড় হয়নি শুভ্র। ফোন করার সময়ে তাই সবসময়ে তটস্থ থাকতে হয়। বাড়ির কাজে তাই সহজে তাকে ঘাঁটানো হয় না। মায়ের কথা শুনে শুভ্রও চুপ করে গেল।

অঞ্জলি শুভ্রর বৌ তনিমাকে বলল 'শোনো বৌমা। এদের কাউকে দিয়ে কিছু হবে না। তুমিই না হয় সোমবার অফিস থেকে ফেরার পথে একটা ঝাঁটা কিনে এনো।'

তনিমা একটু ঘাবড়ালো। সোমবার ঝাঁটা কেনার কথা মনে থাকলে হয়।

দীঘাতে দুদিনের ট্রিপ ভালোই কাটল। অঞ্জলি কিন্তু ওখানে গিয়েও মাঝেমাঝেই ঝাঁটার প্রসঙ্গ তুলেছে। তবে কেউই তেমন উচ্চবাচ্য করেনি। কে আর চাইবে অপ্রিয় ব্যাপারে কথা বলে ছুটির মেজাজ নষ্ট করতে?

সোমবার বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরল অমিত, মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি, হাতে ঝাঁটা। এসেই বলল 'কইগো গিন্নী, এই নাও তোমার ঝাঁটা। আজ আর আমার ভুল হয়নি, ঝাঁটা কিনে এনেছি। দ্যাখো রকম ফ্যান্সি এনেছি।'

অঞ্জলি এসে মুখ ব্যাজার করে বলল 'কিনেছ তা বেশ করেছ। তবে এখন ওটা আর দরকার নেই। তোমরা ঝাঁটা কবে আসবে তার জন্য বসে না থেকে বিকেলে বাজার গিয়ে আমি নিজেই একটা ঝাঁটা কিনে নিয়ে এসেছি। তোমারটা তোলা থাক, এটা খারাপ হলে তখন ওটা বার করব।'

একটু পরে শুভ্রও বাড়ি ফিরল ... হাতে ঝাঁটা। এসেই হুঙ্কার 'কোথায় গেলে মা? আমাকে দিয়ে নাকি কোনো কাজ হয় না। এই নাও তোমার ঝাঁটা।' অঞ্জলির মাথায় হাত। তিন-তিনটে ঝাঁটা দিয়ে এবার করবেটা কী?

আধঘণ্টা পরে তনিমা বাড়ি ফিরল সঙ্গে একটা নয়, তিন তিনটে ঝাঁটার একটা সেট নিয়ে।

'ভালো ডিসকাউন্ট পেলাম ... তাই সেট কিনে ফেললাম।'

অঞ্জলির মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি। কেন যে মরতে সেদিন ঝাঁটা নিয়ে চেঁচামিচি করতে গেছিল।

দশ মিনিট পরে সদর দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ। দরজা খুলল অঞ্জলিই। 'আমাজন থেকে আসছি আপনাদের আইটেম ডেলিভার করতে। ঝাড়ু আই মীন আ কমপ্লিট সেট অফ ব্রুমস্টিকস, অর্ডারড বাই মিস্টার শোভন সেন ফ্রম ব্যাঙ্গালোর।'

ভ্যালেনটাইন দিবস : প্রেমের ত্রিধারা

©ময়ূখ দত্ত, ১৯৯০: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

এপিসোড ১ – বেলাশুরু

সচ্চিদানন্দ আর রুশার বিয়েটা যে কীভাবে সম্ভব হয়েছিল সেটা অনেকের কাছেই রহস্যের! স্কুল এবং কলেজের তিন তিনটে ভরাট সিরিয়াস প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরে অবশেষে রুশা সম্বন্ধ করে বিয়েতে রাজী হয়েছিল। তবে এরকম বিপরীত মেরুর মানুষের সাথে যে বেডরুম শেয়ার করতে হবে সেটা এর আগে সে ভাবেনি। আজকের দিনে কারুর নাম যে সচ্চিদানন্দ হতে পারে, সেটা শুনেই অবাক লেগেছিল, বন্ধুমহলে বলতে বেশ লজ্জাই লাগত, তাই অনেকদিন হবু বরের নামটাই বলেনি। সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে, বিয়ের আগে কয়েকবার এদিক ওদিক দেখা করেছিল দুজনে, তখন অবশ্য মানুষটাকে খারাপ লাগেনি। তবে একদিন আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেই বসেছিল, "তোমার এই বিগত শতাব্দীর নামটা কে রেখেছিল?" হয়ত অল্প আলাপের মধ্যেই এই প্রশ্নটায় আরো অনেক ছোটো ছোটো মাইক্রো প্রশ্ন লুকিয়ে ছিল, সেটা বুঝে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে সফটওয়ার ইঞ্জিনীয়ার সচি সরল হাসিতে উত্তর দিয়েছিল, "কেন, খুব সেকেলে তাই না? তোমার আগে দুজন মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু ওঁরা আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি, হয়তো আমার এই আদ্দিকালের নামের কারণেই। তুমি চাইলে আমি কিন্তু কোর্টে এফিডেপিট করে আমার নামটা পাল্টে নেব বিয়ের পরে..."

"আরে না, না, সেটা বলছি না..." একটু যেন অপ্রস্তুতই হয়ে গিয়েছিল রুশা।

তবে সচির এই সরল স্বীকারোক্তির মধ্যে রুশা যেন অনেকদিন ধরে খুঁজতে থাকা 'অকপট ভালবাসা'র একটা আভাস পেয়েছিল। বিয়ের পরে পরস্পরকে বোঝার সময় রুশা ভাবত যে নামের সাথে সাথে বরটাও কি আগের যুগের? কী করে যে সফটওয়ার কোম্পানীতে চাকরী করে কে জানে... এখনো সেই বাংলা হিন্দি সিনেমা, আর গানেই বুঁদ হয়ে থাকে... দুধ ছাড়া চা খেলে সকালে পেট পরিষ্কার হয় না, কফি নাকি শুধু শীতকালে খায়, আর ব্ল্যাক কফি, ক্যাপুচিনো, কোল্ড কফি ইত্যাদি তো অনেক দূরের জিনিষ। জীবনে কোনোদিনই নাকি গার্লফ্রেন্ড ছিল না, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার ব্লু ফিল্ম দেখেছিল, কিন্তু সেটাও তার ভালো লাগেনি। বিয়ের আগে সেক্স ইত্যাদি তো অনেক দূরের কথা!! কথায় কথায় বীয়র পাবে বা বারে যায়

না, রেড ওয়াইনের সাথে চীজ খেতে হয় নাকি হোয়াইট ওয়াইনের সাথে, এই সব আলোচনার থেকে বেশ দূরেই থাকে।

কোথাও ঘুরতে গেলে বা কোথাও খেতে গেলে যে ফেসবুকে সবাইকে জানাতে হয়, এসবে সচি বিশ্বাস করে না। কেমন যেন সব কিছুতেই আছে, আবার কোনো কিছুতেই নেই। একদিন প্রশ্ন করাতে প্রায় অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা দার্শনিক টাইপের উত্তর ভেসে এল, "পুরোনো, নতুন বা আধুনিক বলে কিছু হয় না, সব কিছুর মধ্যেই ভালো বা খারাপ দিক আছে, সেটা বুঝে, নিজের পছন্দের বৃত্ত তৈরী করে খুশী থাকাটাই আমার কাছে আধুনিকতা বলে মনে হয়, জানো নিশ্চয়ই যে আজকাল 'উত্তর আধুনিক' বা post modern বলেও একটা টার্ম চালু হয়ে গেছে, ভেবে দেখো আমাদের পরের প্রজন্ম কি টার্ম ব্যবহার করবে? উত্তর-উত্তর আধুনিক?!"

নিজেই মস্করায় নিজেই হাসে সচি... সম্বন্ধ করে বিয়ের প্রথম কয়েক সপ্তাহ শারীরিক জানা-চেনা হতেই কেটে গেল। তিনমাস পরেই ভ্যালেন্টাইন দিবস, রুশা মানসিকভাবে খুবই উত্তেজিত যে নতুন বিয়ের ঠিক পরেই প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করবে... নিজের অনেক প্ল্যান মাথায় আছে, এদিকে সচির কোনো হেলদোল নেই, কোথায় দুজনে বসে প্ল্যান করবে যে কোথায় যাবে, আগের বছরের কেনা লাল-কালো ড্রেসটা রুশা রেখে দিয়েছিল বিয়ের পরে প্রথম ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে পরবে বলে... কোন রেস্ট্যুরেন্টে ডিনার করবে? উদাসীন নতুন স্বামীর মনের হদিস পেতে সচিকে একবার প্রশ্ন করায় নিরুত্তাপ উত্তর পেল, "আরে ভালবাসার কি আবার আলাদা দিন হয় নাকি? ঠিক আছে তুমি বলছ যখন কোথাও একটা নিশ্চয়ই খেতে যাব।"

পুরো উত্তেজনাটাই কেমন যেন জলে ভেজা মুড়ির মত মিইয়ে গেল রুশার... কী করে এই আদ্দিকালের স্বামীকে বোঝাবে যে খেতে যাওয়া আর ডিনারে যাওয়ার মধ্যে আছে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে! বিয়ের সময়ে মা বারবার করে পাখীপড়ার মত করে কানের গোড়ায় ঢুকিয়েছিল, "এটা কিন্তু তোদের প্রেমের বিয়ে নয়, সম্বন্ধ করে বিয়ে, তোদের জানা-চেনা হতে অনেক সময় লাগবে, স্যাক্রিফাইস অনেক করতে হয় সংসারের জন্য...সবসময়ে প্রস্তুত থাকবি।..."

রুশা আর কথা বাড়ায়নি, ভাবলো দেখাই যাক লোকটা কী ব্যাবস্থা করে। ভ্যালেনটাইন্স ডে-র সকালে রুশা রান্নাঘর থেকে দেখল যে সচি খাবার টেবিলে বসে একের পর এক রেস্টুরেন্টে ফোন করে যাচ্ছে। শেষে খুব বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরের দরজার পাশে এসে হতাশ মুখে বলল, "আজকাল এই এক হুজুগ হয়েছে, কোনো একটা উপলক্ষ্য হলেই সবাই বাইরে খেতে চলে যায়, এই চত্তরের একটা কোনো ভালো রেস্টুরেন্টের টেবিলও খালি নেই আজ সন্ধ্যেতে... কী করি বলো তো?"

রেগে যেতে যেতেও মায়ের কথা মনে করে রুশা সামলে নিল, "আমি তো

আগেই বলেছিলাম, ছাড়ো, এক বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশান না হলেই বা আর কী আছে, কী খাবে বলো সন্ধ্যেবেলা, বানাবো তাহলে।...”

রুশার এই অভিমান সামলানোটা সচি বুঝল না, বরং ব্যাপারটাকে কেমন যেন আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে একগাল হেসে বলল, “ঠিক আছে, আমি আজ তাহলে তাড়াতাড়ি অফিস কেটে চলে আসব, দুজনে মিলে রান্না করব, খুব মজা করব, তারপরে আমাদের মুভি নাইট! তোমার পছন্দের মুভি! কী মুভি দেখবে ঠিক করে রাখো।”

রুশার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এবারে সেলিব্রেশানের কোনো ছবিই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেভাবে পোস্ট করা যাবে না, বাকি বন্ধুরা প্রেমিক বা হাসব্যান্ডের সাথে কত কত পোস্ট দেবে। কত আশা যে সে করেছিল আজকের সন্ধ্যার জন্য!

সচি সত্যিই সেদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এল, সাথে রুশার পছন্দের কোরিয়ান খাবারের অনেক কিছু মাল-মশলা... “আজ বাড়িতেই আমরা কোরিয়ান গ্রিল বানানোর চেষ্টা করব, জমে যাবে বলো?”

সন্ধ্যেটা রুশার অবশ্য খারাপ কাটল না, দুজনে ইউটিউব দেখে দেখে কোরিয়ান গ্রিল বানালো, সাথে কিমচি ... খেতে যে খুব একটা ভাল লাগলো রুশার তা নয়, তবু নতুন স্বামীকে খুশী রাখতে বলল, “বাঃ ভালোই তো খেতে হয়েছে!”

সচির মুখে বড় তৃপ্তির হাসি, রুশার বুক ফেটে যাওয়া হতাশা সচির নজরে পড়ল না। “কী সিনেমা দেখবো আজ আমরা এই স্পেশাল মুভি নাইটে?”

মনে মনে রুশা বলতে চাইল, ‘কিসের আবার স্পেশাল মুভি নাইট? নাইট ড্রেস পরে সোফাতে বসে ঘর আধা অন্ধকার করে কিছু একটা সিনেমা দেখার মধ্যে ভ্যালেন্টাইন ডে কোথায়?’ মুখে বলল, “আমি একটা ভাল ইরানিয়ান সিনেমার সন্ধান পেয়েছি, আগের সপ্তাহে আমার এক বন্ধু ওটা দেখে আমাকে জানিয়েছে।...”

“ইরানিয়ান সিনেমা? কেন তোমার বন্ধু কি ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের সাথে জড়িত? নাকি আজকালকার আঁতেল বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠিভুক্ত?” হাসতে হাসতে বলল সচি...

“ঠিক আছে, তোমার পছন্দ না হলে অন্য কিছু দেখব।”

“আরে না, না, আজ এই স্পেশাল দিনে আমরা তোমার পছন্দের সিনেমাই দেখব, আমি প্রমিস করেছিলাম তোমায়!”

রাতে দুজনে ওই সিনেমাটা দেখতে বসে। রুশা জানে যে এই ধরনের সিনেমা সচির এক্কেবারে পছন্দের নয়, তাও মনের মধ্যে কেমন যেন একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে আছে আজ...এবছরের ভ্যালেন্টাইন্স ডে টা এভাবে ‘নষ্ট’ হয়ে যাওয়ার জন্য!

সিনেমাটা চালু করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই রুশা দেখল সচি ঢুলছে... বেশ হয়েছে... আরো মিনিট পনেরো পরে রুশা বুঝতে পারল সচি ঘুমাচ্ছে, রুশা আরও বেশী করে

পছন্দের সিনেমাটাতে মনোযোগ দিল। সিনেমাটা বড্ড ভালো, মৌলবাদী শাসনের মাঝে এক আজন্ম প্রতিবাদী মেয়ে। মেয়েটি প্রতিদিন ভেঙে যাচ্ছে, দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবার উঠে বসছে, কষ্টের হাসি মুখে ফুটে উঠছে।... সিনেমা দেখতে দেখতে রুশাও নিজের মনে হাসছে, মন খারাপ করছে... মেয়েদের কি সবসময় এরকম ভাবেই মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়? পৃথিবীর কোথাও কি কেউ থাকে না, যে কিনা মেয়েদের সূক্ষ্ম অনুভুতি গুলো বোঝার চেষ্টা করবে?

হঠাত কোথাও থেকে একটা ফোঁপানো কান্নার শব্দে সচির ঘুম ভেঙে গেল, একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসে দেখল যে রুশা দুগালে হাত দিয়ে এক্কেবারে একাত্ম হয়ে সিনেমাটা দেখছে এবং পর্দার নায়িকার সাথে নিজেও কাঁদছে, ওঁর গোলাপী দু'গাল দিয়ে জলের ধারা বইছে...

"আজ এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে আমার এই সুন্দরী বৌ কাঁদছে, আমি এটা দেখতে পারব না...আজ আর তোমায় সিনেমা দেখতে হবে না, চলো শুতে যাই..." বলে সচি রুশাকে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে নিয়ে চলে গেলো...রুশাও আর কথা বলল না...

পরের দিন রুশার ঘুম ভাঙল ড্রইং রুমের টিভির শব্দে। গুটি গুটি পায়ে গিয়ে দেখে সচি আগের রাতের সেই ইরানিয়ান সিনেমাটাই আবার একাত্ম হয়ে দেখছে। "তুমি আবার এই সিনেমাটা দেখতে বসেছ কেন? কাল তো নিশ্চই তোমার ভাল লাগছিল না, তাই নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলে কাল রাতে।" একটু যেন শ্লেষের সাথেই বলল রুশা।

"সরি, সরি, সত্যি কথা বলতে, সত্যি আমার ভাল লাগছিল না..."

"তাহলে এখন?"

"না, না, আজ আমি সিনেমাটা দেখছি না, আমি বোঝার চেষ্টা করছি সিনেমাটার মধ্যে কী এমন আছে যে আমার ভালবাসার মানুষটা সেটা দেখে কেঁদে ফেলে, চোখ ভেজায়... সেটা না জানলে আমি কী করে তোমার এত ভালবাসার সম্মান জানাতে পারব? শরীর তো কিছু বছর পরেই জানা-চেনা হয়ে যাবে, তারপর তো শুধুই অভ্যেস, কিন্তু আমরা দুজনে দুজনকে যদি ঠিকভাবে জানতেই না পারি তাহলে সারা জীবনটা একসাথে, এক ছাদের তলায় কী করে কাটাব?

রুশার ঘুম চোখটা আবার কেমন যেন জলে ভিজে গেল, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার নাই বা হল, লাল-কালো ড্রেস পরে ফেসবুকে ছবি নাই বা পোস্ট হল, জীবনের সব থেকে দামী মানুষটা আমার ভালবাসা বোঝার চেষ্টা করছে, আমাকে প্রতিটা অনুভুতি বোঝার চেষ্টা করছে, আমার মনটাকে বোঝার চেষ্টা করছে, এর থেকে ভালো ভ্যালেন্টাইন ডে গিফট বা সেলিব্রেশান আর কী হতে পারে?

রিমোটের বোতাম টিপে টিভিটা অফ করে কাঁধে মাথা রেখে একহাতে সচির

পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলে হাত বুলিয়ে এলোমেলো করে দিতে দিতে রুশা বললো "পাগল! মেয়েদের বোঝা কি এতই সহজ? সারা জীবন লেগে যাবে!"

এপিসোড ২ – মধ্যগগন

চার চারটি বছরের বিয়ে ও এক সন্তানের পরে ডিভোর্স, ব্যাপারটা মেনে নিতে প্রথম দিকে সুচেতনার বেশ অসুবিধেই হচ্ছিল। যদিও এখনের "মুভ অন" সংস্কৃতির প্রথা মেনে সুচেতনা আর সুজয় – দুজনেই ঠিক করে নিয়েছিল যে সংসারে থেকে প্রতিদিনের এই ঝগড়াঝাঁটি করে থাকার কোনো মানেই হয় না, তার থেকে মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স নিয়ে সারা জীবনের জন্য ভালো 'বন্ধু' হয়ে দুজনের আলাদা পথ বেছে নেওয়াটাই ভালো! এও ঠিক করে নিয়েছে যে একমাত্র ছেলেকে দুজনে মিলেমিশেই মানুষ করবে, যাতে বাবা-মায়ের অভাব সে কোনোদিন অনুভব করতে না পারে... সেই হিসেবেই সপ্তাহে দুটো দিনের জন্য সুজয় ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে যায়, দুজনে খুব আনন্দ করে।

মোটামুটি সবই ঠিকঠাক চলছিল, শুধু স্কুলের চাকরীর হাড়ভাঙা কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আজকাল একটা সঙ্গীর অভাব মাঝে মাঝেই অনুভব করে বছর তিরিশের সুচেতনা। ব্যাপারটা আরো বেশী করে উস্কে দিচ্ছিল পেপারে, রাস্তায় এত এত ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিজ্ঞাপন দেখে। আর দু'সপ্তাহ আছে, তাই চারদিকে এত কিছু। এত বছর পরে এবারে সুচেতনার কোনো সঙ্গীই নেই। বাবা-মা অনেকবার বলেছে আবার বিয়ের জন্য, কিন্তু এখন আবার একটা নতুন রিলেশানের জন্য কেমন যেন 'অপ্রস্তুত' মনে হয়!

সেদিন অফিসের এক কলীগ একটা app-এর কথা বলল, যেটা শুধুমাত্র ডিভোর্সীদের জন্যই বানানো, পরবর্তী সঙ্গী খুঁজে নিতে সাহায্য করে। ওরা কারুর ছবি লোড করে না, শুধু ফোন নাম্বার আর প্রোফাইল সেভ দিয়ে রাখে। কে কী ভালবাসে, পছন্দ কেমন ইত্যাদি। সাথে বিভিন্ন অনুভুতি যেমন রাগ, ভালবাসা, অভিমান ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় স্কেলিং করে রাখা হয় বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে। এসব দেখে নাকি ডিভোর্সীরা বোঝে যে কার সাথে কতটা মিল পাওয়া যাবে... সুচেতনার এই সব app খুব একটা ভালো লাগে না, ছোটোবেলায় টিন্ডার এর কিছু বাজে অভিজ্ঞতা আছে ওর, তাই ওসব থেকে একটু দূরেই থাকে। তবু ভ্যালেন্সটাইন ডে'র দিনে কোনো সঙ্গী থাকবে না? কেউ রোম্যান্টিক ডিনারে নিয়ে যাবে না? একটা নতুন লাল ড্রেস কি এবারে কেনা হবে না?

সকালে অফিসে বেরোনোর আগে app-এ রেজিস্ট্রেশান করে প্রোফাইল দেখে তিনটে ছেলের ফোন নাম্বার একটা কাগজে নোট করে সামনের ঘরের টেবিলে পেপার ওয়েট দিয়ে রাখল। রাতে ফিরে এক এক করে ফোন করে দেখবে। কাজের

মাসীকে বলে গেল "আজ সুজয় আসবে, বাবানকে দুদিনের জন্য নিয়ে যেতে, ওর জামাকাপড় প্যাক করে দিও!!"

অফিস থেকে ফেরার পথে পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকাদের গুঞ্জনে আবার মনে পড়ে গেল দুদিন বাদেই ভ্যালেনটাইন ডে.... বাড়ি ফিরেই ওই তিনজনকে ফোন করতে হবে।

বাড়ি ফিরে সুচেতনা দেখে বাবানকে সুজয় দু'দিনের জন্য নিয়ে গেছে। সোফায় বসতে গিয়ে সামনের টেবিলের ওপরে রাখা কাগজের চিরকুটটাতে নজর পড়ল। সকালে নিজের হাতে লিখে রাখা তিনটে ফোন নম্বরের প্রতিটির নীচে সুজয়ের নিজের হাতের লেখা, "প্রথম নম্বরের মানুষটা ব্যাবসায়ী, তোমার টেস্টের সাথে একদমই মিশ খাবে না, দ্বিতীয় নম্বরের মানুষটা মনে হয় খারাপ হবে না, আমি চেক করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড, তবে আমার থেকেও বেশী সহনশীল হয়ে তোমাকে সামলে রাখতে পারবে কিনা জানি না, তুমি একবার চেষ্টা করতে পারো... আর তিন নম্বরের মানুষটাকে ফোন করে সময় একদমই নষ্ট কোরো না, কারণ ওটা আমারই একটা নতুন নম্বর, নতুন নামে আমি ওই app টাতে রেজিস্ট্রেশান করেছি, আমিও তোমার মতই সঙ্গীর অভাব বোধ করছি। কাউকে জোটাতে না পারলে, আমাকে মেসেজ করো, ফ্রি থাকলে দেখা হতে পারে!"

একটা ছোট্ট হাসিতে সুচেতনার আজকের ক্লান্তি চলে গেল, হাত বাড়িয়ে ফোনটা হাতে নিলো...

এপিসোড ৩ - বেলাশেষে

কয়েকমাস আগেই রমা আর সমরেশবাবুর বিয়ের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল। ছেলে-বৌমা-মেয়ে-জামাই, নাতি নাতনীদের বিরাট প্ল্যানিং-এর শেষে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীদের নিয়ে এক নামকরা রিসর্টে একটা পুরোদিন বেশ ভালই আনন্দ করে কাটিয়েছিলেন ওরা দুই বুড়ো-বুড়ি! সকলেই স্মৃতিচারণা করেছিলেন ওদের এত বছরের সুখী দাম্পত্যের রহস্য বিষয়ে।

তবে এত এত লোকজনের মাঝে সমরেশবাবু খুব একটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। একলা থাকাই বেশি পছন্দের। আর রমাও ভাল করেই জানে সমরেশবাবু এক কাটখোট্টা মানুষ, সারা জীবন কন্সট্র্যাকশানের কাজ করতে করতে প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি ওনার কাছে ঠিক তথাকথিত রোম্যান্টিকভাবে ধরা দেয় না, তবে তার মানে এই নয় যে সমররেশবাবু রমাকে ভালবাসেন না। কিন্তু মুস্কিল এই যে উনি কিছুতেই সেই ভালবাসাটা প্রকাশ করতে পারেন না। এসব নিয়ে বিয়ের প্রথম দিকে বেশ মন কষাকষি হত, কত কত বন্ধুরা বরের বা প্রেমিকের হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত, বন্ধুরা বলতো তাদের বরেরা কত ভালো – গোলাপ ফুল কিনে নিয়ে এসে খোঁপায়

গুঁজে দেয়, ইত্যাদি... সমরেশবাবু এসব কিছুই করেননি, মানে 'ওসব ঠিক আমার আসে না' এই টাইপের...

আসলে প্রেমের এই ধরনের বাহ্যিক প্রকাশটা কিছুতেই শিখে উঠতে পারেননি আদ্যোপান্ত ভালোমানুষ, মফঃস্বলের বয়েজ স্কুলে পড়ে বড় হয়ে ওঠা সমরেশ বাবু... আস্তে আস্তে সময়ে সাথে সাথে রমাও বুঝে গেছে মানুষটা কিরকম, তাই সবার সামনে বরের নিন্দা করে যখন বলে যে "ছাড় তো, ও আর ভালবাসা? ও সেসবের মানেই জানে না..."

ভেতরে ভেতরে রমা কিন্তু জানে যে সমরেশবাবু সত্যি ওকে খুবই ভালবাসে। তাই বৌমা, মেয়ে আর নাতি-নাতনীরা যখন চেপে ধরে বলল যে তোমাদের জীবনে একবার অন্তত ভ্যালেন্টাইন্স দিবস পালন করা উচিত, সেটা শুনে রমার খুব মজা লাগলেও সমরেশবাবুর খুব টেনশান হয়ে গিয়েছিল! এই বিদঘুটে দিনটার কথা প্রথম শুনেছিলেন ছেলের কলেজে পড়ার সময়ে, যখন সে বাবার থেকে ৩০০ টাকা চেয়েছিলো গিফট কিনবে বলে... বড় নাতনী আবার সেদিন বলল যে এখন নাকি সাত দিন ধরে গিফট দিতে হয়! সমরেশবাবুর তো চক্ষু চড়কগাছ!

যাই হোক, আজ নাতি-নাতনীরা প্রায় জোর করেই সারা বাড়ি লাল হার্ট শেপের বেলুনে ভরিয়ে দিয়েছে, ব্রেকফাস্টে লাল রঙের ইডলি দেখে সমরেশবাবু প্রথমে চমকে গেলেও বেশ নতুন লাগল খেতে, পরে শুনলেন ওটা নাকি বীট দিয়ে বানানো ইডলি! বৌমা আবার কোথা থেকে বেকিং শিখে এসে একটা লাল চেরি কেক বানিয়েছে, তাতে আবার রমা খুব উৎসাহে সাহায্য করেছে সকাল থেকে... ভালোই লাগছিলো বাড়ির নতুন পরিবেশটা।

ব্রেকফাস্টের পরে এক নাতি জিজ্ঞাসা করল, "দাদু, তুমি কি ঠাম্মাকে হ্যাপি ভ্যালেন্সটাইন ডে বলেছ?"

"কেন? ওসব বললে কি ওই বুড়ির ভালবাসা বেড়ে যাবে?" নাতিদের সাথে মজা করেই বললেন...

"আচ্ছা দাদু, ঠাম্মা বলছিল তুমি নাকি কোনোদিন ঠাম্মাকে 'আই লাভ ইউ' বলোনি...খুব বাজে! আজ তোমাকে কিছু একটা বলতেই হবে..."

পাশ দিয়ে যেতে যেতে রমার খুব মজা লাগল.... বেশ জব্দ নাতি-নাতনীদের কাছে!

"হ্যা, হ্যা, তোরা জোর করে যদি একটা ভালবাসার কথা বলাতে পারিস! সিনেমাতে শুধু দেখেই গেল যে লোকজন হাঁটু মুড়ে কত ভালবাসার কথা বলে অথচ আমি তো সারা জীবন কিছুই শুনলাম না... যদি আজ বলে তাহলে স্বর্গে গিয়ে আমিও বলতে পারব যে, হ্যাঁ তোদের দাদু আমাকে ভালবেসেছিল, নাহলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। সবাই বলবে ভড়কি দিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিল।"

সমরেশবাবুও খানিক স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করলেন, "আরে, হৃদয়ের অনুভবটাই তো আসল, তুমি এখনো সেই মুখের কথাতেই পড়ে আছো, এসব ভালবাসার ব্যাপারটা ফিল করতে হয়, তাই না?"

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরাই বল!"

নাতি-নাতনীরা খুব একটা প্রভাবিত হল না, "ওসব জানি না, আজ তুমি ঠাম্মাকে দুটো ভালবাসার কথা বলবেই... আমরাও শুনব, তুমি বলছ!"

রমাও মজা নিচ্ছিল, "ওসব জানি না, আজ সারাদিনে একটা হলেও ভালবাসার কথা বলতেই হবে আমাকে... না হলে আমিও কিন্তু ঝগড়া করব বলে দিলাম!"

চারদিকের এই সাঁড়াশি আক্রমণে দৃশ্যত বিপর্যস্ত সমরেশবাবু কী যে করবেন বুজে উঠতে না পেরে পাড়ার বুড়োদের ক্লাবে আড্ডা মারতে চলে গেলেন, তাস খেললেন, দিদি-মোদি নিয়ে অনেক কথা শুনলেন, কিন্তু মাথায় ওই ভালবাসার কথাটাই ঘুরতে থাকল!!

দুপুরে মাংস-ভাত খেয়ে ভালো ঘুমও হল না। একবার ভাবলেন পাড়ার বাবলুর ফুলের দোকান থেকে একটা রক্তগোলাপ কিনে নিয়ে এসে বৌ এর সামনে বলেই দেবেন তিনটে ম্যাজিক শব্দ – আমি তোমাকে ভালবাসি!! তারপরে নিজের মনেই হেসে ফেললেন – "যাঃ, এসব আবার কীভাবে বলব? খুব বোকা বোকা।" বাড়ির সবাই নিশ্চই মজা করছে, এতক্ষনে নিশ্চই সব ভুলে গেছে! কিন্তু ডিনার টেবিলে বড় নাতনী বলে বসল "দাদু, তুমি ঠাম্মাকে বলেছ? না বলে থাকলে এখনই বলতে হবে কিন্তু।"

খুবই বিপদ! সবাই কেমন মজা নেওয়ার জন্য ওনার দিকেই তাক করে বসে আছে! শেষে সমরেশবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে রমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "সারাদিন ধরে আমি আমার কত বন্ধুর সাথে কথা বললাম, কেউ ভালো সাজেশান বা কোট দিতে পারল না, সবাই হেসেই গড়াগড়ি খেল... শেষে আমি নিজেই ডিকশনারী থেকে ভাল ভাল শব্দ খুঁজে বেড়ালাম, শেষে হাল ছেড়ে দিলাম। তুমি যে আমার মনে কতখানি জায়গা জুড়ে আছো, সেটা ঠিকভাবে বলার মত কোনো যুতসই শব্দই খুঁজে পেলাম না... এজন্মে আর হাঁটু মুড়ে বসা হল না, হাঁটুর হাড় হয়ত খুলে বেরিয়ে আসবে, পরের জন্মে নিশ্চই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারবো!"

পিনড্রপ নিঃস্তব্ধতার মাঝে অস্ফুটস্বরে বড় বৌ এর গলা শোনা গেলো "বাবা! আপনি তো দেখছি ছুপারুস্তম!"

আর রমার মুখে একটা লাজুক গোধুলি আভা!

বোকারো ট্যুর

©দীপক চক্রবর্তী, ১৯৭৬ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

ননীগোপাল যে এইরকম একটা বিপদের সম্মুখীন হবে, সেটা সে তাঁর দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বেশ একটা চাকরী বাগিয়েছিল ঘাঁটি বিদ্যুৎ নিগমের সদর ঘাঁটি কলকাতায়। শুয়ে বসে বেশ আনন্দের সাথেই দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিল; হঠাৎই তাঁকে সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বোকারো ট্যুরে যেতে বলায় তাঁর মাথায় রীতিমতনই বাজ পড়ল। সে বেশ ভালোরকম বুঝতে পারছে যে এটা তাঁকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত কিন্তু অফিসের কাজ জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, উপায় নেই, যেতেই হবে।

সেই ছোটবেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, তারপর একটু বড়ো হয়ে স্কুলে পড়ার সময়ে দার্জিলিং, তারপরে কলেজ জীবনে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে রোজ রানাঘাট থেকে শিয়ালদা, তারপর শিয়ালদা থেকে দক্ষিণ শহরতলীর ট্রেন ধরে যাদবপুর। এখন চাকরী জীবনে শিয়ালদা থেকে বেলভেডিয়ার। এই তাঁর পৃথিবী। কলকাতা শহরটাকেও সে ভাল করে চেনে না। বেলভেডিয়ার থেকে নিজের কলেজ যাদবপুরে যেতে হলেও অনেক জেনে কাগজে লিখে নিয়ে তবেই যায়। আর তাঁকেই কিনা এখন যেতে হবে বোকারো।

ননীগোপালের শুকনো মুখ দেখে পাশের টেবিল থেকে অসীম জিজ্ঞাসা করল, "কী রে! শরীর খারাপ নাকি?"

অসীম তাঁর সহপাঠী, যাদবপুরে পড়ার সময় থেকেই মুখ চেনা। এখন চাকরী জীবনে খানিক ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। ওকে একটু ভরসা করা যায় মনে করে বলেই ফেলল, "আর বলিস না, সেনগুপ্ত সাহেব আমাকে আগামী সোমবার বোকারো যেতে বলছেন।"

"আরে! এতে মুখ শুকিয়ে বসে থাকার কী আছে, চলে যাবি।" অসীম বলে উঠল।

"বললেই কি যাওয়া যায় নাকি? কীভাবে যাব, কোথায় থাকব, কিছুই জানা নেই। অথচ যেতে হবে। কি না, স্টোরের হিসাবে নাকি মিলছে না। তা ওখানকার কাউকে দিয়ে করিয়ে নিলেই তো পারে! খামোখা আমাকে পাঠানোর দরকার কি?"

অসীম ননীগোপালকে চেনে, জানে। সমস্যার কিছুটা বুঝতে পারল। ভরসা দিলো, "তা ঠিক। তবে তোর দৌড়ও তো মসজিদ পর্যন্ত। তোর রানাঘাট আর

শিয়ালদা ছাড়া তো পৃথিবীর কিছুই দেখলি না। তা যা না, দু'দিনের জন্য বোকারো ঘুরে আয়।"

আরও একটু ভেবে অসীম বলল, "তুই বরঞ্চ একটা কাজ কর। সিভিলের ছেলেরা হরবখত বোকারো যাচ্ছে। তুই বরঞ্চ ওদের থেকে জেনে নে ওঁরা কীভাবে যায় আর কোথায় থাকে।"

পরামর্শটা ননীগোপালের মন্দ লাগল না। লাঞ্চের পরে সিভিল ডিপার্টমেন্টের ড্রয়িং হলে গিয়ে দেখে অলোক নিজের ড্রয়িং বোর্ডে বসে একমনে কিছু করছে। অলোককে ননীগোপাল একটু ভয়ই পায়, কিন্তু তখন ড্রয়িং হলে আর কেউ না থাকায় অলোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই শোনো, বোকারো গেলে কীভাবে যেতে হবে?"

কথাটা পুরোটাও শেষ করতে পারল না, অলোক মাথা না তুলেই প্রশ্ন করলো, "ক্যানোও?"

অলোকের কথার ধরণ দেখে আর কথা না বাড়িয়ে ননীগোপাল ভয় পেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসল।

অসীম টিফিন করতে বাইরে গিয়েছিল। সে ফিরে এলে তাঁকে ঘটনাটা বলল। অসীম বলল, "তোকে একটা প্রশ্ন করল, আর তুই চলে এলি? ঠিক আছে, তুই আর অলোকের কাছে যাস না। তুই বরং প্রকৃতির কাছে যা।"

প্রকৃতি মনোযোগ দিয়ে 'কোড অফ প্র্যাক্টিশ' পড়ছিল। ননীগোপাল সেই একই প্রশ্ন করতেই প্রকৃতি ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলো, "থার্মাল না স্টীল?"

ননীগোপাল রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। জানতে চাইল বোকারো কীভাবে যেতে হবে, আর সে বলে কিনা থার্মাল না স্টীল? কতগুলো বোকারো রয়েছে রে বাবা! ভয়ে ভয়েই সে বলল, "ঐ যে আমাদের প্ল্যান্টে।"

প্রকৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল, "বেড়াতে না অফিসের কাজে?" এখানে আর কথা বাড়িয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না মনে করে ননীগোপাল তাঁর সীটে ফিরে গিয়ে অসীমকে সব কথা খুলে বলল।

ননীগোপালের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে, অসীম অনেকক্ষণ ধরে হেসে নিয়ে বলল, "তুই এক কাজ কর, তুই বরং সোহমদাকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা কর।"

ননীগোপাল সোহমদাকে চেনে না। কোনদিন দেখেওনি। অনেককে জিজ্ঞাসা করে, অনেক খুঁজে, সোহমদাকে গিয়ে বলল যে সে আগামী সোমবার বোকারো যাবে, তা কীভাবে যেতে হয় সেটা উনি যদি দয়া করে একটু বলে দেন। সোহমদা আগে কখনও ননীগোপালকে দেখেননি। জিজ্ঞাসা করলেন, "একা যাবে? না বৌমাকে নিয়ে?"

ননীগোপাল রীতিমত হতচকিত, সে এখনও বিয়েই করল না, আর সোহমদা এসব জিজ্ঞাসা করছেন? সোহমদাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সে এখনও বিয়েই করেনি, তাই বৌ নিয়ে যাবার প্রসঙ্গই নেই। সোহমদা এবার জানতে চাইলেন তাহলে কি ননীগোপাল ওঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে যাবে! ননীগোপাল প্রচণ্ড হতাশ হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে সোহমদাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সে অফিসেরই কাজে সোমবার বোকারো যাবে, তাই কীভাবে যাবে এবং কোথায় গিয়ে থাকবে, সেটা যদি সোহমদা একটু বলে দেন তাহলে ননীগোপালের খুবই উপকার হয়।

সোহমদা সব শুনেটুনে বললেন, "বাঃ! বেশ ভালো, তা কখন যাবে? সকালে না বিকালে?"

এ আবার কী প্রশ্ন! কোন কথারই কি সোজাসুজি উত্তর হয় না? এবারে একটু রেগে গিয়েই জানতে চাইল, সকালে যাওয়ার আর বিকালে যাওয়ার মধ্যে তফাতটা কোথায়? সোহমদা বললেন, "দেখ, রেগে যাওয়ার মত কোনও কারণ নেই। সকালে গেলে একরকম আর বিকালে গেলে অন্যরকম। কারণ থাকার জন্য গেস্টহাউসেও সেইভাবেই বলে দিতে হবে। নাকি?"

ননীগোপাল আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে গিয়ে অসীমকে সব জানাল। তখন ঠিক সেই সময় সুনীর্মল পাশ দিয়েই যাচ্ছে, অসীম ওঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই শোন, তুই তো দু-একবার বোকারো গিয়েছিলি, কীভাবে যেতে হয় রে?"

"টিকিট কেটে? নাকি উইদ আউট টিকিট?"

"আরে, অফিসের কাজে যাবে, টিকিট কেটেই।"

"অঅঅ, বুঝলাম। ফার্স্ট কেলাস? না, থার্ড কেলাস?"

অসীম আর কথা বাড়াল না। ননীগোপালকে বলল, "দ্যাখ, সিভিলে সবকটাই শালা শিবপুরের। সবকটাই শালা হারামী। তুই বরঞ্চ শঙ্করণ সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। উনি আইআইটি খড়গপুরের। ওনার কাছে চলে যা।"

আইআইটি খড়গপুরে পাঁচ বছর কাটানোর জন্য শঙ্করণ সাহেব বাংলাটা ভালই জানেন, বলেনও। সবাইকে সঠিক পরামর্শ দেবার ব্যাপারে ওঁনার খুবই সুনাম রয়েছে; আর কারুর কোনও উপকার করতে পারলে উনি খুবই খুশী হন। অসীমের পরামর্শটা মনে ধরাতে ননীগোপাল শঙ্করণ সাহেবের কাছে গেল। শঙ্করণ সাহেব মনোযোগ দিয়েই সব শুনলেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা তুমি কোথা থেকে যাবে?"

ননীগোপাল নিজের মনেই ভাবে, কী গেরোরে বাবা, গেলে তো বাড়ী থেকেই যাব! ওঁর মনের ভাবটা বোধহয় শঙ্করণ সাহেব বুঝতে পারলেন আর বুঝতে পেরেই বললেন, "না, আমার মতন অনেকেই রাতের দুন এক্সপ্রেস ধরে যায় তো, তখন আমরা অফিস থেকেই যাই, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

ননীগোপাল জানাল যে সে সোমবার বাড়ী থেকেই যাবে।

শঙ্করণ সাহেব একটা সাদা কাগজ বের করে কাগজটার ওপরে মাঝামাঝি জায়গায় পেন্সিল দিয়ে একটা গোল এঁকে বললেন, "হিয়ার ইউ আর। তা তোমার থাকা হয় কোথায়?"

ননীগোপালের এখন খুবই করুণ অবস্থা। মনে মনে অসীমের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে জানাল যে সে রানাঘাটে থাকে এবং সেখান থেকেই সে রোজ সকালে অফিস করতে আসে এবং অফিস ছুটি হলে সন্ধ্যার সময় আবার ট্রেন ধরে বাড়ী ফিরে যায়।

শঙ্করণ সাহেব বললেন, "ও তুমি ডেলী প্যাসেঞ্জার, ঠিক আছে।"

এবার তিনি গোল জায়গাটায় একটা ক্রস আঁকলেন আর তার পাশে লিখলেন রানাঘাট। তারপর একটা সোজা লাইন টানলেন এবং সেটার মাঝে ছোট ছোট কতগুলো দাগ দিয়ে রেললাইনও এঁকে ফেললেন।

রেললাইন এঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কি ঠিক করলে? দুন ধরেই যাবে তো! তাহলে একেবারে ভোরবেলায় থার্মালে পৌঁছে যাবে।"

ননীগোপালের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা, জানাল যে সে দুনে করেই যাবে।

শঙ্করণ সাহেব এবারে অবাক হয়েই বললেন, "তাহলে তো তুমি দিনের বেলা অফিস করে তারপর এখান থেকেই যেতে পারো।"

এরপর রেললাইনের নীচে আর একটা গোল এঁকে লিখলেন শিয়ালদা। সেখান থেকে আর একটা লাইন টেনে লিখলেন বেলভেডিয়ার। তারপর কাগজটা ননীগোপালের হাতে দিয়ে, চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বোকারো যাওয়ার টিকিট আর হাওড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীর কথা বলে দাও। আর দাঁড়াও, প্রথমবার এলে, তোমার জন্য চা আনাই।"

কিছুই তো বুঝি না

©অর্ণব চ্যাটার্জী, ১৯৮৩ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

আজ সকাল আটটা নাগাদ সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন-এর পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। আমি এখানে পড়তাম, বাবাও পড়তেন। তাঁরও বাবা পড়তেন কিনা জানি না।

সেই সাত সকালেই ঘুম থেকে তুলে গিন্নী হাতে বাজারের দুটি ব্যাগ ধরিয়ে দিয়েছে – একটা মাছের আর একটা সবজি, ফল ইত্যাদি কেনার জন্য। কী কী সবজি ফল কিনতে হবে বলে দিয়েছিল, রাস্তায় যেতে যেতে ভুলেই গিয়েছি। যাই হোক, আন্দাজে একটা কাতলা মাছের আদ্ধেক ল্যাজের দিকটা, আর যা যা ফল সবজি সামনে পেলাম তাই কিনে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। আমি দেখেছি, আমি বাজারে গেলেই দোকানীরা ভয়ানক রকমের ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। আমাকে খুব আপ্যায়ন করে ডেকে দোকানের সেরা মাছ, সেরা ফল সবজি ধরিয়ে দেয়। অনেকসময় আদর করে চা খাওয়ায়, শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে খোঁজ নেয়। কিন্তু বাড়ি ফিরলেই তুলকালাম, আমি নাকি বাজার নয়, সারা সাঁত্রাগাছি শহরের সব থেকে পচা মাছটার সব থেকে পচা লেজটা কিনে নিয়ে এসেছি। আর ফল সবজি থেকে নাকি গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি এতদিনে, মানে এই গত তেত্রিশ বছরে বুঝে গিয়েছি, আমার গিন্নীর দ্রব্যগুণ বিষয়ে কোন ধারণাই নেই, আমি তাই একদমই তক্কাতক্কি করি না।

বাড়ি ফিরে আসছি, দুই হাতে বাজারের দুটি ব্যাগ, একটা মাছের আর একটা সবজি, ফলের। দেখি অনেক মহিলা-পুরুষ আমার কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন স্কুলটির সামনে জমায়েত হয়েছেন। প্রত্যেকের চোখে মুখে কেমন যেন একটা উদ্বিগ্নতা। স্কুল ছুটি থাকলে অনেক সময়ই এই স্কুল প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আর লক্ষী ভাণ্ডারের ফর্ম দেওয়া বা জমা নেওয়ার কাজ হয়। ভাবলাম সেরকমই কিছু হচ্ছে। এক ভদ্রলোককে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম – ভাই এত লোকের ভিড় কেন? ভদ্রলোক বললেন – আরে আপনি জানেন না? আজ থেকে তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। আমাদের ছেলেরা পরীক্ষা দেবে তাই আমরা এখানে। আমার হঠাৎ মনে পড়ল –আরে আমিও তো এবারের পরীক্ষার্থী, গতকালই আমাদের অঙ্কের টিউশন মাস্টার খগেন মৌলিক বাড়ি এসে বকাবকি করল। আমি জানতাম আজ ভূগোল পরীক্ষা, খগেন মৌলিক এসে আজকের অঙ্কের পরীক্ষা না জানালে

আমার কী যে হত? এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি বেমালুম ভুলে গেলাম কীভাবে?

কোনও ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে স্কুলের বিশাল লোহার গেটে ধাক্কা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর দারোয়ান বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল – কী ব্যাপার?

আমি বললাম – ভাই আমি পরীক্ষা দেব।

দারোয়ান কিছুটা হতচকিত হয়ে বলল - আপনি? আর পরীক্ষা তো শুরু হয়ে গেছে প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল। আপনাকে তো আর ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

বললাম – ভাই, একটা বছর নষ্ট হওয়া মানে আমার অনেক ক্ষতি।

কী ভাবল জানি না। সে আমাকে বলল – জেঠু আপনি এই লোহার গেটের বাইরের দিকে পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকায় আপনার নাম আছে কিনা দেখুন।

দেখলাম দরজার উপর সাঁটানো একগাদা বিজ্ঞাপন – সুবীর স্যারের কোচিং, অর্শের চিকিৎসা, বিক্ষোভ মহা মিছিল, শনিবারের বিশাল জন সমাবেশ, সহজে বশীকরণ, নেশামুক্তির সহজ উপায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের ভিড়ে পরীক্ষার্থীদের তালিকা আর চোখে পড়ে না। গিয়ে দরোয়ানকে বললাম – কোথায় লিস্ট? তখন পাশের বাড়ির জগন্নাথবাবু বললেন – দাদু, ঐখানে লিস্ট টাঙানো আছে।

আমাকে জগন্নাথবাবু দাদু বলে ডাকছে? এই একগাদা লোকের মাঝে? পরীক্ষা আছে। ছোটবেলায় বাবা মা বলতেন পরীক্ষার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। অনেক কষ্ট নিজেকে সামলে, সেই লিস্টে নিজের নাম দেখে দারোয়ানকে বললাম – ভাই আমার নাম তো আছে দেখছি।

দারোয়ান ভিতরে ঢুকতে দিল।

আমি সোজা পরীক্ষার হলে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে বললাম – স্যার আমি এসেছি, আমি পরীক্ষার্থী।

উনি তো আমাকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন – আপনি এত দেরিতে এসেছেন, আপনাকে কিছুতেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যাবে না।

অনেক অনুরোধ করার পর উনি বললেন – আপনার অ্যাডমিট কার্ড দেখান।

বললাম – আনতে ভুলে গিয়েছি।

উনি আরও বিরক্ত হয়ে বললেন – আপনাকে একদমই বসতে দেওয়া যাবে না।

বললাম – স্যার, আমি বয়স্ক লোক, দয়া করে এভাবে ফেরাবেন না।

আরও বললাম – আমি সাদা কাগজে একটা অঙ্গীকার দিয়ে দিচ্ছি যে আগামীকাল আমি আপনাকে অ্যাডমিট কার্ড দেখাব।

বয়স্ক মানুষ দেখে উনি আমার কথা ফেলতেও পারছেন না আবার গিলতেও পারছেন না। বললেন – এই ব্যাগে কী আছে? নকল টুকলি করার কাগজ?

আমি বললাম – না, না। মাছ আর কিছু ফল সবজি।

উনি গেলেন ক্ষেপে। বললেন – আপনি ভেবেছেন কী? মাছের বাজার নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছেন?

আমি ব্যাগ খুলে মাছ দেখাতেই পাশের একজন পরীক্ষার্থীই হবে মনে হয়, বলে উঠল – আরে দাদু, উফ!!! কী মারাত্মক দুর্গন্ধ, কোথায় পেলেন এই পচা মাছ?

ভাবলাম, দিই দুই থাপ্পড় ছেলেটিকে। কিন্তু ছোটবেলায় বাবা মা বলে দিয়েছেন পরীক্ষার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় নাকে ডবল রুমাল চাপা দিয়ে বললেন – মাছের ব্যাগটা আমার টেবিলে রাখবেন না, আমি শুদ্ধ শাকাহারি। ওটা বাইরে কোনো জায়গায় রেখে ভিতরে ঢুকে চেয়ারে গিয়ে বসুন।

এদিকে হঠাৎই মনে হল বাড়িতে তো জানেই না যে আজ আমার পরীক্ষা। আমি যদি পরীক্ষা দিতে বসে যাই তাহলে দেরি দেখে তো চিন্তা করবে। আবার ভাবলাম পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে গেলে তো লাঞ্ছনা গঞ্জনার সীমা থাকবে না। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, খগেন মৌলিক স্যারও কান টেনে ছিঁড়ে দেবেন। উনি নাকি আজ পর্যন্ত এগারোটা ছেলে আর চার চারটে মেয়ের কান টেনে ছিঁড়ে দিয়েছেন। আমি আর কী করি? পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে এলে আরও কত কিছু যে হবে। সাথে মোবাইলও নেই যে একটা খবর দেব।

পড়লাম এক উভয় সংকটে।

সাত পাঁচ ভেবে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। দেখলাম মাথার উপর পাখাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। একটি ছেলে এসে বলল – দাদু আপনি সিনিয়র সিটিজেন, আপনি আমার সীটে গিয়ে পাখার তলায় বসুন। আমি আপনার সীটে বসছি। আমার পাখা লাগবে না।

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম – মানবিকতা আজও বেঁচে আছে।

ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। খাতা আর প্রশ্ন পত্র দেওয়া হল। দেখি বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা। পাশের ছেলেটিকে ফিশফিশ করে বললাম – আজ অঙ্কের পরীক্ষা ছিল না?

ছেলেটি কিছুই জবাব না দিয়ে কীরকম একটা যেন মুখ করল, আজকালকার ছেলেমেয়ের মুখভঙ্গিতে নাকি অনেক ভাবের আদানপ্রদান হয়। আমি কিছুই বুঝলাম না।

এবার খেয়াল হল পেনই তো নেই লিখব কী দিয়ে। অন্য পাশের মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করছিল। বলল – দাদু, আমার কাছে অতিরিক্ত পেন আছে আপনি নিন। বললাম – খুবই উপকার করলে বাবা।

হলের এদিক ওদিক থেকে অনবরত দাদু দাদু শুনে রাগ হলেও চেপে গেলাম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। দরকার হলে পরীক্ষার পরে রাস্তায় নেমে

ওঁদের ঠ্যাঙানি দিলেই হবে। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েদের ঠ্যাঙানো কি উচিৎ হবে?

বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সাথে অনেকদিন কোনও যোগাযোগ নেই। গতকাল খগেন মাস্টার অঙ্ক করিয়েছে। তার আগে কয়েকদিন ভূগোল পড়েছি, কিলিমাঞ্জারো মরুভূমি, সাহারা পর্বত, ব্রহ্মপুত্র মহাসাগর ... এইসবই মনে আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা প্রশ্নের কিছুই বুঝতে পারছি না। খাতা একেবারে ফাঁকা রেখে উঠে যাওয়াটা প্রচণ্ড অসম্মানের। তাই কবিগুরু, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ইত্যাদি থেকে শুরু করে আজকের শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আর্যতীর্থ ইত্যাদি স্বনামধন্য সাহিত্যিকের লেখা যা যা পড়েছি এবং তার থেকে যেটুকু মনে ছিল তাই নিজের ভাষায় লিখে খাতা ভরাতে শুরু করলাম। মনে হলো বাল্মীকি রামায়ণ থেকেও কিছু লেখা উচিৎ, তাই অশোকবনের সীতা আর লবকুশের কাহিনীও কিছুটা লিখে দিলাম। একটা অতিরিক্ত পাতাও লেগে গেল।

পরীক্ষা শেষে বাইরে বেরিয়ে দেখি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সাংবাদিকে ছেয়ে গেছে। বুঝলাম ষাটোর্ধ আমিই ওদের আজকের নিশানা। একজন অত্যন্ত পাকা টাইপের সংবাদিক এগিয়ে এসে বললেন – দাদু, এই বয়সে পড়াশোনার ধকল নিচ্ছেন কীভাবে?

আমি বললাম – কোন চ্যানেল থেকে এসেছেন আপনি ?

শোনার পর বললাম – আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব না। আপনার চ্যানেল পক্ষপাতিত্ব করে। সারাদিন আমাদের মত বয়স্ক লোকেদের নিয়ে হাসি মজা করা ছাড়া কোনও কাজ নেই আপনাদের।

একজন মহিলা সাংবাদিক আবার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন – আপনি কি সাহিত্য আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মধ্যে ভেদাভেদ করেন – মানে বিজ্ঞানের বিষয় গুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কি সাহিত্যের বিষয়গুলোকে অবহেলা করেন?

আমি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়া চিরকালই এড়িয়ে চলেছি। ফলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। বোধ হয় এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিছুটা মেজাজ হারিয়ে ভাষাও হারিয়ে ফেললাম। কোনও ক্রমে আমতা আমতা করে বললাম – আমি পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করি না – সাম্যতা বজায় রাখা আমার মজ্জাগত।

মহিলা সাংবাদিকের সংখ্যাই বেশি হওয়ার ফলে প্রশ্ন উত্তরের পর্ব ধীরে ধীরে বেশ মনোরম হয়ে উঠছিল। ভাবছিলাম, এই প্রশ্নোত্তর যদি না শেষ হয়...

হঠাৎ কানের গোড়ায় তেত্রিশ বছরের সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল – সকালে বাজারের থলে হাতে বেরোনোর সময় বলেছিলেন – আজ কিন্তু কারোর সাথে কথা বলতে দাঁড়িয়ে যেও না। তুমি বাজার থেকে আসলে তবেই কিন্তু রান্না

চড়বে, ঘরে কিছু নেই – আর হ্যাঁ, একটা ইলিশ মাছ অতি অবশ্যই আনবে – এই সিজনের প্রথম ইলিশ খাব।

এত বেলায় শাক সবজি ইলিশ কিছুই পেলাম না। পরীক্ষার খাতায় অসংলগ্ন কিছু লেখা – হাজার চেষ্টা করেও পরীক্ষক পাশ করাতে পারবেন না – সাংবাদিকদের সামনে অপ্রস্তুত অবস্থা, যা টিভিতে সম্প্রচারিত হবে আর যা দেখে সকলে হাসবে – সর্বোপরি বাজারের থলে খালি দেখে গিন্নির কী অবস্থা হবে ... কুলকুল করে ঘামতে আরম্ভ করলাম।

ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল – উঠে দেখি ঘড়িতে সকাল ছ'টা বাজতে পাঁচ।

যাত্রা ও অযাত্রা, শুভ ও অশুভ – মানি বা না মানি!

©স্নেহাশীষ ঘোষ, ১৯৭৪ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

আমাদের বিশ্বাসে যাত্রা-অযাত্রা, শুভ-অশুভ, আচার-বিচার, লক্ষণ-অলক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে কুসংস্কার কম-বেশি চলছে, চলবে। মনের মধ্যে যেটা কাজ করে সেটা হয়ত একটা ভয়, কারও কম আর কারও একটু বেশি, কেউ মানে, আবার কেউ মানে না। এখন আমাদের জীবনের এক বড়ো দুর্ঘটনার কথা লিখব আর তার সাথে আমাদের যাত্রায় সঙ্গের ব্যাগে আচার-বড়ির সংস্কার (বা কুসংস্কারের) যোগাযোগ। যা লিখতে চলেছি, সে গল্প হলেও সত্যি।

আমি সে সময় আল-এইন নামের এক জায়গায় কর্মরত, দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ১৩০ কিমি দূরে। আল-এইন শহরটি আবুধাবি আমিরশাহীর রাজধানী আবুধাবি শহর থেকে ১৫০ কিমি মতো পূর্ব দিকে ওমানের সংলগ্ন একটা ছোটো শহর, যাকে বলে মরুদ্যান (Oasis), UAE'র একটা জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট। সেখানেই ১৯৯১ সালের এই ঘটনাটা। আসল ঘটনাটির সময়কাল ছিল সব মিলিয়ে বড়ো জোর হয়তো দশ সেকেন্ড, তার বেশি নয়। পড়ার সময় গল্প মনে হলেও ঘটনাটা কিন্তু এখন যা বলছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

বছরে এক মাসের ছুটি কাটিয়ে সেদিন আমরা দুবাই ফিরেছিলাম বিকেল নাগাদ। সাথে আমাদের এক বছরের ছেলে আর চার বছরের মেয়ে। আমাদের নিয়ে যেতে কোম্পানির সুদানী PRO সঙ্গে ওর এক বন্ধুকে নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছে। ওদিকে আবার আমার দুবাইয়ের এক বন্ধু, নসরতও এসেছে তার স্ত্রী আর তাদের তিন বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

কোম্পানির গাড়িতে (Nissan Altimma, তখন একটু স্পোর্টি টাইপ ছিল আর আমিই চালাতাম) জিনিসপত্র তুলতে গিয়ে দেখলাম সব আঁটছে না। ট্যাক্সি নেওয়ার কথা ভাবছি, সেই সময় আমার বন্ধু বলল, "চলো, কাল তো Friday হ্যায় (Weekend, ছুটির দিন), আপ লোগোকো ছোড়কে আতা হুঁ।" দেড় ঘণ্টার পথ, আরাম করে আসা-যাওয়া ঘণ্টা চার-পাঁচের ব্যাপার। বন্ধু নসরত বোম্বের ছেলে, সপ্তাহখানেক হল UAE'র ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে, আর কোম্পানিও ওকে একটা নতুন Toyota Corolla Station Wagon গাড়ি দিয়েছে। তাই লং ড্রাইভের একটা উত্তেজনাও হয়তো তার মনে ছিল। গাড়ির বুটে অনেক জায়গা, মালপত্র তোলা হল। আর আমার কোম্পানির সহকর্মীকে বললাম ওর ইচ্ছে মতো ফিরে যেতে।

এয়ারপোর্ট থেকে রওয়ানা দিলাম। বন্ধু নসরত ড্রাইভারের সীটে, আমি তার ডানদিকে আর পিছনে আমাদের দুজনের দুই বউ, তাদের কোলে দুই শিশু, আমাদের মেয়ে। সন্ধে হয়ে আসছে। সেই সময় ওই দেশ এখনকার মতো এত আলো ঝলমলে হয়নি। Highway ভালো হলেও, পুরো রাস্তায় আলো ছিল না। শুধু লোকালয়ের কাছাকাছিই কিছু street light ছিল।

কথা হল, ওই বন্ধু আমাদের আল-এইন'এ ছেড়ে দুবাই ফিরে আসবে। রওনা দিলাম, আর সাথে টুকটাক গল্প। বন্ধুবর সবে ওখানে গাড়ি চালানো শুরু করেছে, নতুন লাইসেন্স, নতুন গাড়ি। সন্ধে হয়ে গেছে বেশ খানিক আগেই। চারিদিক অন্ধকার। যেমন লিখেছিলাম, তখনও হাইওয়েতে স্ট্রীট লাইট হয়নি। বৃহস্পতিবার সেখানে সপ্তাহান্ত। গল্প করতে করতে আমরা দুবাইয়ের সীমানা ছাড়িয়ে তখন আবুধাবি আমিরাতে ঢুকে পড়েছি, বলা যায় প্রায় মাঝরাস্তায়। জায়গাটার স্থানীয় নাম 'আল ফাক্কা'। রাস্তার দু'ধারে আর মাঝের মিডিয়ান গাছপালার সারিতে ভরে গেছে আর রাস্তাও অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইটে রাস্তার সামনেটা আর দু'দিকের গাছ ছাড়া বিশেষ কিছু আর দেখা যায় না। পিছনের সিটে বাচ্চারা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মহিলাদের গলার আওয়াজও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। আমরা দুজনে শুধু নীচু আওয়াজে কথা বলে চলেছি আর মোটামুটি ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটাও বেশ গতিতেই ছুটে চলেছে।

আমাদের যাত্রায় হঠাৎ তাল কাটল, কানে এল বন্ধুর মুখ থেকে একটা আওয়াজ, "ওহঃ-হোঃ"। গাড়ির হেডলাইটে দেখলাম সামনে দশ-বারো মিটারের মধ্যে হঠাৎ এক মোটাসোটা লোমশ সাদা ছাগল (বা ভেড়াও হতে পারে) এসে হাজির। দেখলাম গাড়ির দিকে ঘুড়ে তাকানো তার জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, যেন কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। হাইস্পিডের মধ্যেই প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষায় রাস্তা আর টায়ারের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজ আর তার সাথে সহজাত প্রবৃত্তির জেরে ছাগলটাকে বাঁচানোর তাগিদে ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘোরানো। পিছন থেকে মহিলাদের ভীত-সন্তস্ত্র চিৎকার। বুঝলাম গাড়িটা আর কন্ট্রোলে নেই, অসহায়ের মতো হেলে দুলে দিশাহারা হয়ে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা বোঝার সুযোগই পেলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কিছু একটা ঘটে গেছে। ভয়ে আমাদের সবার চোখ যে নিশ্চয়ই তখন বন্ধ হয়ে গেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হৃদয়ের স্পন্দন সেই মুহূর্তে ছিল কিনা বলতে পারব না, তবে পরে সেটা দ্বিগুণ হল, তেমনটাই অনুভব করলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমরা কেউ আমাদের মধ্যে ছিলাম না, টোটাল ব্ল্যাক-আউট হয়ে গিয়েছিল।

সম্বিত ফিরে পেলে বুঝলাম, আমাদের গাড়ি রাস্তা ছেড়ে মিটার দশেক দূরে রাস্তার পাশে বালির সমতল জমিতে এসে থেমে গেছে, গাড়ির মুখ উল্টো হয়ে

দুবাইয়ের দিকে আর গাড়ির ভিতরে ও বাইরে চারিদিকে বালি উড়ছে। চট্ করে এক নজরে গাড়ির ভিতরে দেখলাম সবাই নিজের নিজের জায়গাতেই বসে আছে। পাশে বসে ড্রাইভার বন্ধু বাস্তবিকভাবেই কাঁপছে। আমারই মুখ থেকেই প্রথম কথা বেরোল, "আপ সবলোগ ঠিক হো?" মৃদু আওয়াজে সকলের সায় পেলাম। বললাম "জলদি সব বাহার নিকলো।" আমরা নিজেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে পিছনের দরজা খুলে দিলাম। কেউ কিছু বোঝার আগে সকলে বাইরে এসে ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে গাড়ি থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাচ্চাদের দেখে নিলাম কারও কোথাও চোট লেগেছে কিনা। তারা হয়তো জানতেই পারল না, তাদের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে। মায়েদের সঙ্গে তারাও সবাই ঠিক ছিল। একটু ধাতস্থ হলে অনুভব করলাম উপরওয়ালার অশেষ কৃপায় আমাদের দুই পরিবারের সকলের নতুন জীবন লাভ হয়েছে। এবং সবাই আপাতদৃষ্টিতে অক্ষত।

বুঝলাম, হাইস্পিডে ব্রেক আর স্টিয়ারিং দুটোই একসাথে প্রয়োগ করায় আমাদের গাড়িটা ডানদিকে ঘুরে এসে ডিগবাজি খেয়ে আবার সোজা হয়ে উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সারা গাড়ি ধুলোয় ভর্তি, বনেট আর ওপরের ছাদ বেশ ভালো রকম তোবড়ানো, সামনের ও পিছনের উইন্ডস্ক্রীন ভাঙা, গাড়ির সামনের দুটো এবং বাঁ দিকের পিছনেরটা, মানে তিনটে টায়ার ফেটে গেছে। তবে পিছনে রাখা সব মালপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে, শুধু আমাদের মেয়ের স্কুলের ব্যাগটা গাড়ি থেকে ছিটকে গিয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে, তুলে রাখলাম। আমাদের বউরা দুজনেই বলল, তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের নিজেদের কোলের ছোটো ছেলে ও মেয়ে কোল থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন ছিটকে গিয়ে আবার কোলের মধ্যে এসে পড়ল। কথাটা শুনে বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম পাসপোর্টটা নেই। ডিগবাজির সময়ে পকেট থেকে বেড়িয়ে গাড়ির মধ্যেই পড়েছিল, তুলে নিলাম। সবাই নিজের নিজের পার্স, ওয়ালেট, পাসপোর্ট চেক করে নিলাম। পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সময় লাগলো। বুঝলাম কপালজোরে আমরা সবাই প্রাণে বেঁচে গেছি আর আমাদের কারও গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। সব মিলিয়ে হয়তো আট-দশ সেকেন্ডের এই ঘটনা, তবে এটা একটা, যাকে বলে "অবিশ্বাস্য চমৎকারি" ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। রাখে হরি তো মারে কে! বিশ্বাস করতেই হল।

এর পরের ঘটনা না লিখলেও আন্দাজ করা যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকে লোকারণ্য। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে দৌড়ে কেউ জলের বোতল, কেউ fire extinguisher, কেউ তাদের first aid kit, কেউ মাদুর এমনকি কেউ তাদের গাড়ির কুশান পর্যন্ত নিয়ে এল। আমরা সবাই ঠিক আছি কিনা, কারও কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, জল খাব কিনা, সকলের একই চিন্তা, একই প্রশ্ন। আমাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে, হাতে হাত মিলিয়ে আশ্বস্ত করা, বিশেষত বাচ্চারা ও মহিলারা

সকলে ঠিক আছে কিনা তার তদারকি করা। আমাদের কারও কিছু হয়নি জেনে প্রায় সকলেরই সেই পরিচিত আরবি আশ্বস্তি "আল হামদুলুল্লাহ" আর "আল্লাহহো আকবর"। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা, তাঁকে ধন্যবাদ। একটু পরে দেখি আমাদের PRO ও এসে গেছে। আমাদেরকে দেখে "ওয়াল্লাহ্! কুল্লু তামাম?" হায় আল্লাহ্, তোমরা সবাই ভালো আছ তো?" সবাই ঠিক আছি দেখে সেও শান্ত হল।

কোনো স্থানীয় ভালো মানুষ নিশ্চয়ই ট্রাফিক পুলিশকে খবর দিয়ে থাকবেন। তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যেই "আল ফাক্কা" নামের লোকালয়ে একটা হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ পোস্ট ও ছোটো একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ট্রাফিক পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির। তাঁরা এসেই প্রথমে জমে যাওয়া ভিড় আর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোকে চলে যেতে বললেন। ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জারদের একদিকে আসতে বলে, মেডিক্যাল স্টাফ আমাদের, বিশষত ছোটদের পালস ও স্টেথো দিয়ে হার্টবিট চেক করে জিজ্ঞাসা করলেন কারও কোথাও চোট লেগেছে কিনা বা কোনো ব্যথা? আমরা সবাই ঠিক আছি জেনে ওরা আবার অ্যাম্বুলেন্সে ফিরে গেলেন। আর নিয়ম মাফিক ট্রাফিক পুলিশ আমার ড্রাইভার-বন্ধুর ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির স্মার্ট-কার্ড চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সংক্ষেপে জেনে নিলেন ঠিক কী ঘটেছিল। ফিতে দিয়ে মাপজোপ করে দুর্ঘটনার রিপোর্ট তৈরি করলেন। আর আমরা কোম্পানির গাড়িতেই সবাই পুলিশ স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম।

পুলিশ স্টেশনে মেজরের সাথে বসে বন্ধু নসরতের আবার কথা হল, সব ঘটনার বিবরণের পুনরাবৃত্তি করতে হল। আমরা পিছনে বসে সবই শুনছিলাম। দিনের আসল চমক তখনও বাকি। সব শুনে মেজর আমাদের অবাক করে নির্লিপ্তভাবে নিজের আরবী ভাষায় যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায়, "ওটা তো একটা জিন ছিল। এরকম ছোট-বড় অ্যাক্সিডেন্ট ওই একই জায়গার এক-দুই কিলোমিটারে ব্যবধানে মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে।" ওঁর কথা শুনে বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও শরীরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা শিহরণ খেলে গেল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমাদের সকলের মেডিকেল টেস্ট আর হেল্থ রিপোর্টও তৈরি হয়ে গেল। প্রধানত ইনসিওরেন্স ক্লেম-এর জন্যেই। ওঁদের মতে গাড়ির গতি এই রাস্তার ১২০ কিমি এর উর্ধ্ব সীমার বেশ উপরেই ছিল, প্রায় ১৪০-১৫০ কিমি মতো হবে, তবে হয়তো আমাদের দুরবস্থা দেখে মেজর তাঁর রিপোর্টে গাড়ির গতি বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যেই লিখে দিয়েছিলেন যাতে ইনসিওরেন্স ক্লেম-এ কোনো অসুবিধা না হয়। সব কাগজী কারবার শেষ করে সকলে আমার ওই কোম্পানির গাড়িতে চড়েই আরও মিনিট ৪৫ পরে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। দেখলাম আমাদের PROর এক বন্ধু আমাদের সব জিনিষপত্রগুলো নিয়ে, বাড়ির নীচে অপেক্ষা করছে। ওকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পেলাম না, শুধু তার হাত দুটো ধরে বললাম

"সুকরন" (ধন্যবাদ)। PRO আমার গাড়িটা আমাকে দিয়ে ওর বন্ধুর সাথে চলে গেল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা হবে।

মাস খানেকের গরমের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে, প্রথমে বাড়িটা পরিস্কার করাটা যেমন জরুরী হয়ে পরত, তেমনই কিছু বাজারও করতে হয় খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে, বিশেষত সাথে ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে। বন্ধু নসরত তার পরিবারকে নিয়ে আমাদের সাথেই রাত্রে থেকে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে আমরা নিজেরা একটু বসলাম, কী ঘটল, তার বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা সকলেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ ছিলাম। ঘুমের প্রয়োজন ছিল। সে রাত্রে আমাদের আলোচনা বেশি দূর গড়ালো না।

পরের দিন শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকালে জলখাবার খেয়ে বন্ধুকে নিয়ে সেই অকুস্থানে এলাম। আগে কোনও গুরুতর দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি এই রকম অবস্থায় দেখলে ভাবতাম এটা কীভাবে হল? আর এখন আমাদের গাড়িটার এই অবস্থা দেখে ভাবলাম আমরা বেঁচে গেলাম কীভাবে? আবার একবার মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। বন্ধুকে আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলতে শুনলাম "আল্লাহহো আকবর"। তখন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোয় কোনো কার্পণ্য ছিল না। যত রকমভাবে দেখা যায়, গাড়িটাকে দেখলাম – সামনে, পিছনে, পাশে, সবটাই। একা দাঁড়িয়ে করুণ চেহারায় গাড়িটা যেন সাহায্য চাইছে, "আমাকে বাঁচাও"। ভাবছিলাম কীভাবে এই কাণ্ডটা ঘটল। সব দেখে বুঝলাম গাড়ি fully loaded থাকার কারণে যেমন দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, ঠিক তেমনই আবার এই বেশি ওজনের জন্যেই হয়তো গাড়িটা একটা ডিগবাজি খেয়েই দাঁড়িয়ে গেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এত কাণ্ডের পরেও গাড়িটা কিন্তু একবারের চেষ্টায় স্টার্ট হয়ে গেল। হার্ট চলছে কিন্তু চলে ফিরে বেড়ানোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই।

গতকালই বন্ধু নসরত তার ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে এই অ্যাক্সিডেন্টের কথা জানিয়ে Inspection এর জন্যে লোক পাঠাতে বলেছিল। ওখানে দিনের কাজ শুরু হতো সকাল ৭টায় বা ৮টায়। ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোক এল সময়মতোই আর তার পিছনে এক Recovery Vehicle! অল্পকথায় জেনে নিলেন দুর্ঘটনার বিবরণ। বেশ কয়েকটা ছবি তুললেন, কিছু মাপজোপও করে নিলেন। বন্ধুকে নির্দেশ দিলেন পরের দিন গাড়ি সংক্রান্ত সব Original Document নিয়ে কোম্পানির Authorised Signatory (PRO)র সাথে ওদের অফিসে আসতে (গাড়িটা ওর কোম্পানির নামে registered বলে), Claim-এর দরখাস্তের প্রক্রিয়া শেষ করার জন্যে। উনি চলে গেলেন আর তার পিছনে আমাদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটাকে তুলে সেই Recovery Vehicle। হাইওয়েতে কোনো গাড়ি তখন tow করে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। আমরা সবাই যেমন সেদিন নতুন জীবন পেয়েছিলাম, ঠিক

সেরকমই বন্ধুর কোম্পানিও মৃতপ্রায় গাড়িটার বদলে একটা নতুন গাড়ি পেয়েছিল। সব ভালো যার শেষ ভালো।

ওরা সব চলে গেল, কিন্তু আমরা দুজন সেখানে থেকে গেলাম, শুধু একটু বুঝে নিতে, যে গতকাল এখানে ঠিক কী হয়েছিল? হাইস্পিডে ব্রেক করার দরুণ রাস্তায় টায়ারের কালো দাগগুলো আর গাড়িটার আঁকা-বাঁকা যাওয়ার পথটা তখনও স্পষ্ট। রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের গাড়িটা উল্টেছিল, সেই জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটু আগেই সেখানে আখাড়ার কুস্তি চলছিল। ছাগলটা কোত্থেকে এলো দেখার জন্যে রাস্তার ডানদিক বরাবর Chain Link Fence এর বেশ কিছুটা দৈর্ঘ ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। কাছাকাছি ১০০-১৫০ মিটারের মধ্যে fence'এ সেরকম কোনো খোলা জায়গাই দেখলাম না, যেখান থেকে ছাগলটা বাইরে থেকে রাস্তায় ঢুকে পরতে পারে বা রাস্তার দিক থেকে বাইরে চলে যেতে পারে। শুনলাম এর আগেও অনেকেই তাকে খোঁজার চেষ্টা করেও পায়নি।

মেজরের 'জিন'-এর কথা মনে পড়ে গেল। সেই দুপুরেও সন্দেহ গেল না, এদিক ওদিক চোখ চলে গেল, যদি তাঁকে দেখা যায়। তাঁর দেখা তো আমরা পেলামই না, তবে আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ঈশ্বর যেন আমাদের এই Roller Coaster এর স্টেজটা আগে থেকেই ডিজাইন করে রেখেছিলেন, যাতে আমাদের কোনো ক্ষতি না হয়। ঠিক ওইখানেই রাস্তার সংলগ্ন একই লেভেলে বেশ বড়সড় ১৫ মিটার x ৩০ মিটার মতো একটা বালি-মাটির চাতাল (lay by type), হয়তো রাস্তা তৈরির সময় অতীতে এখানে কোনো সাইট-অফিস বা কোনো স্টোরেজ-ইয়ার্ড ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঠিক সেখানেই আমাদের গাড়ি উল্টে ডিগবাজি খাওয়ার জন্যে সুন্দর প্রশস্ত একটা নরম জায়গা যেন আগে থেকেই বানানো হয়েছিল। কিন্তু রাখে হরি তো মারে কে?

আমরা চারিদিকে সব দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত কিছুই না ঘটতে পারত। ১০০ মিটার পিছনে এই ঘটনাটি ঘটলে ডানদিকে নীচে সংলগ্ন ঢালু জমিতে পড়ে গাড়িটা ফেন্স এ গিয়ে আটকে যেত। অবস্থাটা আরও খারাপ হতে পারত, যদি ১০০ মিটার সামনে এগিয়ে ঘটনাটা ঘটত। তাহলে ডানদিকে মাত্র ২ ফুট উঁচু Metal Barrier আর তার মিটার ছয়েক নীচে Camel Underpass। সেই বেরিয়ার ভেঙে বা টপকে গাড়ি যদি নীচে পড়ত, তাহলে ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারত। মিডিয়ানের কোনো খেজুর গাছে ধাক্কা খেয়ে নয়ত ফাঁক গলে যদি গাড়িটা ওপারের উল্টোদিকের লেনে চলে গিয়ে রাস্তার ওপরেই কাত হয়ে বা উল্টে পরে থাকত, আমরা চট্ করে গাড়ি থেকে বেরোতেও পারতাম না। আর সেই অবস্থায় পিছন থেকে অন্য কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা মারলে আগুন লেগে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সম্ভাব্য ঘটনাগুলো ভাবলে এখনও সারা

শরীরে কাঁটা দেয়। অনেক কিছুরই সম্ভাবনা ছিল, কিন্ত নিয়তি কোনোটাই হতে দেয়নি।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে অমি আমার বন্ধু ও তার পরিবারকে দুবাইয়ে ছেড়ে এলাম। ফিরতি পথে সেই অকুস্থলে গাড়িটার স্পীড কম করে আরও একবার জায়গাটা দেখে নিলাম। জানতাম না যে ওই জায়গাটাই আমাদের জন্য একটি তীর্থস্থানের মতো হয়ে যাবে। এই ঘটনার পরে যতবারই ওই রাস্তায় যাতায়াত করেছি, ঠিক ওইখানে গাড়ির গতিটা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমে যেত। এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দেখে সেদিনের কথা ভেবে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আবার গাড়ির গতি বাড়াতাম। স্ত্রী সাথে থাকলে বলতো, "চলো, চলো, দাঁড়াচ্ছো কেন?" উত্তরে আমি বলতাম, বোঝানোর চেষ্টা করতাম, "এটা আমাদের একটা তীর্থস্থান, ভয় পাচ্ছো কেন, ধন্যবাদ জানাও।"

এবার উপসংহারে আসা যাক। বড়সড় দুর্ঘটনাও ঘটল, বেঁচেও গেলাম, যা হবার ছিল হল, যাকে বলে নিয়তি। আচার, বড়ি সাথে না থাকলেও এটাই হত। গিন্নিকে শত বুঝিয়েও সেটা মানাতে পারলাম না যে এই আচার নয়, বড়ি নয়, অযাত্রা নয়, অশুভ নয়, দুর্ভাগ্য নয় বরং সেদিনে এগুলো ছিল আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক। আমরা খুব জোর সেদিন বেঁচে গেছিলাম, হয়তো এদেরই জন্যে। কে কার কথা শোনে। এরপর থেকে আচার বা বড়ি ভবিষ্যতে আমাদের আর কোনো যাত্রায় সহযাত্রী হতে পারেনি।

এটা আমাদের "গল্প হলেও সত্যি" ঘটনা। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এটা আমাদের কোনো দুর্ঘটনা ছিল না বরং ছিল একটা শুভ মুহূর্ত, যখন আমাদের পুনর্জন্ম হয়েছিল। এখন আমার পাঠকরা কী বলবেন, কী বিশেষণ দেবেন আমাদের এই যাত্রার, এই ঘটনার বা এই মুহূর্তের – অযাত্রা, অশুভ, অলক্ষুনে, অলৌকিক, নিয়তি নাকি চমৎকার?

রাজস্থানের জাওয়াই বেরা

©তাপস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

নভেম্বরের রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। রাজস্থানের জাওয়াই বেরা এলাকার শীত সূর্যাস্তের পরেই বেশ জাঁকিয়ে বসে। রিসর্টে নৈশভোজ সেরে শোয়ার আয়োজন করছি, পরদিন ভোরবেলা লেপার্ড সাফারিতে যেতে হবে। তখনই ফোন বেজে উঠল। মহারাণা প্রতাপ সিংয়ের চতুর্থ পুত্রের বংশধর রানাওয়াত সিং (যিনি জাওয়াই লেপার্ড সংরক্ষণের একজন প্রতিভূ এবং কপালগুণে আমাদের রিসর্টের মালিকও) জানালেন যে সন্ধেবেলা জিয়া নাম্নী একটা লেপার্ড বাছুর শিকার করেছে, আর একটু আগেই তাকে সেই শিকার খেতে দেখা গেছে। সিংজী নিজে যাচ্ছেন সেখানে, আর চাইলে আমরা তাঁর সঙ্গে যেতে পারি।

হাড়কাঁপানো শীতের রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মেওয়ারের রাজপরিবারের বংশজের সঙ্গে বাঁকা চাঁদের আলোয় লেপার্ডের নৈশভোজ দেখার এহেন রাজকীয় সুযোগ হাতছাড়া করার কোন মানেই হয় না। তাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জ্যাকেট চাপিয়ে ক্যামেরা নিয়ে রেডি, জিপসি আসতেই চড়ে পড়লাম। রানাওয়াত সিংজী নিজেই ড্রাইভ করছেন, পাশে ওনার অনুচর। হাইওয়েতে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর জিপসি পাশের মেঠো রাস্তায় পড়ে অন্ধকার চিরে দূরের পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল।

জাওয়াই বেরা এলাকায় গাছ বলতে মূলতঃ বেশ বড়ো ক্যাকটাস আর কাঁটা ভর্তি বাবলা গাছ। মেঠো রাস্তায় জিপসি এগিয়ে চলার সময় একটু অসাবধান হলেই লম্বা ডালের কাঁটায় হাত মুখ ছড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিরানব্বই শতাংশ। এহেন কণ্টকসংকুল রাস্তায় এই গভীর রাতে একটু এগিয়ে গিয়েই সিংজী জিপসির হেডলাইট ডিমার করে দিলেন। নিকশ অন্ধকারের একটা শিরশিরানি অনুভূতি এবার আরো কাছে এসে ছুঁচ ফোটানো ঠাণ্ডার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আমাদের আঁকড়ে ধরল। সামনে তিনফুট দূর অবধি আলো আর ওই আলোর রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গল যেন প্রেতপুরী। জমাট অন্ধকার রাত্রির তমসায় আদিম প্রবৃত্তি সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে। মাঝেমধ্যে সিংজী আশেপাশের পাহাড়গুলোতে আর ধূসর জমিতে বেশ হাইবিমের টর্চ ফেলছেন। জমিতে একবার টর্চের আলো পড়তেই হঠাৎ একটা নাইটজার পাখি ফড়ফড়িয়ে উড়ে গেল।

এইরকম জনমানুষহীন রুক্ষ পাহাড়ি জমি আর তারাভরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল মানুষ হয়ে মিছিমিছিই জন্মালাম। একটা পাখি যখন ডানা মেলে

উড়ে যায়, একটা পাতা যখন হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে মাটিতে পড়ে, একগোছা ফুল থেকে যখন গন্ধ ওড়ে, যখন ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে হরিণী কালো চোখে একবার তাকিয়েই শুকনো পাতায় মচমচানি তুলে দৌড়ে পালায়, লেপার্ড যখন তার চিত্র-বিচিত্র শরীরে জঙ্গলের কিনারায় নিঃশব্দে দাঁড়ায়, সারা জীবন সারা শরীর মন দিয়ে তা অনুভব করার মত বনের প্রাণী না হয়ে শহরের প্রাণী হয়ে জন্মে জীবনটাই মাটি হয়ে গেল।

এরমধ্যেই বেশ কিছুক্ষণ আমাদের জিপসি লেপার্ডের খোঁজে এই টিলা থেকে ওই টিলা ঘুরছে। একটা ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে বাঁক নিতেই হঠাৎই নাকে একঝলক দুর্গন্ধ এসে লাগল, টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম মৃত আধখাওয়া বাছুরটাকে। শিকার তো খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু যেরকম আশা করেছিলাম যে শিকার আর শিকারীকে একসাথেই পাওয়া যাবে, তেমনটা তো হল না। ভোজনের একপ্রস্থ শেষ করে শিকারী ফিরে গেছে ততক্ষণে। শিকারের আশেপাশে পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল যে শিকারী একা নয়, তার সঙ্গী তার দুই শাবক। জানা গেল যে শাবকদের বয়স চার মাস, মাংস খেতে শিখেছে হয়তো বা মাত্র মাসখানেক আগে। এইসময়টা লেপার্ড এর বাচ্চাদের জন্যে বেশ বিপদজনক, কারণ শিকারের গন্ধে হায়না বা অন্য পুরুষ লেপার্ড কাছে চলে এলে বাচ্চাদের মেরে ফেলতে পারে। তাই মা লেপার্ড জিয়া তার শাবকদের নিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে। হয়তো আবার ফিরতে পারে শিকারের কাছে, কিন্তু ফিরলেও তা হবে প্রায় শেষ রাতে। চারপাশে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতার মধ্যে এই অরণ্য নিশ্বাস বন্ধ করে যেন কোনো নিশ্চিত মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

জাওয়াই বেরার এই জঙ্গলভরা পাহাড়ি এলাকা এখনকার দুই রাজ্যের, অর্থাৎ রাজস্থান আর গুজরাটের দুই রাজধানীর মধ্যিখানে। স্বভাবতই ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে এই দুই এলাকার বণিকদের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের প্রধান পথ ছিল এই জাওয়াই হয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই জঙ্গলমহলে ডাকাতদের উৎপাত শুরু হয়, যারা বণিকদের পণ্য লুট করত। ক্রমে এক ডাকাত সর্দার বলিয়ার ক্ষমতা এমন বেড়ে ওঠে যে সে নিজেকে ঐ এলাকার রাজা ঘোষণা করে। এরপরই আশেপাশের রাজাদের টনক নড়ে, আর তাদের অনুরোধে মহারাণা প্রতাপ তার সৈন্য পাঠিয়ে ডাকাতদের ভবলীলা সাঙ্গ করেন, আর তারপর তাঁর চতুর্থ সন্তান শেখা সিংকে এই এলাকার ঠাকুর করে পাঠান। এই শেখা সিং এর বংশের উত্তরাধিকারীরাই এখন বেরার এবং আশেপাশের গ্রামের জমিদার। তাঁদেরই একজন রানাওয়াত সিং, যার ভরসায় এই নিকষ কালো কনকনে শীতের রাতে হেডল্যাম্প আর টর্চের ভরসায় আমরা সেই বাচ্চাসমেত ভয়ংকর লেপার্ডিনীর খোঁজে এই পাহাড় ওই পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মাঝেমধ্যে বহুদূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ আসছে, সাথে আশেপাশে প্যাঁচার ডাক আর ময়ূরের পাখা ঝাপটানি। সিংজীর সেই পাহাড়ে পাহাড়ে হাইবিমের টর্চ

ফেলার কথা আগেই বলেছি। উনি তাড়াতাড়ি এক একটা পাহাড়ের গায়ে টর্চের আলো এলোপাথাড়ি বুলিয়েই নিভিয়ে দিচ্ছিলেন, আর তাতে আমার মনে হয়েছিল যে এই ঘন অন্ধকারে এত দ্রুত টর্চের আলো জ্বালিয়েই নিভিয়ে দিলে লেপার্ড দেখতে পাওয়ার কোন আশা নেই। ভুল ভাঙ্গল অচিরেই। টর্চের আলো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে গেল, আর চাপা গলায় সিংজি বললেন, 'ও রাহা বাঘেরা!' চমকে

উঠে দেখলাম দূর পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো খাঁজে যেখানে টর্চের আলো পড়ে স্থির হয়ে রয়েছে, সেখানে এক অদ্ভুত আলো আঁধারি তৈরি হয়েছে আর সেই ঘন আঁধারির মধ্যে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ, লেপার্ড, স্থানীয় ভাষায় বাঘেরা। বুঝলাম পাহাড়ে এলোপাথাড়ি টর্চ ফেলার উদ্দেশ্য আলোতে গোটা লেপার্ড দেখতে পাওয়া নয়, শুধু চোখ দেখতে পাওয়া, কারণ আলো ফেললেই লেপার্ড আলোর উৎসের দিকে তাকাবে আর ঘন অন্ধকারেও তার দুই জ্বলজ্বলে চোখ জানান দেবে প্যান্থারের উপস্থিতি।

এই সেই জিয়া, যার খোঁজে আমাদের নৈশ অভিযান। টর্চের আলোয় তার দর্শন পেলেও একটানা গায়ে আলো ফেলে রাখলে জিয়া বিরক্ত হতে পারে, তাই মাঝে মাঝে নিভিয়ে আবার আলো ফেলা হচ্ছিল। আমাদের জিপসি থেকে জিয়া যে পাহাড়ে রয়েছে সেটা প্রায় ১০০-১৫০ মিটার দূরে, আর দুয়ের মধ্যিখানে ঘন গাছের জঙ্গল থাকায় কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়। টর্চের আলোয় দেখলাম জিয়া পাহাড় বেয়ে নেমে এসে একটা বড় পাথরের ওপরে বসল। আবছা অন্ধকারে মনে হল পাথরটার পিছনে গুহা, যদিও এত দূর থেকে অন্ধকারে তা জোর দিয়ে বলা মুশকিল। একটু দূরে অনেকগুলো ময়ূর একসাথে তারস্বরে ডেকে উঠল, লেপার্ডের চলাফেরার জানান দিতে অ্যালার্ম কল।

রাতের অন্ধকারে লেপার্ড দর্শনের খুশির শিহরণ তখন আমাদের শরীরে মনে, কিন্তু চমকের তখনও অনেক বাকি। একবার বেশ কিছুক্ষণ আলো নিভিয়ে রেখে

আবার জ্বালাতেই জিয়ার দুইপাশে আরও দু'জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, জিয়ার দুই বাচ্চা। এই মা'র শরীরে গা ঘসছে, আবার পরমুহূর্তেই নিজেদের মধ্যে খেলার ছলে মারপিট করছে। একঝলক বাতাস গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো কিছু বুনো ফুল উড়িয়ে নিয়ে গেল কোথা থেকে, আর সাথে সাথে ভেসে এল ময়ূরের তীক্ষ্ম চিৎকার।

অভূতপূর্ব এই দৃশ্য, সমস্ত পৃথিবী যদি এখন গুঁড়িয়ে যায় তাও আমি একদৃষ্টিতে এ দৃশ্য দেখে যেতে পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জীবনের পর জীবন।

প্রায় সোয়া ঘণ্টা জিয়া ও তার দুই শাবকের সাথে কাটিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। মা এবং শাবক সবাই সুস্থ রয়েছে এটাই পাওনা। জাওয়াইএর লেপার্ডদের সুরক্ষার ভার এই রানা-ওয়াত সিং-এর মতন কিছু লোক নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এনাদের সাথে কথা বলেই জানা গেল যে রাজস্থান বনদপ্তরের এখানকার লেপার্ডদের নিয়ে কোন তেমন মাথাব্যাথা নেই। গ্রামের লোকজনের গবাদি পশু লেপার্ডের শিকার হলেও বনদপ্তর কোন ক্ষতিপূরণ দেয় না, তাই লোকাল লোকজন এনজিও তৈরি করে তাদের ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করেছে, নাহলে হয়তো মাড়িতে মেশানো বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হতে পারে এই অতিসুন্দর প্রাণীর। অদূর ভবিষ্যতে এখানে বেশ কিছু জমি কিনে নিয়ে সেখানে অভয়ারণ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে, যেখানে হরিণ ছাড়া হবে যাতে লেপার্ডের গবাদি পশু হত্যার সংখ্যা কমে। লেপার্ড পর্যটনের ব্যবসাকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যই হোক না কেন, জাওয়াই বাঁধ ও বেরার মানুষজনের লেপার্ড সংরক্ষণের এই শুভ উদ্দেশ্যকে আমি স্বাগত জানাই, আর আশা রাখি যে সরকারের সহযোগিতায় এই উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে সফল হবে।

বর্ষাস্মৃতি

©তাপস সামন্ত ১৯৯১ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

বর্ষাস্মৃতি ১

বর্ষা বললেই, এ কারাগার ছেড়ে মন সোজ্জা রূপনারায়ণ বরাবর লাগায় এক ছুট। একফালি সবুজ ঘেরা গ্রাম। পুবের মাঠ ছনছনে সবুজ। এলোমেলো ঘন সবুজ দূর্বা ঘাসে ঢাকা। মাঝে মাঝে ধানের চারাতলা। রোয়ার অপেক্ষায়। তারই অনতিদূরে খেলার অস্থায়ী মাঠ। প্রথম ঢালা বৃষ্টির আগে বেশিরভাগ ভাগটাই ফুটিফাটা। বড়জোর কালবৈশাখীর সঙ্গী দু এক পশলা বৃষ্টি হয়তো তার রুক্ষতাকে ঢেকে একটু কোমলতার প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে মাত্র। দূর থেকে অন্তরের রুক্ষতাটুকু আর বোঝার উপায় নাই এতটাই প্রাণবন্ত সবুজ।

কালবৈশাখী চলে গেছে। রয়ে গেছে তার সঙ্গী ঘন বাদল মেঘ আকাশের এক কোণে। সূর্যের প্রকোপে বিদ্ধস্ত। সহযোগীদের অপেক্ষায় যেন কোনরকমে লড়াই টিকিয়ে রাখা সৈনিকের মতো। সময়ের সাথে সাথে সহযোগী সব উড়ে আসে দক্ষিণ পশ্চিম কোন ঘেঁসে। ঘন বাদল মেঘ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে আকারে বপুতে। বেড়ে ওঠে আকাশের গায় – এক সময় পুরো আকাশ ছেয়ে ফেলে। সূর্য্যের তাপ অসহনীয় হয়ে ওঠে। তবুও হার মানে না বাদল মেঘের দল। আকাশ কালো করে ছুটে আসে। মাঠে ঘাটে হুটোপুটি লেগে যায়। বড়োদের যত পার্থিব চাওয়া পাওয়ার মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকে ছোটদের ছোট্ট ছোট্ট ইচ্ছেরা। তারপর যখন মেঘেরা জয়ী হয়, তার নিকষ কালো জটা বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টপ টপ করে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে এসে পড়ে শুষ্ক মাটির বুকে, সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। গাছে গাছে পাতায় পাতায় জীবনের উন্মাদনা। প্রথম বৃষ্টির সাথে ছেলে ছোকরার দলও দৌড়ে পাল্লা দেয়। শেষ রক্ষা হয় না। সুতীক্ষ্ণ শলাকার মতো আদুল শরীরে এসে বেঁধে। তারপর ঝমঝমিয়ে শুরু হয় বৃষ্টি ঝরা। কখনো পুকুর জলে মাথা ডুবিয়ে, কখনো জামগাছের মগডালে বসে ছেলে ছোকরার দল সেই বৃষ্টির দুর্বোধ্য ভাষা বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যায়। গন্ধরাজ, কামিনী, হাসনুহানা, রজনীগন্ধা সব একজোট হয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায় সেই বৃষ্টিকে। সুগন্ধি ফুলের ডালি মেলে বরণ করে নেয়। যেসব কোমল পেলব রঙিন পাতারা প্রচণ্ড গরমেও শুকিয়ে যায়নি তারা যৌবনমদমত্ত হয়ে ঘন সবুজ রঙ ধরতে ছোটে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। নহবৎ বেজে ওঠে পুকুরে, নালায়, দহে, পরিত্যক্ত জলাভূমিতে। বর্ষার প্রথম জলের স্বাদ তাদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে

তোলে। মকমকির দল আসর বসায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের; কোন সুদূরে লুকিয়ে থাকা সঙ্গিনীকে সুরপাশে আবদ্ধ করে টেনে আনার তীব্র আকাঙ্খায়।

প্রেম জেগে ওঠে মাছেদের বুকেও। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যার শীতল গাঢ় অন্ধকারে। মাঝেমধ্যেই বিদ্যুতের ঝলকানি আর তার সুতীব্র চিৎকারে অন্ধকার চিরে একবারে ফালাফালা হতে থাকে।

বাইরের ঝমঝমে বৃষ্টি তখন কমে ঝিরঝিরে হয়ে এসেছে। ঘরে ঘরে কিশোর কিশোরীরা কেরোসিনের আলোয় বই খুলে বসে। মন তখনো বাইরের ডাক উপেক্ষা করে মনোনিবেশ করে উঠতে পারেনি। মৃদু গুঞ্জনে কেবল পড়ার অভিনয় চলতে থাকে বড়োদের বকুনির ভয়ে। সেই ফাঁকে কখনো সখনো বৃষ্টিভেজা ডানা ভারি হয়ে পাপিয়া, হলুদকুঁড়ি, টিয়া, ফিঙে বা বাতাসিদের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে টেনে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে। তারা অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এসে দৃষ্টি হারিয়ে ঝটপট করে এদিক ওদিক ডানা ঝাপটে বেড়ায়। শেষ রক্ষা হয় না। কৈশোরের পটুতা আর চপলতার কাছে হার মেনে ধরা দেয়। তারপর তাদের স্থান হয় বেতের ঝুড়ি বা আলমারির তাকে। ভীত সন্ত্রস্ত্র আর অসমর্থ ভেজাডানা পাখিগুলোর হৃদস্পন্দন কৈশোর হৃদয়েও কাঁপুনি তোলে। কোন এক ফাঁকে বড়দের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে আড়ালে বেরিয়ে যায় কৈশোর টর্চ, ঝুড়ি আর কাটারি হাতে। বাইরে তখন ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। রাস্তাঘাট পিছল। আওয়াজ বলতে ব্যাঙ, ঝিঁঝি আর পুকুরে জল নামার একটানা শব্দ।

সেই অন্ধকার সরিয়ে কৈশোর হাতে ধরা টর্চের আলো খুঁজে বেড়ায় মাছেদের। দেখামাত্র মেরে ফেলার হুকুম জারি হয়েছে আজ। অল্প ছিপছিপে শীতল জলে মাছেরা তখন খলবলিয়ে চরে বেড়াচ্ছে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে; প্রেমোন্মাদ, ঢলঢলে যৌবনভার নিয়ে। জোরালো টর্চের আলো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। থমকে পড়ে তারা। তখনি নেমে আসে কালান্তক শমন কাটারি বা ছোরার বেশে। যৌবন পেরিয়ে

প্রৌড়ত্বের শেষ প্রান্তে এসে সেই কিশোরের উপলব্ধি আক্ষেপ করে সেদিনের নিষ্ঠুরতাকে নিয়ে। আজকেও সব কৈশোর তবুও সেই একই পথে পা বাড়ায় জীবনের নিয়ম মেনে।

বর্ষাস্মৃতি ২

বর্ষণমুখর রাতে মাঠময় ইতস্তত দাপিয়ে বেড়ায় কৈশোর। জোনাকির আলোর মত। মাঠ জুড়ে নেচে বেড়ায়। দূরের টর্চের আলো আর কাছের জোনাকি মিলে মিশে একাকার। হাতের টর্চের আলো জলে প্রতিফলিত হয়ে উর্ধ্বগামী হয়। আর সেই প্রতিফলিত আলোয় জলজ গাছগাছালির প্রলম্বিত ছায়া পড়ে এদিক ওদিক। অন্ধকার রাতে গুঁড়ি গুঁড়ি একটানা বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙেদের ডাকাডাকি, চাপাস্বরে ভেসে আসা দুরের কথোপকথন আর ঘন গাঢ় অন্ধকার যত অসম্ভব কল্পনার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে। সেই কল্পনার আঙ্গিকে সব ছায়াই কখন কায়া হয়ে নড়ে চড়ে বেড়ায়। যে সব কাহিনীর আবহে ঠাম্মার কোল ঘেঁষে শৈশব শিহরিত হয় তারাই সব যেন একে একে মূর্ত হয়ে ওঠে কৈশোরের অবচেতনে। আবছা আলোছায়ায় সেই সব কাল্পনিক ছায়ামুর্তির সাথে ছায়াযুদ্ধ চালায় দুঃসাহসী কৈশোর। সাহস যখন বিদ্রোহ করে বসে কৈশোর কণ্ঠ চিৎকার করে ওঠে, "ওখানে কে রে?"। যথাযথ প্রত্যুত্তর ভেসে এলে অভিযান চলতেই থাকে যতক্ষণ না হাঁক পড়ে বাড়ি অন্য সদস্যদের থেকে। নতুবা পিছন না ফিরে পিছন পানে পিছিয়ে চলার পালা। ছড়ানো ছিটানো আলোর বিন্দুগুলো সব ধীরে ধীরে জোটবদ্ধ হয়। একে একে ফিরে আসে ভিটের পাশে। অভিজ্ঞতার ঝুলিও পরিপূর্ণ হয়ে যায় বিভিন্ন কাটা মাছে ভর্তি ঝুলির সাথে। তারপর ঘাটে হাত পা ধুয়ে বাবা কিংবা মার বকুনি হজম করে বাড়ি ঢুকে পড়া টুক করে। কিছু পরে পিটপিট বৃষ্টি মাথায় করে এ বাড়ি খিচুড়ি খেয়ে ও বাড়িতে শুতে যাওয়া। তালপাতার পেখোয়া সারাক্ষণ সঙ্গী হয়েই থাকত তবে। তারপর ভাই বোনেরা মিলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যত আজগুবি গল্পের আসর। বাইরে বৃষ্টির দমক বাড়ে কমে। চড়বড়িয়ে টিনের চালে দাপিয়ে বেড়ায়। যেন দূরের কোন ঘোড়সওয়ারের কাছে আসে আবার দুরে চলে যায়। এই যাওয়া আসার মাঝে গল্পের আসর জমে ওঠে। তারপর এক সময় বড়োদের হুকুম আসে গল্পের আসর বন্ধ করে ঘুমের দেশে যাবার। সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চোখে ঘুম নেমে আসে শেষে।

প্রতিদিনের মতো একই নিয়মে সকাল হয়। কোন দিন বৃষ্টিভেজা ঝকঝকে সকাল। তো কোনো দিন আকাশের মুখ বেশ ভার, সুর্যের মুখ ঢেকে বসে আছে। চারিদিকে নরম মাটির বাস ছড়িয়ে আছে। কোনো দিন আবার ঝিরঝিরে একটানা বৃষ্টি মাতাল হাওয়ার দমকে দমকে ভেতরে ঢুকে আসতে চায়। কোনো কোনো দিন রাতের বৃষ্টি নেশার ঘোরে তখনও ঝমঝমিয়ে ঝরে চলেছে দামাল হাওয়ার সাথে।

বর্ষাস্মৃতি ৩

সকাল সে যেমন ই হোক – মেঘে ঢাকা, বৃষ্টি মাখা, বা রোদ ঝলমলে, কৈশোরের কাছে সে স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি। বাইরের জগৎ যখন অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে রাতের চৌহদ্দির দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে, তখন কৈশোর বুক ভেসে যায় মুক্তির আনন্দে। চার দেওয়ালের বাইরে বেরোনোর ছাড়পত্র। বাইরে বেরোলে গুরুজনদের বকুনি নেই, অন্ধকারে অহেতুক ভয় বা আশঙ্কার কারণ নেই এমন কি ঘরে ফেরার তাড়াও নেই। এমনই উন্মুক্ত মন নিয়ে কৈশোরের দল বেরিয়ে পড়ে মাঠে মাঠে। আলতাপাটি ডোবা জলে মাঠ তখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনোন্মুখ। কোথাও বা এখনও ডাঙা জেগে। বর্ষার নতুন জলাভূমি। কাছে পিঠের পুকুরে তখনও হয়তো জল নেমেই চলেছে। কাঁকড়ারা এদিক ওদিক নতুন বাসা বানিয়েছে। সদ্যতোলা কাঁকড়া মাটি গর্তের আশেপাশে জড়ো করা। কোথাও আবার গর্তের মুখ নিচু রয়ে গেছে। তাই দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকেই চলেছে ঢক ঢক করে। পুকুরে জল নামার শব্দ বেশ একটা নৈসর্গিক আবহসঙ্গীত রচনা করছে। সবাই মিলে পাল্লা দিয়ে চলে জল ছেটানো।

কে কদ্দূর ছিটোতে পারে। তারই মাঝে হঠাৎ পা পিছলে ডিগবাজি। সব কিছু ভিজে জবজবে। হঠাৎ সবারই হুঁস ফেরে অকারণে।

সূর্য্য উঠে পড়ে দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে। মেঘলা বা বৃষ্টিমাখা সকাল হলে সরাসরি না দেখা গেলেও বোঝা যায় মোটামুটি পরিষ্কারভাবেই। এরই মাঝে মাঠের ওই ছিপছিপে জলে আটকা পড়ে থাকা কই, মাগুর, শিঙি, ল্যাঠা, শোল ইত্যাদি জিওল মাছের সন্ধান মেলে। খালি হাত, নতুন বর্ষার জলে মাছের পিচ্ছিল শরীর আর যৌবন উন্মত্ত জীবনীশক্তির কাছে কৈশোর বার বার হেরে যায়। জেদ চেপে বসে। অনেক কসরত করে শেষে ধরা দেয়। মাছের পিছু পিছু সবাই গিয়ে পৌঁছায় জলাভূমির ধারে যেখানে মাঠের শীতল জল শব্দ করে জলাভূমি একটানা ভরিয়ে চলে। সেই জলস্রোতের বিপরীতে উপস্থিত সব খাদ্য আর খাদকের দল। নিরীহপ্রাণ পুঁটি, মৌরলার দল উজান খোঁজে ডিম পাড়ার জন্যে। তাই স্রোতে বিপরীতে লাফ

মেরে উজান বাইতে চায়। আর জলস্রোতের পাশেই লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকে জলঢোঁড়া, হেলে, জলমেটুলি বা আরও কিছু নির্বিষ সাপ, পাশাপাশি বোড়া, জলবোড়া বা অন্য বিষাক্ত সাপও। মাছেরা লাফালাফি করলে বা উজান বেয়ে জল ছেড়ে উঠলেই খপ করে ধরে ফেলে। সে এক অদ্ভুত শিকার ধরার প্রতিযোগিতা। কৈশোরের উন্মাদনা কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না। সেও হাত বাড়িয়ে দেয় সবার আগে মাছটি হস্তগত করার জন্যে। ফলে অনেক সময়ই সাপের রাগ এসে পড়ে হাতের ওপর। মাছের বদলে কামড়ে ধরে হাতের আঙ্গুল। খলখল করে রক্ত ঝরে। আর কাটা অংশে জল লেগে বা বিষক্রিয়ায় জ্বালা করে। অজানা আশঙ্কায় বারবার চেনার চেষ্টা করে সাপটাকে। তারপর বাড়ি ফেরার পালা কিছুটা বিষণ্ণ মনেই। আশঙ্কা কিছুতেই চাপা থাকে না কেউ না কেউ বাবা মা বা বাড়ির কানে তোলে কথাটা। মুহূর্তে হুলুস স্থুলুস পড়ে যায় বাড়িতে। সাপে কামড়ানো আঙ্গুলটা নিয়ে রীতিমতো টানাটানি চলে। কোথাও না কোথাও থেকে চুনহলুদমাখা চলে আসে। প্রলেপ লাগানো হয়। খবর যায় পাড়া গুনিন সুবলবাবু কাছে। সুবলবাবু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। একমাত্র সন্তান বলে ছোটবেলা থেকেই ভীষণ খাইয়ে লোক। বেঁটেখাটো শক্তপোক্ত চেহারা। সুবলবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছে শুনে পরে যা ঘটতে চলেছে সেটা আন্দাজ করা মোটেই দুরূহ ব্যাপারে নয়। ভয়ে বিরক্তিতে আর রাগে জ্বলুনিটা শারীরিক থেকে কখন যেন মানসিক হয়ে পড়ে। বাবা মা'কে বোঝানোর কোন ত্রুটি রাখে না যে সবই আসলে সুবলবাবুর বুজরুকি। ওভাবে বিষ কিছুতেই নামে না। সবার অযাচিত উপদেশে বাবা মাও দশচক্রে ভগবান ভুত। অগত্যা সুবল বাবু এসেই পড়লেন। সদরে মাদুরপাতা হল। প্রাথমিক খোঁজখবরাদি (যার মধ্য দিয়ে স্রেফ জেনে নেওয়া যে সত্যি কোন বিষধর সাপ কামড়েছে কিনা বা পরিবার ঠিক কতটা উদ্বিগ্ন। নৈবেদ্য সেই মতো সাজানো হবে।) শুরু হয়। এক সময় দেখা যায় ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী কৈশোর একরাশ বিরক্তি নিয়ে মাদুরে বসে। আর সামনে সুবলবাবু মাটিতে বাঁ হাত রেখে উবু হয়ে বসে। তার চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে উৎসুক জনতা। তখন বাইরে রোদ না বৃষ্টি না মেঘলা তাতে কারো কোন কিছু আসে যায় না। কৈশোরের চোখগুলি তখন অদম্য কৌতূহলী – কোন মন্ত্রবলে ওই বাঁ হাত চলতে শুরু করবে তা নিয়ে! কেউ কেউ আবার অবিশ্বাসী হয়ে বিদ্রোহ করে। বড়োরা সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। হঠাৎই সব কথা থেমে যায়। সুবলবাবু ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত চাপা গলায় বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। কিন্তু সেই শুনে তার ভাষা বা অর্থ উদ্ধার খুব দুরূহ ব্যাপার। প্রতিবার বলা হলে আস্তে হাতে ফুঁ দেন জোরে নীচু মুখে – কেউটের শ্বাস ছাড়ার মতো "ফুঁউউউউউ" করে আওয়াজ বের হয়। একবার, দুবার। কৈশোর ধৈর্য হারাতে বসে। এই শেষ বার উদ্ধার করতেই হবে শব্দগুলো। সবারই কান খাড়া। ওই নিঃশব্দ আবহে অবশেষে পরিষ্কার হয় শব্দগুলো

"আলবিষ তালবিষ আর শেয়ালবিষ সব
আমার হাতের 'পরে রাখ এসে শব।
নিয়ে চল এই হাত যতদুর চলে
মা মনসার দৈবকৃপা বলে।
বিষ থাকে তো যা,
না থাকে তো না যা।
বিষ থাকে তো যা
না থাকে তো না যা।
বিষ থাকে তো যা
না থাকে তো না যা।
মা মনসার কৃপায়" ফুঁউউউউউউ।

ধীরে ধীরে হাত চলতে শুরু করে। কৈশোর পা বাইতে বাইতে হাঁটুর ওপরে গিয়ে থেমে যায় হাত।

বর্ষাস্মৃতি ৪

কৈশোর বেজায় বেআক্কেলে। সব কিছুই নিজের বোধবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়। নিজের বিশ্লেষণে যদি সত্যিটা বেরিয়ে না আসে তো কিছুতেই সেটা সত্যি বলে মেনে নিতে চায় না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে মনে। সেই অনুসন্ধিৎসার সামনে কোন কিছুই সন্দেহের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। তাই আজ যখন দেখল ডানহাতের আঙ্গুলে সাপ কামড়ানোয় বাম পায়ের হাঁটু অব্দি বিষ উঠল তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। বলে উঠল "বাবা, সাপটা তো ডান হাতের আঙ্গুলে কামড়েছে। এই দেখো!" বলে আঙ্গুলের ক্ষতটা তুলে ধরল। কালিবাবু তা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন "তাই ভাবছিলাম হাঁটু ছেঁড়ে বার বার হাতটা ওর হাতের ওপর চলে যাচ্ছিল কেন। একটা নতুন গামছা আনুন তো।" শুনে তো আমার রাগ মাথায় উঠে গেল। একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল। বলি ভেবেছেটা কী? সেই বিরক্তি ওনার সম্মানে গিয়ে আঘাত হানল। এদিকে আমার কথা কেউ শুনলও না। অগত্যা পিঠ পেতে ওই নতুন পাকানো গামছার মার বার চারেক হজম করতেই হল। তার পর "রাতে ঘুমুবে না আর জলভাত খাবে। আর ক্ষতস্থানে চুনের প্রলেপ দেবে।" এই বলে কালিবাবু ১০টাকা দক্ষিণা আর ওই নতুন গামছাখানা নিয়ে চলে গেলেন। আমি পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মনে মনে ফন্দি আঁটলাম। যে করে হোক ওনার চালাকি বার করতেই হবে। এই ভেবেই মনের আনন্দে সে রাত কাবার হয়ে গেল।

বর্ষার মাঝামাঝি। মাঠ ভর্তি জল থই থই করছে। অথচ ধানের চারা পোঁতার তখনো দেরি। জলজ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির অতি উত্তম সময়। শাপলা, শালুক, ঝাঁঝি,

শোলা আরও হরেক কিসিমের গাছে ভরে গেছে মাঠ। তখন আমাদেরও ভারি মজার দিন। হাঁটুজলে মাঠময় হুটোপুটি। শালুক ফুল আর ডাঁটা তোলার ধুম। আমাদের কত কাজ – শালুকের ফল ('ভেঁট') জোগাড় করে তার বীজগুলো ছাই মাখিয়ে রোদে শুকনো করা, শালুক ডাঁটাকে কলমিডাঁটা দিয়ে জুড়ে লম্বা পাইপ বানানো, সেই পাইপ দিয়ে আম বা নিম গাছের মগডালে বসানো বালতি থেকে সাইফোন করে জল নামিয়ে ফোয়ারা বানানো, ফুলসমেত শালুকডাঁটা আলতো করে ভেঙ্গে (যাতে ছালের সাথে লেগে থাকে, ছেড়ে না যায়) মালা বানিয়ে গলায় পরে ঘুরে বেড়ানো, আরও কত কী। এসবের ফাঁকে মাছ ধরার নানান ফন্দি ফিকির। বন্ধুরা তাদের বাবার কাছে পয়সা পেত জালবোনার সুতোর জন্য। আমার তো সে প্রশ্নই নেই উল্টে জাল বুনি জানলে উত্তমমধ্যম দিয়ে গা গরম করে দেবে। কিন্তু বন্ধু সঙ্গ ত্যাগ করাও বড় দূরুহ কাজ। ভেবে ভেবে উপায় বেরোল। আমার তো ফি বর্ষায় একটাই জালে কাজ চালানোর দরকার নেই। এই বর্ষায় কাজ চলে গেলেই হল। তাই মায়ের কাঁথা সেলাই এর সুতো মানে পুরানো কাপড়ের পাড় থেকে তোলা সুতো দিয়েই জাল বোনা শুরু হয়ে গেল। ধরা পড়ে মার বকুনি হজম করে বললাম, "পাড় তো অনেক আছে আমি না হয় তুলে দেব।" মার স্নেহ সে যাত্রায় খবরটা বাবার কান অবধি পৌঁছাতে দিল না। আমি নতুন উদ্যমে জালবোনা শুরু করে দিলাম। সারাদিন হাতে পেঁত্যা আর জালকাঁটা হাতে একদল বালক গাছে বসে সুতোর পেছনে মেপে মেপে ফাঁস লাগিয়েই চলেছে। জালের বহর দুহাত মানে তিনফুট। একটা ফাঁসের মাপ আধইঞ্চি, মানে পেঁত্যার মাপ। তাই আধইঞ্চি লম্বায় এগোতে বাহাত্তরটা গিঁট লাগাতে হচ্ছে। প্রতি গিঁটে দুবার ফাঁস লাগিয়ে টান মেরে গিঁট বসাতে হচ্ছে। কইগাঁতি বোনা হচ্ছে যে। যত সহজ ভেবে শুরু করেছিলাম তত সহজ নয়। তার ওপর আমার পাড়ের পচা সুতো আর বন্ধুদের নাইলনের শক্ত সাদা সুতো। ওরা দিনে চারহাত লম্বায় বাড়ে তো আমি বড়জোর দুহাত। এই করে যখন ওরা আঠাশহাতি বানিয়ে ফেলল, আমি দশহাতে পৌঁছালাম। তবুও কম কী? এইবার জায়গা খোঁজার পালা। এখানে বন্ধুদের কোনো মায়া দয়া নেই। সেরা জায়গাটা সবার চাই। সে লড়াইয়ে আমি হেরে গিয়ে খুঁজতে থাকি পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো যদি কোন পছন্দমত জায়গা পাই। না সে সুযোগ বন্ধুরা রাখেনি। অগত্যা পুকুরের কোণে যেখানে মাঠের জল নামে তার গা ধরে আড়াআড়ি দশহাত মতো জায়গা শালুক শাপলা ঠেলে পরিষ্কার করে জাল পেতে দিলাম। এখন হয়তো ফল নাও পেতে পারি কিন্তু গড়েনের সময় মানে কার্তিক মাসে যখন মাঠের জল নামা শুরু হবে তখন এ জায়গা সোনার খনি।

টেলিস্কোপ

©নবেন্দু সিনহা, ১৯৯৮ কম্পিউটার সায়েন্স

ঘটনাটা হঠাৎই ঘটে গেল। এরকম দৃশ্য দেখার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিল না সুনন্দ। আর তারপর থেকেই মনটা উশখুশ করছে। কাজেও মন বসাতে পারছে না। এখন কী করা উচিত সেটাও ঠিক করতে পারছে না।

সুনন্দ পেশায় একজন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দু'বছর হল একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করছে। কাজের বাইরে ওর নেশা হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। তাই প্রথম মাইনে পাওয়ার পরই টাকা জমিয়ে একটা শক্তিশালী টেলিস্কোপ কিনেছিল সুনন্দ। সারাদিনের কাজের পর রাতে একটা বীয়ারের বোতল হাতে নিয়ে আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করা এখন ওর রোজ রাতের নেশা। জুপিটারের মুন, শনির বলয় অথবা চাঁদের নির্মল সৌজন্য – এ যেন এক অদ্ভুত নেশার জগত।

একটা অভিজাত আবাসনের পঁচিশ তলার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সে একাই থাকে। ভবিষ্যতে খুব পরিচিত কাউকে পেলে হয়তো তাকে সঙ্গী নিতে পারে। তবে এখনও খুব কম লোকের সাথেই চেনাশোনা হয়েছে।

ঘটনাটা দু'দিন আগের। সুনন্দ অন্য দিনের মতই টেলিস্কোপটা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। টেলিস্কোপটার যখন ও আকাশের দিকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই আবাসনের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে একটা দৃশ্যে ওর চোখ আটকে গেল। টেলিস্কোপের লেন্সে দেখা যাচ্ছে একটি লোক আর একজন মহিলার চুলের মুঠি ধরে মারধোর করছে আর মহিলাটি দু'হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। পর মুহূর্তেই মহিলাটা মেঝেতে পরে গেল আর লোকটি তাকে লাথি মারতে গেল।

দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল সুনন্দ। লেন্সে চোখ রেখে আরো কয়েকবার ভালো করে দেখলো সুনন্দ। ঘরে আরো দুজন আছে। একজন বয়স্ক লোক আর একজন মাঝবয়সী মহিলা। দুজনেই আঙ্গুল তুলে ওই মহিলার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা ও আর দেখতে পারল না।

সেই রাতে চাঁদ দেখার ইচ্ছেটাই চলে গেল সুনন্দর। মান্নাদের গান মনে পড়ে গেল, "চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি"। কিন্তু এ কী দেখা! এ তো অত্যাচার! একজন অসহায় মেয়েকে সবাই মিলে মারধোর করছে! লোকটা নিশ্চিত

ওর বর হবে। আর বাকি দু'জন শ্বশুর আর শাশুড়ী। সুনন্দ ভালো করে দেখে বুঝল যে ফ্ল্যাটটা সাতাশ তলায়।

টেলিস্কোপটা প্যাক করে কিছুক্ষন গুম হয়ে বসে রইল সুনন্দ। ওর এখন কী করা উচিত? এখানকার বাকি লোকেদের বলবে? পুলিসকে বলবে? যদি বিশ্বাস না করে? নাকি, পুরো ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে আবার চাঁদ দেখায় মন দেবে? কাউকে বললে সবাই তো আগে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কী করে জানলে? কেউ বিশ্বাস করবে না যে অনিচ্ছাকৃতভাবে ও টেলিস্কোপে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে? এমনিতেই অবিবাহিতদের কেউ ভাড়া দিতে চায় না। এটা জানার পর তো ওর এখানে থাকাই মুস্কিল হয়ে যাবে। সবাই ভাবতে পারে যে টেলিস্কোপ দিয়ে ও অন্য লোকের বাড়িতে নজর রাখে। সুনন্দ ঠিক করলো ঘটনটা এখানকার কাউকেই জানাবে না।

দু'দিন অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে সুনন্দ ঠিক করল যে আজ অফিসের বন্ধুদের ব্যাপারটা জানাবে। অফিসে ওর তিনজন ভালো বন্ধু আছে। ওরা একই কলেজের। তমাল, অনিমেষ আর সোহিনী। আজ রবিবার। শনি এবং রবি দু'দিন অফিস বন্ধ থাকে। ও তিনজনকে ফোন করে বিকেলে আসতে বলল। জানাল জরুরী দরকার। ফ্ল্যাটে এলে সব খুলে বলবে। ডিনার সবাই এখানেই সেরে নেবে। কাবুলিওয়ালা থেকে ফোনে অর্ডার দিয়ে বিরিয়ানী আনিয়ে নেবে। ওরা এক কথায় সবাই রাজি।

বিকেল ছটা নাগাদ তিন মূর্তিমান হাজির।

"কিরে হঠাৎ জরুরী তলব? নতুন কোনো গ্যালাক্সির সন্ধান পেলি নাকি!", তমাল টিপ্পনি কাটল।

"টেলিস্কোপে কি শুধু মহাকাশই দেখা যায়? আয়, ভেতরে আয়!" সুনন্দ সবাইকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

তিনজনেই সোফায় গা এলিয়ে বসল।

"চা না বীয়ার, কী চলবে?"

সোহিনী বললো, "চা-ই খাব এখন। কিছু হেল্প লাগবে তো বল্!"

অনিমেষ আর তমালও ঘাড় নেড়ে চায়ে সম্মতি জানাল।

"কিছু হেল্প লাগবে না। তবে দুধ শেষ। র চা বানাচ্ছি।"

তারপর চা আর চিপস্ খেতে খেতে সুনন্দ ওদের পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল।

সব শুনে সোহিনী তো উত্তেজিত হয়ে গেল, "এখুনি পুলিসে খবর দেওয়া উচিত!"

অনিমেষ মাথা নেড়ে বললো, "না, পুলিসে এখনই যাওয়া ঠিক হবে না। আমার মাথায় একটা অন্য আইডিয়া আছে।"

"কী আইডিয়া?", সোহিনীর চোখেমুখে কৌতূহল।

"তুই আর সুনন্দ দুজন ওদের বাড়িতে কোনো একটা অজুহাত নিয়ে চলে যা। ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখে আয়। ভালো করে খেয়াল করে দেখবি যে মেয়েটার

কপালে, মুখে, হাতে বা কোথাও কোনো চোট আছে কিনা। পারলে মেয়েটার সাথে আলাদা করে একটু কথা বলার চেষ্টা করিস।"

"কিন্তু কী অজুহাত নিয়ে যাব?", সুনন্দর প্রশ্ন।

"এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে যা। বলবি তোরা দুজন স্বামী, স্ত্রী। নতুন ফ্ল্যাট কিনেছিস, তাই পরিচিতি করতে এসেছিস।"

"সে কী রে, আমাকে সুনন্দর বউ সাজতে হবে?" সোহিনীর গলায় বিস্ময়।

"কেন কলেজে তো ভালোই নাটক করতিস!"

"সে তো স্টেজে। কারোর ঘরে গিয়ে এরকম তো কোনোদিন করিনি!"

সুনন্দ বলল, "তারপর যদি দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেয়? পুরো প্ল্যানটাই বানচাল হয়ে যাবে!"

অনিমেষ বললো, "ওইটুকু রিস্ক নেওয়াই যেতে পারে!"

সুনন্দ বারান্দা দিয়ে দেখে নিল যে ঐ ফ্ল্যাটটাতে এখন আলো জ্বলছে। ঠিক হল সুনন্দ আর সোহিনী এখন ঐ ফ্ল্যাটে যাবে। তমাল আর অনিমেষ টেলিস্কোপে ওদের উপর নজর রাখবে। ওরা গিয়ে বলবে যে ঐ টাওয়ারে সদ্য একটা ফ্ল্যাট কিনেছে, তাই টাওয়ারের সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে।

"কী, সব রেডি তো?", সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

"আমি রেডি!", সোহিনী মাথা নাড়ল।

"চলো তাহলে, বেস্ট অফ্ লাক!"

সুনন্দ টেলিস্কোপটা বারান্দায় নিয়ে ঐ ফ্ল্যাটের জানালার দিকে ফোকাস করে দিল। এই মুহূর্তে কাউকেই দেখা যায় না। তবে জানালায় পর্দা খোলা। বাইরে এখন একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাই খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছে যে ঘরে আলো জ্বলছে।

আর সময় নষ্ট না করে, হাতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে ওরা দুজনে টাওয়ার আটের দিকে রওনা দিল।

যাওয়ার পথে সুনন্দ আরেকবার সোহিনীকে জিজ্ঞেস করল, "তোর কোনো আপত্তি নেই তো! এখনো কিন্তু আমরা ফিরে যেতে পারি!"

সোহিনী মাথা নেড়ে বলল, "না নেই!"

তবে ওর চোখে মুখে একটা চাপা উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। কঠিন ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আরেকবার সব কিছু মনে মনে ঝালিয়ে নিল। তিনমাস পরে ওদের বিয়ে হবে। শ্বশুর বাড়ি বেহালা। এখানে ১২০১ নম্বর ফ্ল্যাটটি কিনেছে। কবে ওরা এখানে আসবে তা এখনো ঠিক করেনি। সুনন্দ দেখে নিয়েছে যে ঐ ফ্ল্যাটে কোনো আলো জ্বলে না। বিয়ের পর ঠিক করবে ওরা কবে এখানে আসবে।

সুনন্দও মনে মনে ভাবছে যে ব্যাপারটা একবার নিজে না যাচাই করে দেখলে

ওর মনের শান্তি আসছে না। তাতে যদি একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় তো হোক। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। তাছাড়া ও এখানে ভাড়াটিয়া। দু'দিন পরে কোথায় থাকবে তা কেউই জানে না!

অবশেষে সাতাশ তলার ফ্ল্যাটের সামনে এসে কলিংবেল টিপলো সুনন্দ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই তলায় আর অন্য কেউ থাকে না।

দরজা খুললেন একজন মহিলা। পরনে শালোয়ার কামিজ। ওদেরই বয়সি হবে। মাথায় হাল্কা সিঁদুরের ছিঁটে। গায়ের রং বেশ ফর্সা। এককথায় রুপসী বলা যায়। মেয়েটি কিছু বলার আগেই সোহিনী মিষ্টির প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা এখানে নতুন ফ্ল্যাট কিনলাম, তাই একটু মিষ্টিমুখ।"

"ও তাই নাকি! কনগ্র্যাচুলেশন!"

যাক! প্রাথমিক পরিচয় ঠিকমতই হল। "আসুন না একটু চা খেয়ে যাবেন। পরিচয়টাও হয়ে যাবে।", মেয়েটি হাসিমুখেই বলল।

সুনন্দ ঠিক এটাই যেন চাইছিল। তাই এক কথায় রাজি। জুতো খুলে ওরা দু'জনেই ভেতরে ঢুকল।

ফ্ল্যাটটা সাজানো গোছানো। চতুর্দিকে প্রচুর কারুকার্য। দেওয়ালে সুন্দর ফোটো ফ্রেম আর পেন্টিং। ফোটো ফ্রেমে ঐ মহিলার সঙ্গে এক সুদর্শন যুবকের ছবি। সুনন্দ বুঝলো ইনিই ওনার বর হবেন।

"আমার নাম রিমা, আর এই আমার হাসবেন্ড সমর। আপনারা বসুন!" রিমা সোফার দিকে ইশারা করল।

চশমা চোখে এক যুবক বেডরুম থেকে বেরিয়ে ওদের নমস্কার করলেন। সুনন্দর মনে হলো মুখটা কোথাও যেন চেনা চেনা লাগছে। তারপরই মনে পড়ল, আরে? একেই তো ও টেলিস্কোপে দেখেছে! কিন্তু সেই দৃশ্যটার সঙ্গে এখনকার ছবি যেন মেলানো যাচ্ছে না!

ওরাও প্রতি-নমস্কার জানিয়ে নিজেদের পরিচয় দিল। সোফায় বসে সোহিনী কায়দা করে লক্ষ্য রাখছে ঘরে আর কেউ আছে কিনা। সুনন্দ তো বলেছিল যে ঘরে শ্বশুর আর শাশুড়ীকেও দেখেছিল। কিন্তু আর কাউকে তো ঘরে দেখা যাচ্ছে না!

"দুধ চা চলবে তো?", রিমা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ চলবে।", সোহিনী আবার ভালো করে ওকে একবার দেখে নিল। কই? মুখে চোখে কোথাও অত্যাচারের ছাপ তো বোঝা যাচ্ছে না।

সুনন্দ আলাপ শুরু করল, "আপনারা কতোদিন এসেছেন?"

সমরই উত্তর দিল, "আমরাও নতুন এসেছি। আমার অফিসটা কাছেই। রেডিওতে আর্ট ডিরেকশানের কাজ করি। আপনি কিসে আছেন?"

সুনন্দ বললো ওরা দুজনেই আইটিতে আছে। রিমা এর মধ্যেই জিজ্ঞেস করে

বসলো, "আপনাদের লাভ ম্যারেজ বুঝি?"

সোহিনী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, মানে আমাদের এখনো বিয়ে হয় নি!"

"আর আপনাদের?"

রিমা হাসতে হাসতে বলল, "আনন্দবাজার!"

এরপরই রিমা আর সমর চা বিস্কুট আনতে ভেতরে চলে গেল। এই সুযোগে সুনন্দ খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কিছু বুঝলি?"

"না! এত এত ফেলুদার গল্প পড়া সব বৃথা গেল!"

"কিন্তু মেয়েটার কপালের বাঁদিকে একটা কাটা দাগ আছে।", সুনন্দ মনে মনে একটু গর্ব বোধ করল যে ফেলুদাটা ও একটু ভালোভাবে পড়েছে।

এর মধ্যেই জানালার দিকে একবার হাত নেড়ে দিল সুনন্দ। তমাল আর অনিমেষ নিশ্চিত টেলিস্কোপে ওদের দেখতে পারছে!

চা বিস্কুট খেতে খেতে যখন ওদের গল্প জমে উঠেছে, ঠিক তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠলো। রিমা উঠে গেল দরজা খুলতে। সুনন্দরা দেখল একজন বয়স্ক লোক আর বয়স্কা মহিলা এসেছেন।

আরে এরাই তো সেই শ্বশুর আর শাশুড়ী! সবই একে একে মিলে যাচ্ছে!

সমর বললো, "আসুন পরিচয় করিয়ে দি। এনারা মিস্টার এবং মিসেস স্যানাল। আমাদের টাওয়ারেই থাকেন।"

ওরাও দুজনকে নমস্কার করল।

রিমা বললো,"আসলে আমাদের একটা নাটকের গ্রুপ আছে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে একটা নাটক করছি। তারই রিহার্সাল হয় আমাদের বাড়িতে। ওঁরাও অভিনয় করেন। আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেলও আছে। আপনারাও যোগ দিতে পারেন।"

সুনন্দ আর সোহিনী সব শুনল।

সোহিনী বলল, "আরে না, আমরা একদমই নাটক করতে পারি না! আমাদের দেরী হয়ে গেছে। আজ আসি।" এই বলে ওরা হঠাৎই বিদায় নিল।

সুনন্দ আসার আগে বিরিয়ানী আর প্যাকেটে মিষ্টি আনিয়েছে। এই দিয়েই ডিনারর হবে। চারজনেই বিরিয়ানী নিয়ে বসেছে। ওরা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না! সুনন্দ তিনজনকেই অনুরোধ করেছে যে এই ঘটনটা ওদের চারজন বাদে অফিসে আর কেউ যেন না জানে! বাকিরা রাজি। কিন্তু তার বদলে সুনন্দকে মুচলেকা দিতে হয়েছে যে টেলিস্কোপে মহাকাশ ছাড়া আর কোনদিন অন্য কিছু সে দেখবে না!

এপিফ্যানি (ইন্টারভিউ)

©গণেশ ঢোল, ১৯৮৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

- বাঙালি হয়ে উড়িষ্যায় চাকরি করবে, কলকাতায় কি চাকরি নেই? তালচের থেকে লোক কলকাতায় চাকরি করতে যাচ্ছে আর তুমি কলকাতা থেকে এখানে আসছ, কলেজে পড়াতে?

- আমি কিন্তু ঘটনাচক্রেই এখানে এসে পড়েছি। সেরকম কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না।

- বিশদে বলো।

- আমি মানিকতলায় দাঁড়িয়েছিলাম আমার প্রেমিকার জন্যে। সেখানে ডাইনিরা আমায় তাড়া করল, তাদের ভয়ে পালাতে পালাতে আমি এখানে এসে পড়েছি।

- ডাইনি মানে? তুমি কি পাগল?

- ডাইনি মানে অশরীরী অশুভ আত্মা। আর আমার মানসিক প্রকৃতিস্থতা নিয়ে কি আপনাদের সন্দেহ হচ্ছে?

- না, না কোনোই সন্দেহ হচ্ছে না। আচ্ছা বলো কম্প্রেসরের কাজ কী?

- কম্প্রেস করা। (বেশ বুঝতে পারি যে লোক দুটো মজা পাচ্ছে।)

- তবে পাম্পের কাজ কী পাম্প করা?

- এগজাক্টলি তাই।

- কখনও কম্প্রেসর দেখেছো?

- হ্যাঁ।

- কোথায় দেখেছো?

- ডিপিডি প্ল্যান্টে।

- ডিপিডি মানে কী?

- ডিউ পয়েন্ট ডিপ্রেসন।

- সেই প্ল্যান্টটা কোথায়?

- হাজিরায়।

- হাজিরা কোথায়?

- নাজিরা থেকে তিন হাজার কিলোমিটার দূরে।

- নাজিরা কোথায়?

- আসামে।

- আর হাজিরা?

- গুজরাটে।

- গুজরাটের কোথায়?

- সুরাটে।

- সেটা আগে বললেই তো হত।

- আগে বলে দিলে তো আমি নাজিরার ব্যাপারটা যে জানি তা আপনাদের বোঝানো যেত না। তাছাড়া হাজিরা আর নাজিরা শব্দ দু'টোর মধ্যে যে সুন্দর একটা রাইমিং আছে সেটাও অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন।

- কী কম্প্রেস করছিল, ঐ কম্প্রেসর?

- গ্যাস।

- কী গ্যাস?

- মিক্সচার অফ গ্যাস।

- কীসের মিক্সচার?

- মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন।

- তুমি একবারে ডিটেলে উত্তর দিচ্ছ না কেন?

- এটাই আমার ইন্টারভিউ দেওয়ার স্টাইল। যতটুকু প্রশ্ন ঠিক ততটাই উত্তর।

- হঠাৎ এরকম স্টাইল অ্যাডপ্ট করতে গেলে কেন?

- কেননা একবারে যা জানি সব বলে দিলে লোকে বড়ো বেশি প্রশ্ন করে। এই স্টাইলে ইন্টারভিউ দিয়ে আমি এর আগে তিনটে চাকরি পেয়েছি।

- সেসব চাকরিগুলো কোথায় গেল?

- দুটো ছেড়ে দিয়েছি, একটা এখনও আছে।

- যেটা আছে সেটা তাহলে ছেড়ে দেবে?

- হ্যাঁ, দেব।

- কেন? ছাড়বে কেন?

- কেননা এখানকার লেডিজ হস্টেলের সুপারকে আমার আগেকার প্রেমিকার মত দেখতে। এখানে চাকরি করলে রোজ ওকে দেখতে পাব।

- অ্যাঁ এখানে পা রাখতে না রাখতেই সুপারের প্রেমে পড়ে গেলে?

- আমি প্রেমে উঠতে চেষ্টা করছি, পড়তে নয়।

- তোমার প্রেমিকা তোমায় ছাড়ল কেন?

- ছাড়েনি। ছাড়া ছাড়া ভাব দেখাচ্ছে। এখানে চাকরি করলে পুরোপুরি ছেড়ে দেবে।

- ঠিক আছে, এবার তুমি যাও।

- চাকরিটা কি আমি পাব?

- না।

- কেন?

- কেননা এই কলেজটা পাগলখানা নয়, তাই।

- তাহলে এতক্ষণ ধরে ইন্টারভিউ নিলেন কেন?

- ওতো টাইম পাস। এবার যাও। জয় জগন্নাথ।

- জয় জগন্নাথ। ভালোই হয়েছে, আসলে প্রেমিকাকে ছাড়ার কথা ভাবলেই আমারও বুকটা হু হু করে উঠছিল। আর ঐ সুপার মেয়েটিও আজ সকাল থেকে আমায় আর পাত্তা দিচ্ছিল না। গুড বাই। কন তে পারতিরো।

- আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি একটা কী যেন বললে কী তিরো। এইমাত্র বললে। কথাটার মানে কী?

- বলব কেন? আপনারা আমায় চাকরি দেবেন না, অথচ ভালো ভালো কথা শিখে নেবেন আমার কাছ থেকে?

- তোমার ইন্টারভিউ তো এখনও শেষই হয়নি। বলো কথাটার মানে কী এবং ভাষাটাই বা কী?

- কথাটা একটি ইতালিয়ান অপেরাটিক পপ গানের লাইন। মানে হচ্ছে, "তোমার সঙ্গে আমি চলে যাব।" এই গান শোনার একটা গল্পও আছে। যেটা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।

- কী গল্প?

- গল্প বললে চাকরি দেবেন?

- গল্পটা ভালো লাগলে নিশ্চয়ই দেব।

- এই গল্প ভালো লাগা না লাগা ডিপেন্ড করছে আপনার মন কতটা সংবেদনশীল তার ওপর। আপনার বুকের ভেতর যদি প্রকৃত মনুষ্য হৃদয় থাকে তবে ভালো লাগবে, নইলে নয়।

- ঠিক আছে, শুরু তো করো।

- শুরু করছি। মন দিয়ে শুনুন:

আমি যে ইতালিয়ান অপেরাটিক পপ শুনব তা আমি কেন আমার বাবাও কোনদিন ভাবতে পারেননি। স্বপ্নে দেখি, বসে আছি গ্লোব সিনেমা হলে। আমার পাশে বসে আছেন কবি পূর্ণেন্দু পত্রী। ব্যস আর কেউ নেই। সারা হল ফাঁকা। হঠাৎ পর্দায় ভেসে এল 'টাইম টু সে গুড বাই'। পুরনো হলিউডি ইংরিজি সিনেমা। সেই সিনেমার দৃশ্যের মধ্যেই সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আসর। একটি মেয়ের মুখ। গোলগাল ফরসা নার্সারি রাইমসের 'চাবি চিকস্, ডিম্পল্ড চিন, রোসি লিপস্, টিথ উইদিন'-এর মত। যেন ঠিক আমাদের হিন্দি সিনেমার শ্রীদেবী। দর্শকেরা হাততালি দিচ্ছে, মেয়েটি স্টেজে উঠে তার পুরুষ সহশিল্পী অসাধারণ রোম্যান্টিক চেহারার এক যুবকের গালে

হামি দিল। তারপর শুরু হল সেই মায়াবী গান- 'কন তে পারতিরো'। যে গানের একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না, অথচ সুরের দোলায় ভেসে যাচ্ছি অজানা দেশে। গান গাইতে গাইতে মেয়েটি পুরুষ সঙ্গীর ঘাড়ে মাথা রাখছে। সঙ্গীটি কখনও তাকে জড়িয়ে ধরছে, তার মধ্যেই উদাত্ত গলায় গেয়ে চলেছে –

কন তে / পারতিরো / সু নাভি / পের মারি / কে ইও লো সো / নো, নো / নন এসিসতোনো পিউ টাইম টু সে গুড বাই কন তে আইও লি ভিভরো।

এইসব অজানা না শোনা শব্দের মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎই বুঝতে পারছিলাম একটা কথা – টাইম টু সে গুড বাই। আমি সঙ্গীতবোদ্ধা নই, গান শুনতে ভালো লাগে, কোনো গান শুনতে শুনতে চোখে জল আসে, আশেপাশে কেউ না থাকলে ভালো লাগা গানের কলি নিজের মনেই গুনগুন করি এই পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন ঐ গান শুনে আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না। বারবার সিনেমা হলের অপারেটরকে বলি, "আবার চালাও ঐ গান, বারবার চালাও।" পূর্ণেন্দু আমার কানে কানে বলেন, "বারবার শুনলে বিঠোফেনও জোলো লাগবে, এবার থামো।" খুব ইচ্ছে করে গানের কথাগুলোর মানে জানতে। একে তাকে জিজ্ঞেস করি, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজতে থাকি সেই গানের কথা। দেখি ওখানকার দেওয়ালে নোটিশ বোর্ডে কে আটকে রেখে গেছে ঐ গানের কথা আর তার মানে। জানতে পেরে অপার্থিব আনন্দ হয়। কথাগুলোর মানে:

"তোমার সঙ্গে আমি চলে যাব। জাহাজে চড়ে সমুদ্র পেরিয়ে। যা আমি জানি / না, না / সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন সময় বিদায় নেওয়ার / তোমার সঙ্গে। আমি জেনে নেব সব।"

মনে পড়ে যায় 'শেষের কবিতা'র কথা:

"ফর উই আর বাউন্ড হয়্যার মেরিনার হ্যাজ নট ডেয়ার্ড টু গো / অ্যান্ড উই উইল রিস্ক দ্য শিপ, আওয়ারসেলভস্ অ্যান্ড অল।"

"আমরা যাব যেখানে কোনো যায়নি নেয়ে সাহস করে / ডুবি যদি ডুবি না কেন/ ডুবুক সবই, ডুবুক তরী।"

সেই গান, মেয়েটির নাদব্রহ্ম থেকে উঠে আসা 'ও' আর 'উ'-এর মধ্যেকার উচ্চারণ আমায় নিয়ে যায় এক অপরূপ মায়াবী জগতে। আমি আর আমার মধ্যে থাকি না। এক অসহ্য ভালো লাগা, এক অসম্ভব মন খারাপ চারিয়ে যায় আমার সমগ্র সত্তায়। মিউজিক হ্যাজ নো ল্যাঙ্গয়েজ কথাটা শুনেছিলাম। উপলব্ধি করলাম সেদিন। সেই পুরুষ ও মহিলা শিল্পী, হুইটম্যান, রবীন্দ্রনাথ সব একাকার হয়ে যায়। পূর্ণেন্দু বললেন, "জানো তো যে ছেলেটা গান গাইছিল, ও চোখে দেখতে পায় না।" অত রূপবান পুরুষ দৃষ্টিহীন জেনে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

- আমার গল্প শেষ। এবার আপনারা বলুন কেমন লাগল?

- ভালো লেগেছে, কিন্তু এর মধ্যে গল্প কোথায়?

- গল্প বলতে আপনি কী ভেবেছিলেন? এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি উদযাপন। ওসব ছাড়ুন, ভালো যখন লেগেছে চাকরি দিন।

- ওকে, ইউ আর সিলেক্টেড। চাকরিটা কী তুমি করবে?

- করতে পারি যদি আমার তাকেও এখানে চাকরি দেওয়া হয়?

- তার কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াবার যোগ্যতা আছে?

- আছে মানে? খুব আছে। আমার থেকে বেশিই আছে। তাকে একটা প্রশ্ন করলে, ডিটেলে উত্তর দেবে। আপনারা যেরকম চান। আপনি কম্প্রেসরের কথা মুখে আনতে না আনতেই সে আপনাকে কালো বোর্ডে সাদা চক দিয়ে ভেপার কম্প্রেসন সাইকেল এঁকে বুঝিয়ে দেবে। আমি ক্যান্টিনে আড্ডা মারতাম আর সে-ই তো আমার ক্লাস নোটস্ কপি করত। তাই সে নিজের সাবজেক্টের সাথে সাথে আমার বিষয়টাও বেশ ভালো জানে। কোনো বর্ষা বাদল দিনে আমার ক্লাস নিতে ইচ্ছে না করলে সে আমার ক্লাসটা নিয়ে নেবে।

- সে যখন তোমার ক্লাস নেবে, তখন তুমি কী করবে?

- কী করব আবার, কিছুই করব না। বৃষ্টি দেখব, পুরনো জন্মের সব কথা মনে পড়বে। সেগুলো একটা খাতায় লিখে রাখব। এইরকম পুরনো কিছু লেখা পড়ব।

- ওহ গড! তোমার আবার আগের জন্মের কথাও মনে পড়ে? তুমি তো দেখছি মহাপুরুষ হে।

- এতে মহাপুরুষত্ব কিছু নেই। চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। আপনি ঠিক একবছর আগে কী করছিলেন, মনে করার চেষ্টা করুন। তারপর পিছোতে থাকুন, ক্রমশ পিছোতে পিছোতে দেখবেন পূর্বজন্মে পৌঁছে গেছেন। এইরকম করতে করতে একসময় ওটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তখন একটা কিছু ট্রিগার দরকার। যেমন আমার, আকাশে মেঘ করলেই মনটা সজল হয়ে যায়। মনে পড়ে, আমি কলেজের লাইব্রেরির সিঁড়িতে বসে আছি। সে একা একটা লেডিজ সাইকেল চালিয়ে আসছে লাইব্রেরির দিকে। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি তার দিকে। কয়েকদিন আগে কলেজ ফেস্টে তার গাওয়া গান: 'হ্যাভ ইওরসেলফ আ মেরী লিটল্ ক্রিসমাস' আমার কানে কেউ গুনগুন করে যাচ্ছে। তার কপালে ছেলেদের মত করে কাটা এলোমেলো চুল, মুখটা কেমন বিষণ্ণ। আমি হঠাৎই দুদ্দাড় করে উঠে বিনা ভূমিকায় তার কাছে গিয়ে বলে ফেললাম, "ঐ ক্রীসমাসের গানটা একবার শোনাবে?" সে বলল, "না।" তারপর সাইকেলের মুখটা ঘুরিয়ে সে অন্যদিকে চলে গেল। আমি আবার ধীরে ধীরে আগের জায়গায় গিয়ে বসলাম। ব্যাগ থেকে ডায়েরি বার করে লিখলাম কিছু শব্দ। তারপর সেই শব্দগুলোকেই কাটাকুটি করতে করতেই তারা

একটা কবিতার রূপ পেয়ে গেল।

- কী কবিতা?

- সে অন্য কবিতা।

- লাইনগুলো বলো।

- বাংলায় মনে পড়ছে, তবে চেষ্টা করলে ইংরিজিতেও বলতে পারি।

- ঠিক আছে, আগে বাংলাটা শুনি। আমি অনেক বাঙালির থেকে ভালো বাংলা জানি।

- কবিতা শুনলে আমার তাকে চাকরি দেবেন?

- যদি সত্যিকারের কবিতা হয়, তবে দেব।

- তবে শুনুন:

থমকে আছে মেঘ, স্তব্ধ গাছের পাতা
প্রতীক্ষাতেও শুকনো মাটি, নাকি বৃষ্টি লেখার খাতা?
বৃষ্টি লেখার খাতা!
আমার সৃষ্টি গেছে ভেসে।
সেই মেয়েটি না বলেছে, একটুখানি হেসে।

- এবার ইংলিশ ভার্সানটা বলো। ঠিকঠাক লাগলে তোমাদের দুজনের চাকরি পাকা।

- শুনুন:

Waiting clouds, silent leaves,
reminiscent soil, or, book for writing rain?
Book for writing rain!
My whole being has been drained.
With a half faint smile that girl said, “NO.”

এরকম আরও অনেক কবিতা আমি তাকে নিয়ে লিখেছি। কখনও ইংরিজিতে কখনও বাংলায়। যেমন লিখেছিলাম, গিফট অফ দ্য সামার সলস্টিস্। একবার একুশে জুন সারাদিন খুব বৃষ্টি হল। আমারও তার কথা খুব মনে পড়তে লাগল। তাকে দেখতে ছিল ব্লু লেগুনের বাচ্চা ব্রুক শিল্ডসের মতো। মনে হল ওই দিনেই আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। দীর্ঘ এক কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটা লিখেই টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই নিউজ পেপারে তো কোনো পোয়েট্রি সেকশন ছিল না। তবু তারা আমার কবিতা ছাপিয়েছিল, এটাকে আপনি কী বলবেন পূর্ব জন্মের সুকৃতী না আ ম্যাটার অফ কোইন্সিডেন্স? কবিতার কয়েকটা

লাইন এখনও মুখস্থ আছে। শুনুন:

When the plants and shrubs. bend down after rains.
trees are greener on all sides, the robin sheds dirt
from its wings,
when riparian feelings pervade in every mind,
you must come then like a real woman
in ochre silk rinsing hair with joss stick flavour
smearing your arms with fragrance of unknown flower
and say, "Take me now, hold me please,
I am yours, truly yours".

ধন্যবাদ আমাকে এতক্ষণ ধরে সহ্য করার জন্য।

- তোমাকেও ধন্যবাদ। তোমার যাওয়া আসার ভাড়াটা নিয়ে যাও। ঠিকই বলেছ সত্যিই আমাদের হৃদয় ও মস্তিস্কের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছিল। তুমি খুব বুদ্ধিমান।

ওনারা আমাকে দু'টো কড়কড়ে হাজার টাকার নোট ধরিয়ে সাইন করিয়ে বিদায় করলেন। আমারও বুকের ভেতর দিয়ে কেমন একটা হালকা বাতাস খেলে গেল যাক এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে আর আমায় চাকরি করতে হবে না। কলকাতায় ফিরে যাব, ওখানেই যা পারি করব। আবার সেই ট্রেকার, বাস, ট্রেন – ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন।